নভেম্বর ২০২৩ ■ কার্তিক – অগ্রহায়ণ ১৪৩০

সচিত্র বাংলাদেশ

চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তরের প্রকাশনা

৩রা নভেম্বর জেল হত্যা দিবস

জননন্দিত হুমায়ূন আহমেদ

ঋতুকন্যা হেমন্ত

ডেঙ্গু প্রতিরোধে এগিয়ে আসুন

ডেঙ্গু একটি ভাইরাসজনিত জ্বর যা এডিস মশার মাধ্যমে ছড়ায়। এই মশা সাধারণতঃ ভোরবেলা ও সন্ধ্যার পূর্বে কামড়ায়। সাধারণ চিকিৎসাতেই ডেঙ্গু জ্বর সেরে যায়, তবে ডেঙ্গু শক সিনড্রোম এবং হেমোরেজিক ডেঙ্গু জ্বর মারাত্মক হতে পারে। বর্ষার সময় সাধারণত এ রোগের প্রকোপ বাড়ে। এডিস মশার বংশ বৃদ্ধি রোধের মাধ্যমে ডেঙ্গু জ্বর প্রতিরোধ করা যায়।

টবে জমা পানি

[illegible]

এডিস মশার লার্ভা

পিউপা

পরিত্যক্ত টায়ারে জমা পানি

পরিত্যক্ত পাত্র

হেমোরেজিক ডেঙ্গু রোগী

এডিস মশার জীবনচক্র

এডিস মশা ডিম পাড়ায় ও বংশবিস্তারের স্থান

ডেঙ্গু প্রতিরোধে করণীয়:

- আপনার ঘরে এবং আশেপাশে যে কোন জায়গায় পানি জমতে না দেয়া। ফলে এডিস মশার লার্ভা জন্মাতে পারবে না।
- ব্যবহৃত পাত্রের গায়ে লেগে থাকা মশার ডিম অপসারণে পাত্রটি ব্লিচিং পাউডার দিয়ে ঘষে পরিস্কার করতে হবে।
- ফুলের টব, প্লাস্টিকের পাত্র, পরিত্যক্ত টায়ার, প্লাস্টিকের ড্রাম, মাটির পাত্র, বালতি, টিনের কৌটা, ডাবের খোসা/নারিকেলের মালা, কন্টেইনার, মটকা, ব্যাটারী শেল ইত্যাদিতে এডিস মশা ডিম পাড়ে। কাজেই এগুলো বর্জ্য হিসেবে ব্যবস্থা নেয়া।
- অব্যবহৃত পানির পাত্র ধ্বংস অথবা উল্টে রাখতে হবে যাতে পানি না জমে।
- দিনে অথবা রাতে ঘুমানোর সময় অবশ্যই মশারী ব্যবহার করুন।

সচিত্র বাংলাদেশ

চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তরের প্রকাশনা

নভেম্বর ২০২৩ ❑ কার্তিক-অগ্রহায়ণ ১৪৩০

১লা নভেম্বর ২০২৩ গণভবন থেকে ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে জাতীয় কার্ড স্কিম 'টাকা পে'-এর উদ্বোধন অনুষ্ঠানে কার্ড হাতে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা– পিআইডি

সম্পাদকীয়

মহান মুক্তিযুদ্ধে বাঙালি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান যখন পাকিস্তান কারাগারে বন্দি, তাঁরই নামে ও নির্দেশনায় জাতীয় চার নেতা মুক্তিযুদ্ধ পরিচালনা করেন। তাঁরা ছিলেন বঙ্গবন্ধুর ঘনিষ্ঠ সহযোদ্ধা। ১৯৭৫ সালের ১৫ই আগস্ট স্বাধীনতাবিরোধী অপশক্তির দেশি-বিদেশি ষড়যন্ত্রে সেনাবাহিনীর কতিপয় সদস্য কর্তৃক সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান সপরিবার নির্মমভাবে শাহাদতবরণ করেন। এরই ধারাবাহিকতায় ১৯৭৫ সালের ৩রা নভেম্বর ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগারে সংঘটিত হয় ইতিহাসের আরেকটি নৃশংস হত্যাকাণ্ড। বঙ্গবন্ধুকে হত্যার পর বাংলাদেশ যাতে ঘুরে দাঁড়াতে না পারে সেজন্য বঙ্গবন্ধুর আজীবন রাজনৈতিক সহকর্মী জাতীয় চার নেতা সৈয়দ নজরুল ইসলাম, তাজউদ্দীন আহমদ, এএইচএম কামরুজ্জামান এবং ক্যাপ্টেন এম মনসুর আলী জেলখানায় হত্যাকাণ্ডের শিকার হন। এই জাতীয় বীরদের গভীর শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করি। তাঁদের রুহের মাগফেরাত কামনা করি। জেল হত্যা দিবস নিয়ে রয়েছে প্রবন্ধ ও জাতীয় চার নেতার জীবনী।

১৩ই নভেম্বর ১৯৪৮ জনপ্রিয় কথাসাহিত্যিক হুমায়ূন আহমেদ জন্মগ্রহণ করেন নেত্রকোণার মোহনগঞ্জে। তিনি ছিলেন একাধারে বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক, ঔপন্যাসিক, গল্পকার, নাট্যকার, গীতিকার ও চলচ্চিত্র নির্মাতা। বাংলা সাহিত্য ও সংস্কৃতিতে তাঁর অবদান অনস্বীকার্য। হুমায়ূন আহমেদকে নিয়ে রয়েছে নিবন্ধ।

এছাড়া অন্যান্য নিবন্ধ ও নিয়মিত বিভাগ নিয়ে সাজানো হয়েছে *সচিত্র বাংলাদেশ* নভেম্বর ২০২৩ সংখ্যা। আশা করি, এ সংখ্যাটি পাঠকদের ভালো লাগবে।

প্রধান সম্পাদক
স. ম. গোলাম কিবরিয়া

সিনিয়র সম্পাদক
ডালিয়া ইয়াসমিন

সম্পাদক
ফাহমিদা শারমীন হক কাজী শাম্মীনাজ আলম

কপি রাইটার
মিতা খান

শিল্প নির্দেশক
মুহাম্মদ ফরিদ হোসেন

সহসম্পাদক
সানজিদা আহমেদ
ক্ষিরোদ চন্দ্র বর্ম্মণ

অলংকরণ : নাহরীন সুলতানা

আলোকচিত্রী
মোহাম্মদ নাজিম উদ্দিন

সম্পাদনা সহযোগী
জান্নাত হোসেন
শারমিন সুলতানা শান্তা
প্রসেনজিৎ কুমার দে

যোগাযোগ : সম্পাদনা শাখা
ফোন : ৮৩০০৬৮৭
E-mail: dfpsb1@gmail.com
dfpsb@yahoo.com
ওয়েবসাইট : www.dfp.gov.bd

গ্রাহক ও এজেন্টদের জন্য যোগাযোগ
সহকারী পরিচালক (বিক্রয় ও বিতরণ)
চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তর
তথ্য ভবন
১১২ সার্কিট হাউস রোড, ঢাকা-১০০০
ফোন : ৮৩০০৬৯৯

মূল্য : পঁচিশ টাকা

গ্রাহক মূল্য : ষাণ্মাসিক ১৫০ টাকা এবং বার্ষিক ৩০০ টাকা

সূচিপত্র

ভাষণ/প্রবন্ধ/নিবন্ধ

জাতির উদ্দেশে প্রধান নির্বাচন কমিশনারের ভাষণ ৪

১৯৭৫ সালের ৩রা নভেম্বর জেল হত্যায় দুই সামরিক কর্মকর্তার কথন ৬
প্রফেসর ড. মো. এমরান জাহান

জাতীয় চার নেতার জীবনী ৯

জননন্দিত হুমায়ূন আহমেদ ১২
ড. শিহাব শাহরিয়ার

হেমন্তঃ শীতের আগমনী বার্তা ১৬
ড. আবদুল আলীম তালুকদার

ঋতুকন্যা হেমন্ত ১৮
রহিম আব্দুর রহিম

বাংলাদেশে সমবায় আন্দোলন ২০
সেলিনা আকতার

জননী সাহসিকা কবি সুফিয়া কামাল ২২
জায়েদুল আলম

নবান্ন উৎসব ২৫
মঈনুল হক চৌধুরী

নীরব ঘাতক ডায়াবেটিস ২৬
ডা. মোহাম্মদ হাসান জাফরী

কৃষি উন্নয়নে রোল মডেল বাংলাদেশ ২৮
মোতাহার হোসেন

শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা ৩১
অসিত কুমার মন্ডল

রামগড় স্থলবন্দরঃ সম্ভাবনার নতুন দুয়ার ৩২
মো. বেলায়েত হোসেন

পিঠা-পুলির উৎসব ৩৪
সুস্মিতা চৌধুরী

নারীর প্রতি সহিংসতা প্রতিরোধঃ সচেতনতা ও দৃষ্টিভঙ্গি পরিবর্তন জরুরি ৩৬
নীলিমা আক্তার

বিশ্ব টেলিভিশন দিবস ৩৭
প্রশান্ত দে

গল্প

একই সমতলে ৩৮
আফরোজা পারভীন

বিস্মৃত বর্তমান ৪০
প্রণব মজুমদার

বানের গল্প ৪৩
ইজামুল হক

কবিতাগুচ্ছ ৪৭-৪৯
অদ্বৈত মারুত, কামাল হোসাইন, মিলন সব্যসাচী, রনি অধিকারী কামাল বারি, প্রজীৎ ঘোষ, মো. তাইফুর রহমান, আবুল কালাম আজাদ, মুহাম্মদ ইসমাঈল, এস এম তিতুমীর, সুফি মোশারফ

বিশেষ প্রতিবেদন
রাষ্ট্রপতি ৫০
প্রধানমন্ত্রী ৫১
তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয় ৫৩
উন্নয়ন ৫৪
ডিজিটাল বাংলাদেশ ৫৫
শিক্ষা ৫৬
নারী ৫৭
অর্থনীতি ৫৮
যোগাযোগ ও নিরাপদ সড়ক ৫৯
কৃষি ৬০
পরিবেশ ও জলবায়ু ৬০
চলচ্চিত্র ও সংস্কৃতি ৬২
সামাজিক নিরাপত্তা ৬২
ক্রীড়া ৬৩

শ্রদ্ধাঞ্জলি :
চলে গেলেন একুশে পদকজয়ী নৃত্যশিল্পী জিনাত বরকতুল্লাহ ৬৪

সচিত্র বাংলাদেশ পত্রিকা ওয়েবসাইট থেকে পিডিএফ পড়তে QR কোডটি স্ক্যান করুন:

ফেসবুক লিংক:
www.facebook.com/sachitrabangladesh/

ওয়েবসাইটে সচিত্র বাংলাদেশ দেখুন
www.dfp.gov.bd
E-mail: dfpsb1@gmail.com, dfpsb@yahoo.com
www.facebook.com/sachitrabangladesh/

মুদ্রণে : এস.আর. প্রিন্টিং প্রেস লিঃ
৮৫/১ নয়াপল্টন, ঢাকা

হাইলাইটস

৩রা নভেম্বর জেল হত্যা দিবস

১৯৭৫ সালের ৩রা নভেম্বর সৈয়দ নজরুল ইসলাম, তাজউদ্দীন আহমদ, এএইচএম কামরুজ্জামান ও ক্যাপ্টেন এম মনসুর আলী ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগারের অন্ধকার প্রকোষ্ঠে নির্মম হত্যার শিকার হন। বঙ্গবন্ধু স্বাধীনতা ঘোষণার পরপরই পাকিস্তানি সেনাবাহিনী কর্তৃক গ্রেপ্তার হন। ১৯৭১ সালের ১০ই এপ্রিল বাংলাদেশের সরকার গঠিত হয় এবং ১৭ই এপ্রিল মেহেরপুর জেলার বৈদ্যনাথতলায় মুজিবনগর সরকার শপথ গ্রহণ করে। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ছিলেন রাষ্ট্রপতি ও সশস্ত্র বাহিনীর প্রধান। সৈয়দ নজরুল ইসলাম ছিলেন উপরাষ্ট্রপতি (বঙ্গবন্ধুর অবর্তমানে অস্থায়ী রাষ্ট্রপতির দায়িত্ব পালন)। তাজউদ্দীন আহমদের নেতৃত্বাধীন মন্ত্রিসভায় ক্যাপ্টেন এম মনসুর আলী, এএইচএম কামরুজ্জামান সদস্য ছিলেন। বঙ্গবন্ধুর অনুপস্থিতিতে তাঁর এই চার ঘনিষ্ঠ সহচর বিশ্বস্ততা ও যোগ্যতার সঙ্গে মুক্তিযুদ্ধকালীন প্রবাসী মুজিবনগর সরকারের নেতৃত্ব দেন এবং দেশ শত্রুমুক্ত করেন। বাংলাদেশের ইতিহাসে বঙ্গবন্ধু ও জাতীয় চার নেতার অবদান অবিস্মরণীয়। ৩রা নভেম্বর জেল হত্যা দিবস নিয়ে '১৯৭৫ সালে ৩রা নভেম্বর জেল হত্যায় দুই সামরিক কর্মকর্তার কথন' শীর্ষক প্রবন্ধ এবং 'জাতীয় চার নেতার জীবনী' দেখুন যথাক্রমে পৃষ্ঠা– **৬** ও **৯**

জননন্দিত হুমায়ূন আহমেদ

হুমায়ূন আহমেদের প্রথম উপন্যাস *নন্দিত নরকে* প্রকাশের পরপরই তাঁর খ্যাতি ছড়িয়ে পড়ে চারদিকে। লেখক হিসেবে তাঁর সবচেয়ে বড়ো কৃতিত্ব বিশাল পাঠকসমাজ তৈরি এবং তরুণ প্রজন্মকে বই পাঠে আগ্রহী করে তোলা। তিনি সাহিত্য-সমালোচক এবং পাঠকদের কাছেও শক্তিমান লেখক হিসেবে স্বীকৃতি লাভ করেন। তিনি পাঠককে লেখার জাদুতে মোহিত করে রাখেন। তাঁর নির্মিত নাটক ও চলচ্চিত্র দারুণ জনপ্রিয়। বাংলা সাহিত্য ও সংস্কৃতিতে তাঁর অবদান অনস্বীকার্য। ১৯৪৮ সালের ১৩ই নভেম্বর নেত্রকোণায় জন্মগ্রহণ করেন হুমায়ূন আহমেদ। তাঁর জন্মদিন উপলক্ষে 'জননন্দিত হুমায়ূন আহমেদ' শীর্ষক নিবন্ধ দেখুন পৃষ্ঠা– **১২**

ঋতুকন্যা হেমন্ত

বাংলাদেশ ষড়ঋতুর দেশ। ছয়টি ঋতু নিজ নিজ বৈশিষ্ট্য নিয়ে নানা বৈচিত্র্যে পর্যায়ক্রমে আবির্ভূত হয়। চতুর্থ ঋতু হেমন্তকাল। হেমন্তকালে সোনালি ধানে মাঠ ভরে ওঠে। এসময় চাষিরা নতুন ধান ঘরে তোলে। ঘরে ঘরে শুরু হয় নবান্ন উৎসব। হেমন্ত নিয়ে 'হেমন্ত: শীতের আগমনী বার্তা', 'ঋতুকন্যা হেমন্ত' ও 'নবান্ন উৎসব' শীর্ষক নিবন্ধ দেখুন পৃষ্ঠা– **১৬**, **১৮** ও **২৫**

প্রধান নির্বাচন কমিশনার কাজী হাবিবুল আউয়াল ১৫ই নভেম্বর ২০২৩ দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন উপলক্ষে জাতির উদ্দেশে ভাষণ দেন– পিআইডি

জাতির উদ্দেশে প্রধান নির্বাচন কমিশনারের ভাষণ

প্রধান নির্বাচন কমিশনার কাজী হাবিবুল আউয়াল দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন উপলক্ষে ১৫ই নভেম্বর ২০২৩ জাতির উদ্দেশে ভাষণ দেন। তাঁর ভাষণটি হুবহু তুলে ধরা হলো:

বিসমিল্লাহহির রাহমানির রাহিম

প্রিয় দেশবাসী,

আসসালামুয়ালাইকুম।

প্রথমেই আমি স্বাধীন সার্বভৌম গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের মহান স্থপতি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের স্মৃতির প্রতি গভীর শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করছি। গণতান্ত্রিক আশা-আকাঙ্ক্ষা ও মূল্যবোধসমৃদ্ধ আবেগ ও চেতনা থেকেই ১৯৭১-এর মুক্তিযুদ্ধ এবং ৩০ লক্ষ প্রাণ ও ২ লক্ষ মা-বোনের সম্ভ্রমের বিনিময়ে ১৬ই ডিসেম্বর চূড়ান্ত বিজয়ের মাধ্যমে স্বাধীন সার্বভৌম গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের অভ্যুদয় হয়েছিল। ১৯৭২ সালের ১৬ই ডিসেম্বর স্বাধীন সার্বভৌম গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধান প্রবর্তিত হয়। সে থেকেই দেশে বহুদলীয় গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থার পথচলা। বাংলাদেশের সংবিধান দেশের আপামর জনগণের অভিপ্রায়ের পরম অভিব্যক্তি। সংবিধানে জনগণকেই ক্ষমতার মালিক ঘোষণা করা হয়েছে। রাষ্ট্রীয় ক্ষমতায় জনগণের সেই মালিকানা প্রতিষ্ঠার অন্যতম প্রধান মাধ্যম হচ্ছে অবাধ ও নিরপেক্ষ সংসদ নির্বাচন। রাষ্ট্র, সংসদ, সরকার ও জনশাসন গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ায় পরিচালিত হওয়ার জনআকাঙ্ক্ষা প্রজাতন্ত্রের সংবিধানের পাতায় পাতায় বিধৃত হয়েছে।

প্রিয় দেশবাসী,

আমরা দায়িত্ব গ্রহণের পর বিগত ২০ মাসে সংসদের ১৬টি উপনির্বাচনসহ বিভিন্ন পর্যায়ের স্থানীয় সরকারের সহস্রাধিক নির্বাচন করেছি। আগ্রহী সকল রাজনৈতিক দল, বুদ্ধিজীবীসমাজ, শিক্ষাবিদ, নাগরিকসমাজ, সিনিয়র সাংবাদিক এবং নির্বাচন বিশেষজ্ঞসহ বিভিন্ন অংশীজনদের সাথে একাধিকবার সংলাপ ও মতবিনিময় করেছি। তাদের মতামত শুনেছি। সুপারিশ জেনেছি। আমাদের অবস্থানও ব্যাখ্যা করেছি। নিবন্ধিত অনাগ্রহী সকল রাজনৈতিক দলকেও একাধিকবার আমন্ত্রণ জানিয়েছি। তারা আমন্ত্রণ প্রত্যাখ্যান করেছেন।

আপনারা জানেন, জাতীয় সংসদের সাধারণ নির্বাচন সাধারণত পাঁচ বছর অন্তর অন্তর হয়ে থাকে। সংবিধানের ৬৫ অনুচ্ছেদের বিধান মতে, ৩০০ সাধারণ আসন এবং ৫০টি সংরক্ষিত আসনে নির্বাচিত নারী সদস্যগণকে নিয়ে জাতীয় সংসদ গঠিত হয়ে থাকে। সংবিধানের ১২৩ (৩) (ক) অনুচ্ছেদের বিধান মতে, সংসদের মেয়াদ পূর্তির পূর্ববর্তী ৯০ দিবসের মধ্যে সংসদের সাধারণ নির্বাচন আয়োজনের সুস্পষ্ট নির্দেশনা রয়েছে। সাংবিধানিক বাধ্যবাধকতা সংবলিত এই নির্দেশনা নির্বাচন কমিশন সরকারের নির্বাহী বিভাগের কর্মকর্তা-কর্মচারীগণ এবং আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীসমূহের সহায়তা নিয়ে সম্পন্ন করে থাকে। সরকার আসন্ন সংসদ নির্বাচনকে সুষ্ঠু, অবাধ, নিরপেক্ষ, অংশগ্রহণমূলক এবং শান্তিপূর্ণ করার লক্ষ্যে সুস্পষ্ট প্রতিশ্রুতি বারংবার ব্যক্ত করেছে। কমিশনও তার আয়ত্তে থাকা সর্বোচ্চ সামর্থ্য দিয়ে এবং সরকার থেকে আবশ্যক সকল সহায়তা গ্রহণ করে আসন্ন জাতীয় সংসদ নির্বাচনকে অবাধ, নিরপেক্ষ ও শান্তিপূর্ণ করার বিষয়ে সততা, নিষ্ঠা ও আন্তরিকতার সাথে তার দায়িত্ব পালন করবে।

প্রিয় দেশবাসী,

নির্বাচন সুষ্ঠু, অবাধ, নিরপেক্ষ ও অংশগ্রহণমূলক হতে পারে কেবলমাত্র সংশ্লিষ্ট প্রক্রিয়ায় সংশ্লিষ্ট সকলের সমন্বিত সহযোগিতা ও অংশগ্রহণের মাধ্যমেই। রাজনৈতিক দলগুলো গণতান্ত্রিক চেতনায় উদ্বুদ্ধ হয়ে প্রার্থী দিয়ে নির্বাচনে কার্যকরভাবে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করলে, কেন্দ্রে কেন্দ্রে ভারসাম্য প্রতিষ্ঠিত হয়, নির্বাচন অধিক পরিশুদ্ধ ও অর্থবহ হয়। তাতে জনমতেরও শুদ্ধতর প্রতিফলন ঘটে। নির্বাচন প্রক্রিয়া ক্রমান্বয়ে সংহত ও টেকসই হয়। গণতান্ত্রিক সংস্কৃতির উৎকর্ষসাধন হয়। আমি বিশ্বাস করি, বাংলাদেশের আপামর জনগণ রাজনীতি বিষয়ে সচেতন। নির্বাচন বিষয়েও জনগণ সমভাবে সচেতন হয়ে এর গুরুত্ব সম্যক উপলব্ধি করে থাকবেন। প্রার্থীরা সে বিষয়ে প্রচারণার মাধ্যমে ভূমিকা পালন করে থাকবেন। কমিশনও সর্বসাধারণ ও বিশেষত ভোটারগণকে উদ্বুদ্ধ ও সচেতন করতে প্রচারণামূলক বিভিন্ন কর্মসূচি গ্রহণ করেছে।

নির্বাচনে অংশগ্রহণকারী সকল প্রার্থী ও রাজনৈতিক দলকে আচরণ বিধিমালা প্রতিপালন করতে হবে। নির্বাচনি দায়িত্বে নিয়োজিত সকল কর্মকর্তাকেও আইন ও বিধিবিধান যথাযথভাবে অনুধাবন, প্রতিপালন ও প্রয়োগ করে সততা ও নিষ্ঠার সাথে আরোপিত দায়িত্ব পালন করতে হবে। নির্বাচন বিষয়ক আইন ও বিধিবিধান তাদেরকে অবহিত করার লক্ষ্যে কমিশন বিভিন্ন প্রশিক্ষণ কর্মসূচি বাস্তবায়ন করেছে এবং করে যাচ্ছে। আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীকে ভোটকেন্দ্রসমূহের পারিপার্শ্বিক শৃঙ্খলাসহ প্রার্থী, ভোটার, নির্বাচনি কর্মকর্তাসহ সর্বসাধারণের সার্বিক নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে হবে। জাল ভোট, ভোট কারচুপি, ব্যালট ছিনতাই, অর্থের লেনদেন ও পেশিশক্তির সম্ভাব্য ব্যবহার নির্বাচনকে প্রভাবিত করতে পারে। জনগণকে ঐক্যবদ্ধ হয়ে যে-কোনো মূল্যে সম্মিলিতভাবে তা প্রতিহত করতে হবে।

প্রিয় দেশবাসী,

অবাধ, নিরপেক্ষ, অংশগ্রহণমূলক ও উৎসবমুখর নির্বাচনের জন্য কাঙ্ক্ষিত অনুকূল রাজনৈতিক পরিবেশের প্রয়োজনীয়তা রয়েছে। কিন্তু নির্বাচন প্রশ্নে, বিশেষত নির্বাচনের প্রাতিষ্ঠানিক পদ্ধতির প্রশ্নে, দীর্ঘসময় ধরে দেশের সার্বিক রাজনৈতিক নেতৃত্বে মতভেদ পরিলক্ষিত হচ্ছে। বহুদলীয় রাজনীতিতে মতাদর্শগত বিভাজন থাকতেই পারে। কিন্তু মতভেদ থেকে সংঘাত ও সহিংসতা হলে তা থেকে সৃষ্ট অস্থিতিশীলতা নির্বাচন প্রক্রিয়ায় বিরূপ প্রভাব বিস্তার করতে পারে। মতৈক্য ও সমাধান প্রয়োজন। আমি নির্বাচন কমিশনের পক্ষ থেকে সকল রাজনৈতিক দলকে বিনীতভাবে অনুরোধ করব সংঘাত ও সহিংসতা পরিহার করে সদয় হয়ে সমাধান অন্বেষণ করতে। জনগণকে অনুরোধ করব সকল উদ্বেগ, উৎকণ্ঠা ও অস্বস্তি পরাভূত করে নির্ভয়ে আনন্দমুখর পরিবেশে ভোটকেন্দ্রে এসে অবাধে মূল্যবান ভোটাধিকার প্রয়োগ করতে। নির্বাচন কমিশন নির্বাচনে সকল দলের স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণ ও প্রতিদ্বন্দ্বিতাকে সর্বদা স্বাগত জানাবে। পারস্পরিক প্রতিহিংসা, অবিশ্বাস ও অনাস্থা পরিহার করে সংলাপের মাধ্যমে সমঝোতা ও সমাধান অসাধ্য নয়। পরমতসহিষ্ণুতা, পারস্পরিক আস্থা, সহনশীলতা ও সহমর্মিতা টেকসই ও স্থিতিশীল গণতন্ত্রের জন্য আবশ্যকীয় নিয়ামক।

প্রিয় দেশবাসী,

আপনারা অবগত আছেন নির্বাচন কমিশন ইতোমধ্যে দ্বাদশ জাতীয় সংসদ সাধারণ নির্বাচনের প্রস্তুতি প্রায় সম্পন্ন করেছে। ভোটার তালিকা হালনাগাদ করা হয়েছে। নির্বাচনি এলাকার সীমানা পুনঃনির্ধারণের কাজ সম্পন্ন করা হয়েছে। নতুন রাজনৈতিক দল এবং আগ্রহী দেশি ও বিদেশি পর্যবেক্ষকদের নিবন্ধন প্রক্রিয়াও সমাপ্ত প্রায়। দেশে মোট ভোটার প্রায় ১১,৯৭,০০,০০০। ভোটকেন্দ্রের সংখ্যা প্রায় ৪২,০০০। মোট ২,৬২,০০০ বুথে ভোট গ্রহণ করা হবে। কমিশন আজ সভা করে দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনের তফসিল নির্ধারণ করেছে। আমি এখন সেই তফসিলের কতিপয় মূল বিষয় আপনাদের জ্ঞাতার্থে ঘোষণা করছি।

আগামী ২০২৪ সালের জানুয়ারি মাসের ৭ তারিখ রোজ রবিবার, ৩০০ আসনে দ্বাদশ জাতীয় সংসদের সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে;

৬৬ জন রিটার্নিং অফিসার এবং ৫৯২ জন সহকারী রিটার্নিং অফিসারের নিয়োগ চূড়ান্ত করা হয়েছে।

- মনোনয়নপত্র দাখিলের শেষ তারিখ আগামী ৩০শে নভেম্বর;
- মনোনয়নপত্র বাছাই হবে আগামী ১ থেকে ৪ঠা ডিসেম্বর;
- রিটার্নিং অফিসারের আদেশের বিরুদ্ধে কমিশনে আপিল দায়ের ও নিষ্পত্তি হবে ৬-১৫ই ডিসেম্বর;
- প্রার্থিতা প্রত্যাহারের শেষ তারিখ ১৭ই ডিসেম্বর;
- রিটার্নিং অফিসারগণ প্রতীক বরাদ্দ করবেন ১৮ই ডিসেম্বর;
- নির্বাচনি প্রচারণা চলবে ১৮ই ডিসেম্বর থেকে আগামী ২০২৪ সালের ৫ই জানুয়ারি সকাল ৮ ঘটিকা পর্যন্ত;
- এবং ভোট গ্রহণ হবে ২০২৪ সালের জানুয়ারি মাসের ৭ তারিখ, রোজ রবিবার।

প্রিয় দেশবাসী,

জাতীয় সংসদের সাধারণ নির্বাচন একটি বিশাল, কঠিন ও জটিল কর্মযজ্ঞ। নির্বাচন প্রক্রিয়ার সহজিকরণ ও স্বচ্ছতা প্রয়োজন। আইন ও বিধিবিধানের প্রয়োজনীয় সংস্কারের পাশাপাশি নির্বাচন প্রক্রিয়াকে সার্বিকভাবে স্বচ্ছ, সহজ, দক্ষ ও সুশৃঙ্খল করার অভিপ্রায়ে যে-কোনো স্থান থেকে অনলাইন পদ্ধতিতে নমিনেশন দাখিলের এবং স্মার্টফোনের মাধ্যমে ভোটার সাধারণ ও সর্বসাধারণের জন্য দিনব্যাপী কেন্দ্র ও কেন্দ্রের পোলিং সম্পর্কিত তথ্য সংগ্রহ ও পর্যবেক্ষণের সুবিধা সংবলিত দুটি ডিজিটাল অ্যাপস কমিশন সম্প্রতি চালু করেছে।

স্বচ্ছতা বা দৃশ্যমানতা নির্বাচনের বিশুদ্ধতা ও নিরপেক্ষতা প্রতিপাদনে সহায়ক হয়। এক্ষেত্রে গণমাধ্যম ও নির্বাচন পর্যবেক্ষকদের ভূমিকা প্রণিধানযোগ্য। তাই আমরা দেশি ও বিদেশি গণমাধ্যম ও পর্যবেক্ষকদের সহযোগিতা একান্তভাবে কামনা করছি। ডিজিটাল প্রযুক্তির যথাযথ ব্যবহার করে দায়িত্বশীল ও বস্তুনিষ্ঠ সংবাদ পরিবেশনের মাধ্যমে ভোটগ্রহণ প্রক্রিয়াকে যতদূর সম্ভব দৃশ্যমান করে উপস্থাপন করা গেলে সৃষ্ট স্বচ্ছতার মধ্য দিয়ে নির্বাচনের বিশুদ্ধতা ও নিরপেক্ষতা প্রতিপাদিত হতে পারে। বস্তুনিষ্ঠ সংবাদ পরিবেশনে গণমাধ্যমের স্বাধীনতায় কমিশনের আন্তরিক সমর্থন ও সহযোগিতা থাকবে। পক্ষান্তরে অসত্য, মিথ্যা ও বানোয়াট তথ্য সম্প্রচার করে ভোটগ্রহণ প্রক্রিয়া ও নির্বাচনকে প্রভাবিত করার যে-কোনো অপপ্রয়াস প্রতিহত করার সর্বাত্মক চেষ্টা করা হবে।

প্রিয় দেশবাসী ও সম্মানিত ভোটারবৃন্দ,

সম্মানিত সকল ভোটারকে আহ্বান জানাচ্ছি আপনারা আগামী ২০২৪-এর জানুয়ারি মাসের ৭ তারিখে অনুষ্ঠেয় দীর্ঘ প্রতিক্ষিত জাতীয় সংসদের সাধারণ নির্বাচনে উৎসবমুখর পরিবেশে উৎসাহ-উদ্দীপনা, সাহস ও আত্মবিশ্বাস নিয়ে ভোটকেন্দ্রে এসে নির্বিঘ্নে স্বাধীনভাবে আপনাদের মূল্যবান ভোটাধিকার প্রয়োগ করে পছন্দের প্রার্থীকে নির্বাচিত করে সংসদ ও সরকার গঠনে নাগরিক দায়িত্ব পালন করবেন। ভোট আপনার, ভোট প্রদানে কারও হস্তক্ষেপ বা প্ররোচনায় প্রভাবিত হবেন না। কোনোরকম হস্তক্ষেপ বা বাধার সম্মুখীন হলে একক বা সামষ্টিকভাবে তা প্রতিহত করবেন। প্রয়োজনে অবিলম্বে কেন্দ্রের প্রিসাইডিং অফিসারকে অবহিত করবেন। প্রিসাইডিং অফিসার যে-কোনো মূল্যে যে-কোনো অপচেষ্টা প্রতিহত করে ভোটারের ভোটাধিকার প্রয়োগের স্বাধীনতা নিশ্চিত করতে আইনত দায়িত্বপ্রাপ্ত ও বাধ্য।

সম্মানিত প্রার্থীগণ, নির্বাচনের অন্যতম অনুষঙ্গ হচ্ছে কার্যকর প্রতিদ্বন্দ্বিতা। কেন্দ্রে কেন্দ্রে প্রয়োজনীয় সংখ্যক সাহসী, সৎ, দক্ষ ও অনুগত পোলিং এজেন্ট নিয়োগ করে প্রার্থী হিসেবে আপনাদের নিজ নিজ অধিকার ও স্বার্থ সুরক্ষার প্রাণান্ত চেষ্টা কার্যত আপনাদেরকেই করতে হবে। গণতান্ত্রিক নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতায় এটি একটি অপরিহার্য অনুষঙ্গ। নির্বাচনি দায়িত্বে নিয়োজিত সকল কর্মকর্তা সৎ, নিরপেক্ষ ও অবিচল থেকে আইন ও বিধিবিধান অনুসরণ করে দায়িত্ব পালন করবেন। আমাদের বিশ্বাস স্ব স্ব অবস্থান থেকে সংশ্লিষ্ট সকলের দায়িত্বশীল আচরণ ও আবশ্যক ভূমিকা পালনের মধ্য দিয়ে আসন্ন দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন অবাধ, নিরপেক্ষ, অংশগ্রহণমূলক ও শান্তিপূর্ণ হবে। দেশে ও বহির্বিশ্বে প্রশংসিত ও বিশ্বাসযোগ্য হবে। দেশের জনশাসনে জনগণের জনপ্রতিনিধিত্ব প্রতিষ্ঠিত হবে। গণতন্ত্র সুসংহত হবে।

নির্বাচন প্রক্রিয়ায় সকল রাজনৈতিক দল ও প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীসহ আপামর জনগণের আন্তরিক অংশগ্রহণ ও সক্রিয় সহযোগিতা কামনা করছি। আসন্ন দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন সফল ও ফলপ্রসূ হোক। মহান আল্লাহ আমাদের সহায় হউন।

খোদা হাফেজ। বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

———○———

১৯৭৫ সালের ৩রা নভেম্বর জেল হত্যায় দুই সামরিক কর্মকর্তার কথন

প্রফেসর ড. মো. এমরান জাহান

৩রা নভেম্বর পালিত হলো ব্যক্তি ও দলীয় কর্মসূচিতে জেল হত্যা দিবস। এই কালো অধ্যায়ের ৪৮তম অধ্যায় গত হয়ে গেল এই বছর। কিন্তু জাতীয় ইতিহাসের গুরুত্ব ও তাৎপর্য বিবেচনায় দিবসটি বুদ্ধিজীবী দিবসের মতো জাতীয়ভাবে গুরুত্ব পাচ্ছে না। অথচ জেলে বন্দি চার নেতার বর্বর হত্যাকাণ্ড ১৯৭১ সালের ডিসেম্বর মাসে পাকিস্তানি বাহিনী কর্তৃক বাঙালি বুদ্ধিজীবী হত্যার স্মৃতি মনে করিয়ে দেয়। ১৯৭৫ সালের টালমাটাল রাজনৈতিক পরিস্থিতিতে ৩রা নভেম্বর হত্যা করা হয় জাতীয় চার নেতাকে। ঢাকার নাজিমুদ্দিন রোডের তৎকালীন কেন্দ্রীয় কারাগারে রাতে নৃশংস বর্বরোচিত এই হত্যাকাণ্ড ঘটে। জাতীয় জীবনে দিনটি জেল হত্যা দিবস বলে পালিত হয়। ৩রা নভেম্বর নারকীয় হত্যার শিকার জাতীয় চার নেতা হলেন– তাজউদ্দীন আহমদ, সৈয়দ নজরুল ইসলাম, ক্যাপ্টেন এম মনসুর আলী ও এএইচএম কামরুজ্জামান। এই চার নেতা ছিলেন ১৯৬৬ সাল থেকেই বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের অবিচ্ছিন্ন সারথি। বঙ্গবন্ধু যখন পাকিস্তানের ফয়সালাবাদের সামরিক আদালতে বিচারের মুখোমুখি, সে ক্রান্তিকালে ১৯৭১ সালে প্রথম বাংলাদেশ সরকারের (মুজিবনগর সরকার নামে পরিচিত) কাণ্ডারি ছিলেন এই চার জাতীয় নেতা।

এই জাতীয় চার নেতাকে চাপ দেওয়া হয়েছিল খুনি মোশতাক সরকারের সঙ্গে যোগদান করার জন্যে। কিন্তু তাঁরা তা দৃঢ়ভাবে প্রত্যাখ্যান করেন, যদিও তাঁরা জানতেন এর পরিণতি কী ভয়াবহ হতে পারে। তার পরই তাঁদের গোপনে বন্দি করে জেলখানায় পাঠানো হয়। তাজউদ্দীন আহমদকে যেদিন তাঁর বাসা থেকে বন্দি করা হয়– সে সময় পাশেই ছিলেন এক বিদেশি সাংবাদিক। *সানডে টেলিগ্রাফের* সাংবাদিক পিটার লিগ তাজউদ্দীন আহমদের বক্তব্য কোড করে যে বর্ণনা দিয়েছেন তাতে তাজউদ্দীন আহমদও অনুধাবন করতে পারছিলেন এই গ্রেপ্তারের পরিণতি কী হতে পারে। পিটার লিগ লিখেন, 'আমি যখন তাঁর বাসভবনে যাই তখন দেখি তাজউদ্দীন আহমদ একজন সামরিক অফিসারের সঙ্গে জিপে উঠেন। ... আমি জিপের কাছে গিয়ে তাজউদ্দীন আহমদের কাছে জানতে চাইলাম, তিনি সামরিক বাহিনীর পরিচালিত সরকারে যোগদান করতে যাচ্ছেন কি না। জবাবে তিনি জানান, বোধহয় না, আমাকে সামরিক ক্যাম্পে ডিটেনশনে নেয়া হচ্ছে।' সত্যি সত্যি দু'মাসের মাথায় সেখানেই তাঁকে হত্যা করা হয়।

৩রা নভেম্বরের হত্যাকাণ্ড কোনো বিচ্ছিন্ন ঘটনা যে ছিল না, তা আজ ইতিহাসে মীমাংসিত। ১৯৭৫ সালের ১৫ই আগস্ট জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে সপরিবার হত্যার পর পরই চার নেতা হত্যার সুনির্দিষ্ট পরিকল্পনা হয়েছিল। এই নীলনকশার অন্যতম হচ্ছেন খোন্দকার মোশতাক আহমদ এবং বঙ্গভবনে তার সার্বক্ষণিক পাশে থাকা মেজর ফারুক এবং মেজর রশিদ। প্রাথমিকভাবে এই পাশবিক হত্যাকাণ্ডে যে বিষয়টি বিবেচনায় আনা হয় তা হলো বঙ্গবন্ধু হত্যার পর ক্ষমতায় আসীনদের মধ্যে যদি কোনো বিপর্যয় ঘটে তা হলে বঙ্গবন্ধুর পর এই জাতীয় চার নেতাই নেতৃত্বে আসবে– সন্দেহ নেই। অতএব নেতৃত্ব শূন্য করে দেওয়ার পরিকল্পনা ছিল। এখন আর বলতে কোনো দ্বিধা নেই যে, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে হত্যা এবং কারাগারে জাতীয় চার নেতার হত্যা বিয়োগান্ত ইতিহাসের একই সুতায় গাঁথা। এই বিষয়ে প্রাথমিকভাবে তথ্য-উপাত্ত দিয়ে

আন্তর্জাতিকভাবে নজরে আনেন অ্যান্থনি মাসকারেনহাস। ১৯৮৬ সালে তিনি প্রকাশ করেন *বাংলাদেশ: এ লিগ্যাসি অব ব্লাড*। বঙ্গবন্ধুর সঙ্গে সেই ১৯৫৬ সালে চীন সফর থেকে অ্যান্থনির যোগাযোগ হয়। পাকিস্তানি বংশোদ্ভূত এই খ্রিষ্টান সাংবাদিক গবেষক অ্যান্থনি বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধেও বিশেষ অবদান রাখেন। তিনি প্রথম সাংবাদিক যিনি পাকিস্তান পক্ষ ত্যাগ করে লন্ডনে পালিয়ে যান এবং মে মাসে *ডেইলি টেলিগ্রাফে* 'জেনোসাইড' শিরোনামে সচিত্র প্রতিবেদন প্রকাশ করেন। তাই বাংলাদেশের রাজনীতির ওপর তাঁর প্রভাব ও দখল দুটোই ছিল প্রখর। অ্যান্থনির বিবরণ থেকেই পরবর্তী গবেষকগণ নানা তথ্য-উপাত্ত গ্রহণ করেছেন। একই সঙ্গে সে দিনের সামরিক ও রাজনৈতিক যন্ত্রণাদায়ক ঘটনাবলির সঙ্গে প্রত্যক্ষভাবে জড়িত ছিলেন দুই বাঙালি সামরিক কর্মকর্তা। একজন কর্নেল এম. এ. হামিদ (অব.) এবং অপরজন কর্নেল শাফায়াত জামিল। তাদের দেখা সে দিনগুলোর বিবরণ দিয়েছেন সুলিখিত গ্রন্থে। যদিও গ্রন্থে উপস্থাপিত বিবরণে উভয়ই নিজেকে মুক্ত রাখতে চেয়েছেন সচেতনভাবে, তারপরও ইতিহাসের উপাত্ত ও রসদ সংগ্রহে সমসাময়িক এই সামরিক কর্মকর্তাদের বিবরণ ইতিহাস গবেষকদের খোরাক মিটাবে। তারা ১৯৭৫ সালের ৩রা নভেম্বরের ঘটনাবলি কীভাবে পর্যবেক্ষণ করেছেন– এই বিষয়ে কিছু অনুসন্ধান করার ক্ষুদ্র প্রয়াস নেওয়া হয়েছে।

জেলখানার মতো সুরক্ষিত ও নিরাপদ জায়গায় রাতের আধারে রাষ্ট্র সরকারের সর্বাধিকারীর নির্দেশে এরূপ নারকীয় হত্যাকাণ্ড ইতিহাসে তেমন পরিলক্ষিত হয় না। তবে বাংলাদেশের ইতিহাসে এর একটি বেদনাদায়ক উদাহরণ আছে। এমনই একটি রাজনৈতিক ঘটনা ঘটেছিল ১৭৫৭ খ্রিষ্টাব্দের ৩রা জুলাই। পলাশীর যুদ্ধে ২৩শে জুন নবাব সিরাজউদ্দৌলার পরাজয়ে শুধু নবাবের ভাগ্যে বিপর্যয় নেমে আসেনি, গোটা বাংলা আক্রান্ত হয়েছিল এক অন্ধকার শাসনের যাতাকলে। ২৩শে জুন থেকে ৩রা জুলাই বাংলার রাজনীতি ছিল এমনই অন্ধকারময়। ৩রা জুলাই সে দিনের রাজধানী শহর ভাগিরথির মুর্শিদাবাদে বন্দি অবস্থায় নবাবকে নৃশংসভাবে ঠান্ডা মাথায় খুন করা হয়েছিল। একই ধরনের ঘটনার পুনরাবৃত্তি ঘটে বুড়িগঙ্গার তীরে স্বাধীন বাংলাদেশের রাজধানী ঢাকায়। প্রথমটি ১৯৭৫ সালের ১৫ই আগস্ট আর দ্বিতীয়টি এরই ধারাবাহিকতায় ৩রা নভেম্বর। এখানে বাঙালির একটু স্বস্তি নেওয়ার সুযোগ আছে। নবাব সিরাজের হত্যাকাণ্ডের বিচার হয়নি। তার স্ত্রী লুৎফুন্নেছা কিংবা মা আমেনা বেগম সে সুযোগ বা আরজি কারও কাছে করতে পারেননি। বরং এক চরম বৈরি রাজনৈতিক পরিবেশে তাদের কায়ক্লেশে বাকি জীবনটুকু পার করতে হয়েছে। ১৯৭৫ সালের দুটি খুনের ঘটনায় বিচারের বাণী নিভৃতে কেটেছিল ঐ একই অবস্থায়। ইতিহাসের কিঞ্চিত দুর্গম সময় অতিক্রান্তের পর ১৯৭৫ সালের বঙ্গবন্ধু এবং চার নেতার খুনের বিচার বাংলাদেশের আদালতে নিষ্পন্ন হয়েছে।

আলোচনার প্রথমেই আসি লে. কর্নেল এম. এ. হামিদের বিবরণে। এই ফৌজি কর্মকর্তা ১৯৭৫ সালে ঢাকা সেনানিবাসের স্টেশন কমান্ডের দায়িত্বে ছিলেন। খুব কাছ থেকে দেখেছেন ১৯৭৫ সালের অস্থির সামরিক ঘটনাবলি। তারই সঙ্গীসাথি ছিলেন সে সময়ের বড়ো সামরিক কর্তাগণ। ঢাকা স্টেশন কমান্ডার কর্নেল হামিদ ১৯৯৩ সালে লিখেন *তিনটি সেনা অভ্যুত্থান ও কিছু না বলা কথা*। বহুল আলোচিত ও পঠিত গ্রন্থের ভূমিকায় লিখেছেন যে, '১৫ এবং ৩রা নভেম্বরের বিয়োগান্ত সামরিক ও রাজনৈতিক ঘটনা নিয়ে লেখার তার সুবিধা হলো তিনি সে সময়ের দুই সেনাপ্রধান জেনারেল সফিউল্লাহ, জেনারেল জিয়াউর রহমানের কোর্সমেট।' এই সামরিক কর্মকর্তা এবং খুনি কর্মকর্তাদের প্রায় সবারই ১৯৭৫ সালের ১৫ই আগস্ট এবং ৩রা নভেম্বরের ঘটনাবলির বিষয়ে জবানবন্দি লিপিবদ্ধ করেছেন। এটি একটি ঐতিহাসিক সুযোগ ও দলিল। প্রত্যক্ষ জবানী নেওয়ার এই সুযোগ আর কোনো গবেষকের হবে বলে মনে হয় না। তার বিবরণে বের হয়ে এসেছে, বিশেষ করে ৩রা নভেম্বরের কথিত সামরিক বিদ্রোহ ছিল উচ্চপদে আসীন ফৌজি কর্মকর্তাদের সীমাহীন উচ্চাভিলাষ, একে অপরের প্রতি অবিশ্বাস ও হিংসা, পরশ্রীকাতরতার এক বিষাদময় নাটক। একটি জাতীয় শৃঙ্খলিত বাহিনী কীভাবে জাতীয় স্বার্থ বেমালুম ভুলে বিপথে অগ্রসর হয়েছিল, এর ফল ছিল নারকীয় জেল হত্যাকাণ্ড। এই হত্যাকাণ্ডে সরাসরি সে সময়ের অবৈধ রাষ্ট্রপতি খোন্দকার মোশতাক আহমদ আদেশ দিয়েছিলেন বঙ্গভবন থেকে। মেজর ফারুক, মেজর রশিদের পরিকল্পনায় তাদের অনুগত উচ্ছৃঙ্খল মোসলেম উদ্দিন ও তার দল জেলখানায় বন্দি চার নেতাকে সরাসরি গুলি করে হত্যা করে। ঘটনার প্রত্যক্ষদর্শী সে সময়ের আই.জি (প্রিজন) নুরুজ্জামানের লিখিত রিপোর্ট থেকে এর সত্যতা পাওয়া যায়। এই রিপোর্ট আগ্রহী পাঠক এম. এ. হামিদের গ্রন্থ থেকে দেখে নিতে পারেন। কিন্তু এই হত্যাকাণ্ড পরিস্থিতি তৈরির জন্য সে দিনের প্রধান প্রধান সিপাহসালারগণ কোনো অংশেই দায় এড়াতে যে পারেন না, সে বিষয়েই জানান দিয়েছেন কর্নেল হামিদ তার গ্রন্থে। বঙ্গভবনে বসেই মোশতাক ও দুই মেজর ধারণা করেছিলেন বঙ্গবন্ধুর হত্যার পর এমন কোনো পাল্টা আঘাত আসলে এবং তাদের জীবন বিপন্ন হলে আওয়ামী লীগের যাতে কেউ ক্ষমতায় না আসতে পারে, সেই পথ রুদ্ধ করার জন্য বন্দি চার নেতাকে তাৎক্ষণিক হত্যা করতে হবে। অ্যান্থনি মাসকারেনহাস লিখেন, 'দু'মাস আগেই মেজর ফারুক এবং রশিদ একটি প্ল্যান তৈরি করে রেখেছিলেন। যদি পাল্টা অভ্যুত্থান এবং মোশতাক নিহত হবার সম্ভাবনা দেখা দেয়, তা হলে এই প্ল্যানটা আপনা থেকেই কার্যকর হয়ে যাবে। আওয়ামী লীগ যাতে পুনরায় ক্ষমতায় না আসতে পারে সে জন্যে জেলে বন্দি চার নেতাকে হত্যার সিদ্ধান্ত আগেই করা হয়েছিল।' কাজেই জিয়া এবং খালেদ মোশাররফের মধ্যে ক্ষমতার লড়াই, উচ্চাভিলাষী মনোভাবই এই হত্যাকাণ্ডের পথকে আরও সুগম করে দেয়। ৩রা নভেম্বর ব্রিগেডিয়ার খালেদ মোশাররফের নেতৃত্বে পাল্টা সামরিক অভ্যুত্থান শুরু হলে মোশতাক সরকারের ওপর বিপদ ঘনিয়ে আসে। সঙ্গে সঙ্গে জেল হত্যার পরিকল্পনা কার্যকর হয়ে যায়। জেল হত্যার প্রায় ২৪ ঘণ্টা অতিবাহিত হলেও এই ঘটনা সেনানিবাসের বড়ো কর্তাগণ কেউ অবগত হতে পারেনি। বরং নতুন সেনাপ্রধান মেজর জেনারেল খালেদ মোশাররফ এবং ৪৬ ব্রিগেডের কমান্ডার কর্নেল জামিলের সঙ্গে নানান দেনদরবার ও সুযোগ আদায় করে খুনি মেজররা নিরাপদে দেশত্যাগ করে। এই উপরোক্ত বক্তব্য একইভাবে কর্নেল হামিদের গ্রন্থেও বিবৃত হয়েছে।

৩রা নভেম্বর কথিত ফৌজি বিদ্রোহের ঘটনাবলি নিয়ে সে সময়ের গুরুত্বপূর্ণ ঢাকার ৪৬ ব্রিগেডের ব্রিগেড কমান্ডার কর্নেল শাফায়াত

জামিলও একটি গ্রন্থ রচনা করেন। তিনি যে গ্রন্থ রচনা করেন এর শিরোনাম *একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধ, রক্তাক্ত মধ্য-আগস্ট ও ষড়যন্ত্রময় নভেম্বর*। গ্রন্থটি ১৯৯৮ সালে প্রকাশিত হয়। গ্রন্থটিও পাঠক নন্দিত। সাহিত্য প্রকাশ থেকে গ্রন্থটির তৃতীয় সংস্করণ প্রকাশ হয়েছে। ৩রা নভেম্বরের ঘটনাবলিতে তিনি নিজেকে যুক্ত করেন। কিন্তু ঐদিন রাতে জেল হত্যাকাণ্ড বিষয়ে তারা কিছুই জানতেন না বলে নিজেকে মুক্ত রাখেন। কর্নেল শাফায়াত জামিল ছিলেন খালেদ মোশাররফের পক্ষে একজন সেনা অভ্যুত্থানের নায়ক। তাদের অভ্যুত্থানের একমাত্র উদ্দেশ্য ছিল সেনাপ্রধান জিয়াকে পদচ্যুত করা এবং বঙ্গভবনের আশ্রয়রত বিদ্রোহী খুনি ফারুক-রশিদের খবরদারি বন্ধ করে তাদেরকে সেনাবাহিনীর কমান্ডের মধ্যে নিয়ে আসা। আশ্চর্যের বিষয় ছিল যে দুটি সেনা ইউনিট সেনানিবাস থেকে বের হয়ে বঙ্গবন্ধু ও তাঁর পরিবারকে হত্যা করেছিল, এই দুটি ইউনিট ছিল ৪৬ ব্রিগেডের নিয়ন্ত্রণাধীন। আর এই ব্রিগেডের কমান্ডার ছিলেন কর্নেল শাফায়াত জামিল। কাজেই তার কমান্ড ও দায়িত্ব নিয়েও প্রশ্ন উঠেছে। ৩রা নভেম্বরের বিদ্রোহে এক দিকে বঙ্গভবন অপর প্রান্তে ঢাকা সেনানিবাস। শুরু হয় উভয়ের মধ্যে ক্ষমতা দখল ও আত্মরক্ষার দরকষাকষি। বিদ্রোহের এমন দুর্বল দরকষাকষি ইতিহাসে আর নজির আছে বলে আমাদের জানা নেই। যার কারণে জেলে বন্দি চার নেতাকে হত্যা এবং খুনিরা নিরাপদে দেশ থেকে পালানোর অবাধ সুযোগ পায়। ঐ দিনের ঘটনায় কর্নেল জামিলের দুর্বল ভাষ্যটি এমন, '৩ নভেম্বর ভোর থেকে শুরু হয় ১৫ আগস্টের হত্যাকারী বিদ্রোহী অফিসার তথা ক্ষমতা দখলকারীদের সঙ্গে টেলিফোনে আমাদের বাক্ যুদ্ধ। শেষ পর্যন্ত সন্ধ্যার দিকে প্রেসিডেন্ট মোশতাক কর্তৃক আদিষ্ট হয়ে ওসমানী বঙ্গবন্ধুর হত্যাকারীদের দেশত্যাগের জন্য সেফ প্যাসেজের অঙ্গীকার দাবি করলেন।' খুনিদের দাবির উত্তরে কর্নেল লিখছেন, 'সম্ভাব্য গৃহযুদ্ধ, রক্তক্ষয় ও বেসামরিক জানমালের ক্ষয়ক্ষতি এড়ানোর জন্য অনিচ্ছা সত্ত্বেও তাদের দেশত্যাগের সেফ প্যাসেজ দিতে রাজি হলাম। কি বিচিত্র আত্মঘাতী সিদ্ধান্ত। তাদের জানা নেই ইতোমধ্যে এই খুনিরা জেল হত্যাকাণ্ড সফলভাবে সমাধা করে ফেলেছে।' তারপরের অংশে এই কথাটাই বলতে গিয়ে কর্নেল শাফায়াত জামিল যা লিখেন তা হলো, 'তখন ঘুণাক্ষরেও আমরা জানতে পারি নাই জেলে চার জাতীয় নেতার হত্যাকাণ্ডের কথা। আগের রাতেই সংঘটিত হয়েছিল ঐ বর্বর হত্যাকাণ্ড।'

তবে কর্নেল শাফায়াত জামিল পরে লিখেন যে, ৪ তারিখ তারা জেল হত্যাকাণ্ডের কথা শুনতে পান এবং ঐদিন বঙ্গভবনে গিয়ে প্রেসিডেন্ট মোশতাককে সরাসরি ভর্ৎসনা করেন এবং বঙ্গবন্ধু ও চার নেতার খুনের জন্য তাকে দায়ী করে পদত্যাগের দাবি করেন। (পৃ. ১৩৮)

জাতীয় চার নেতার হত্যাকাণ্ডের বিষয়ে বিচারিক রায় হয়েছে। এই নৃশংস হত্যাকাণ্ডের ঘটনায় করা মামলায় আদালতের রায়ে যাবজ্জীবন সাজাপ্রাপ্ত আসামির সংখ্যা ৮ জন। মৃত্যুদণ্ডপ্রাপ্ত আসামি ৩ জনের মধ্যে আবদুল মাজেদ নামে প্রাক্তন সৈনিকের ফাঁসি কার্যকর হয়েছে। মৃত্যুদণ্ডপ্রাপ্ত অপর দুই আসামি রিসালদার মোসলেম উদ্দিন, দফাদার মারফত আলী এখনও নিখোঁজ।

সীমাহীন আত্মত্যাগের পর দেশ স্বাধীনের মাত্র সাড়ে তিন বছরের মাথায় জাতির পিতা এবং তাঁর চার সহযাত্রীকে জেলবন্দি অবস্থায় হত্যা ছিল জাতীয় ইতিহাসে বিয়োগান্ত ও কলঙ্কময় ঘটনা। ইতিহাস মানুষের আত্মোপলব্ধির চাবিকাঠি। জাতীয় চার নেতার নারকীয় হত্যা এবং দীর্ঘ চড়াই-উতরাইয়ের পর বিচার নিষ্পত্তি হওয়া এবং একইসঙ্গে প্রতিবছর জেল হত্যা দিবস পালনের মধ্যে দিয়ে আমাদের জাতীয় আত্মোপলব্ধি ঘটবে– এই প্রত্যাশাই এখন আমাদের।

প্রফেসর ড. মো. এমরান জাহান: চেয়ারম্যান, ইতিহাস বিভাগ, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়

জাতীয় চার নেতার জীবনী

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধুর ঘনিষ্ঠ সহচর জাতীয় চার নেতা সৈয়দ নজরুল ইসলাম, তাজউদ্দীন আহমদ, ক্যাপ্টেন মোহাম্মদ মনসুর আলী এবং এএইচএম কামরুজ্জামান বাংলাদেশের ইতিহাসে উজ্জ্বল নক্ষত্রসম। তাঁরা ছিলেন জাতির পিতা বঙ্গবন্ধুর অকৃত্রিম আদর্শিক সহযোগী ও সহকর্মী। বঙ্গবন্ধুর সঙ্গে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে ১৯৭১-এ স্বাধীন বাংলাদেশের বিজয় অর্জনে অপরিসীম ভূমিকা রেখেছেন এই চারজন। বাঙালি জাতির কাছে আজও তাঁরা জাতীয় চার নেতা হিসেবে পরিচিত। তাঁরা ১৯৭৫ সালের ৩রা নভেম্বর কারাগারের অভ্যন্তরে ঘাতকের গুলিতে শহিদ হন। স্বাধীন বাংলাদেশের এই চার সূর্যসন্তানের জীবনী *বাংলা একাডেমি চরিতাভিধান* থেকে হুবহু তুলে ধরা হলো:

সৈয়দ নজরুল ইসলাম (১৯২৫-১৯৭৫): জন্ম. যশোদল গ্রাম, কিশোরগঞ্জ, ময়মনসিংহ, জানুয়ারি ১৯২৫। মুজিবনগর সরকারের অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি, রাজনীতিবিদ ও আইনজীবী। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ইতিহাসে প্রথম শ্রেণিতে এম.এ. পাস। ১৯৪৮-এ সলিমুল্লাহ

মুসলিম হল ছাত্র সংসদের সহ-সভাপতি নির্বাচিত। ঐ বছর মার্চ মাসে (১৯৪৮) অনুষ্ঠিত ভাষা আন্দোলনে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ। 'রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদ' (১৯৪৮)-এর অন্যতম সদস্য। ১৯৪৯-এ পাকিস্তান সেন্ট্রাল সুপিরিয়র সার্ভিস পরীক্ষায় প্রতিযোগিতা করে সরকারের আয়কর অফিসারের পদ লাভ। ১৯৫১-তে সরকারি চাকরি ছেড়ে দিয়ে ময়মনসিংহ আনন্দমোহন কলেজে ইতিহাসের অধ্যাপক হিসেবে যোগদান। ১৯৫৩-তে ল' পাস করে ময়মনসিংহ জেলা আদালতে আইন ব্যবসায় যোগদান। অতঃপর আওয়ামী লীগে যোগদান। ১৯৫৭-তে ময়মনসিংহ জেলা আওয়ামী লীগের সভাপতি নির্বাচিত। ১৯৬৪-র ৮ই মার্চ কাউন্সিল অধিবেশনে আওয়ামী লীগের সিনিয়র সহ-সভাপতি নির্বাচিত। ১৯৭২-এর ১৬ই এপ্রিল পর্যন্ত এ পদে অধিষ্ঠিত। ১৯৬৬-র ৮ই মে আওয়ামী লীগের অস্থায়ী সভাপতির দায়িত্ব গ্রহণ। ১৯৬৯-এর ২১শে ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত ভারপ্রাপ্ত সভাপতি হিসেবে আওয়ামী লীগ পরিচালনা। ডাক (ডেমোক্রেটিক অ্যাকশন কমিটির)-এর অন্যতম প্রধান নেতা হিসেবে ১৯৬৯-এর জানুয়ারি-মার্চের আইয়ুববিরোধী গণ-আন্দোলনে বিশিষ্ট ভূমিকা পালন। রাজনৈতিক সংকট মীমাংসাকল্পে পিন্ডিতে বিরোধী দলগুলোর সাথে অনুষ্ঠিত সরকারের এক গোলটেবিল বৈঠকে (২৫শে ফেব্রুয়ারি, ১০-১৩ই মার্চ ১৯৬৯) আওয়ামী লীগের প্রতিনিধি দলের অন্যতম সদস্য। ১৯৭০-এর নির্বাচনে ময়মনসিংহ-১৭ নির্বাচনি এলাকা থেকে জাতীয় পরিষদের সদস্য নির্বাচিত। ১৯৭১-এর মার্চের অসহযোগ আন্দোলনে প্রশংসনীয় অবদান রাখেন। ১৯৭১-এর ১৭ই এপ্রিল মুজিবনগরে (বৈদ্যনাথতলা গ্রাম, মেহেরপুর) স্বাধীন বাংলাদেশ সরকার গঠিত হলে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এই নবগঠিত সরকারের রাষ্ট্রপতি এবং সৈয়দ নজরুল ইসলাম উপরাষ্ট্রপতি নিযুক্ত। শেখ মুজিবুর রহমানের অনুপস্থিতিতে (পাকিস্তানের কারাগারে বন্দি) সৈয়দ নজরুল ইসলামের অস্থায়ী রাষ্ট্রপতির দায়িত্ব পালন। ১৯৭১-এর ২২শে ডিসেম্বর স্বাধীন বাংলাদেশ সরকার মুজিবনগর থেকে ঢাকায় স্থানান্তরিত হয়। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের নেতৃত্বে ১২ই জানুয়ারি (১৯৭২) গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের নতুন মন্ত্রিপরিষদ গঠিত। সৈয়দ নজরুল ইসলামের শিল্পমন্ত্রীর দায়িত্ব গ্রহণ। ১৯৭৫-এর ২৪শে জানুয়ারি পর্যন্ত এই দায়িত্ব পালন। ১৯৭২-এর ৯ই এপ্রিল আওয়ামী লীগ পার্লামেন্টারি পার্টির সহকারী নেতা নির্বাচিত। ১৯৭৩-এর ৬ই মার্চ পর্যন্ত এ পদে বহাল। ১১ই এপ্রিল (১৯৭২) শাসনতন্ত্র প্রণয়ন কমিটির সদস্য নিযুক্ত এবং গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধান (১৯৭২) রচনায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন। ১৯৭৩-এর ৭ই মার্চ জাতীয় নির্বাচনে ময়মনসিংহ-২৮ নির্বাচনি এলাকা থেকে জাতীয় সংসদের সদস্য নির্বাচিত। ১২ই মার্চ (১৯৭৩) দ্বিতীয় বার আওয়ামী লীগ পার্লামেন্টারি পার্টির সহকারী নেতা নির্বাচিত। ১৯৭৫-এর ১৪ই আগস্ট পর্যন্ত এই দায়িত্বে নিয়োজিত। ২৫শে জানুয়ারি (১৯৭৫) শাসনতন্ত্রের চতুর্থ সংশোধনীর মাধ্যমে সংসদীয় সরকারের পরিবর্তে দেশে এক দলীয় প্রেসিডেন্ট পদ্ধতির সরকার গঠিত হলে শেখ মুজিবুর রহমান রাষ্ট্রপতি ও সৈয়দ নজরুল ইসলাম উপরাষ্ট্রপতি হন। ১৯৭৫-এর ২৪শে ফেব্রুয়ারি বঙ্গবন্ধু নিজেকে চেয়ারম্যান করে বাংলাদেশ কৃষক-শ্রমিক-আওয়ামী লীগ (বাকশাল) গঠন করলে সৈয়দ নজরুল ইসলাম বাকশালের ১৫ সদস্য বিশিষ্ট কার্যনির্বাহী কমিটির ২ নম্বর সদস্য নির্বাচিত হন। ১৫ই আগস্ট (১৯৭৫) সামরিক বাহিনীর একটি দলের হাতে রাষ্ট্রপতি শেখ মুজিবুর রহমান নিহত হলে দেশে সামরিক আইন জারি; খোন্দকার মোশতাক আহমদ রাষ্ট্রপতি হন। এর ফলে মুজিব সরকারের পতন ঘটে এবং সৈয়দ নজরুল ইসলাম মন্ত্রিত্ব হারান। ১৯৭৫-এর ২৩শে আগস্ট সরকার কর্তৃক গ্রেপ্তার। সৈয়দ নজরুল ইসলাম শিল্পমন্ত্রী থাকাকালে বৃহত্তর জনগোষ্ঠীর কল্যাণে বাংলাদেশের মিল-কারখানা জাতীয়করণ করা হয়। তিনি ছিলেন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের একজন বিশ্বস্ত সহকর্মী। ৬০-এর দশকে বাঙালি জাতিসত্তা বিকাশের আন্দোলনে তিনি ছিলেন অন্যতম পুরোধা। স্বাধীন বাংলাদেশের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা হিসেবে বাঙালির ইতিহাসের স্মরণীয় ব্যক্তিত্ব। মৃত্যু. ঢাকার কেন্দ্রীয় কারাগারে বন্দি থাকা অবস্থায় কারাগারের প্রচলিত নিয়ম অগ্রাহ্য করে প্রবেশকারী সশস্ত্রবাহিনীর কতিপয় ব্যক্তির হাতে গুলিবিদ্ধ হয়ে ৩.১১.১৯৭৫-এ নিহত।

তাজউদ্দীন আহমদ (১৯২৫-১৯৭৫): জন্ম. দরদরিয়া গ্রাম, কাপাসিয়া, গাজীপুর, ২৩.৭.১৯২৫। রাজনীতিবিদি ও আইনজীবী। এক মধ্যবিত্ত কৃষক পরিবারে জন্ম। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ১৯৪৬-এ অর্থনীতিতে প্রথম শ্রেণিতে বি.এ. অনার্স এবং ১৯৬৪-তে জেল থেকে পরীক্ষা দিয়ে ল' পাস। ছাত্রজীবন থেকেই প্রত্যক্ষ রাজনীতিতে অংশগ্রহণ। চল্লিশের দশকে নিখিল বঙ্গ মুসলিম ছাত্রলীগ ও বঙ্গীয় প্রাদেশিক মুসলিম লীগের নেতৃস্থানীয় সদস্য। পাকিস্তান আন্দোলনে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ। পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার (১৪ই আগস্ট ১৯৪৭) পর মুসলিম লীগ সরকারের গণবিরোধী নীতির প্রতিবাদে মুসলিম লীগের সঙ্গে সম্পর্ক ত্যাগ। রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদ ১৯৪৮ ও রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদ ১৯৫২ উভয় কমিটির সদস্য। ১৯৫২-র ফেব্রুয়ারির ভাষা আন্দোলনে অংশগ্রহণের দায়ে গ্রেপ্তার ও কারা নির্যাতন ভোগ। পূর্ব পাকিস্তান

যুবলীগ (এপ্রিল ১৯৫১)-এর অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা সদস্য। ১৯৫১ থেকে ১৯৫৩ পর্যন্ত এ সংগঠনের কার্যকরী পরিষদের সদস্য। ১৯৫৩-তে আওয়ামী লীগে যোগদান ও ঢাকা জেলা আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক নির্বাচিত। ১৯৫৪-র মার্চ মাসে যুক্তফ্রন্টের মনোনয়নে কাপাসিয়া অঞ্চল থেকে পূর্ববঙ্গ পরিষদের সদস্য নির্বাচিত। একই বছর জুন মাসে ৯২-ক ধারায় গ্রেপ্তার। ১৯৫৫-র ২৭শে অক্টোবর কাউন্সিল সভায় আওয়ামী লীগের সাংস্কৃতিক ও সমাজসেবা সম্পাদক নির্বাচিত। ১৯৫৮-র ৭ই অক্টোবর দেশে সামরিক শাসন জারির পর আওয়ামী লীগ নিষিদ্ধ ঘোষিত হলে গ্রেপ্তার ও ১৯৫৯-এ মুক্তিলাভ। ১৯৬২-তে হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দীর নেতৃত্বে পরিচালিত এনডিএফ (ন্যাশনাল ডেমোক্রেটিক ফ্রন্ট)-এর গণতন্ত্র পুনরুদ্ধার আন্দোলনে অংশগ্রহণ। ১৯৬৪-এর ২৫শে জানুয়ারি আওয়ামী লীগের পুনরুজ্জীবনে বিশিষ্ট ভূমিকা পালন। একই বছর ৮ই মার্চ কাউন্সিল সভায় দলের সাংগঠনিক সম্পাদক নির্বাচিত। এপ্রিল (১৯৬৪) মাসে গ্রেপ্তার। জেল থেকে মুক্তি পেয়ে দেশের প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে (২রা জানুয়ারি ১৯৬৫) সম্মিলিত বিরোধী দলের প্রার্থী ফাতেমা জিন্নাহর নির্বাচনি প্রচার অভিযানে অংশগ্রহণ। ১৯৬৬-র ৫ ও ৬ই ফেব্রুয়ারি লাহোরে বিরোধী দলের সম্মেলনে আওয়ামী লীগের প্রতিনিধি দলে সদস্য হিসেবে যোগদান। এ সম্মেলনের বিষয় নির্বাচনি কমিটিতে শেখ মুজিবুর রহমান কর্তৃক ঐতিহাসিক ৬ দফা কর্মসূচি উপস্থাপন। ১৯৬৬-র ১৯শে মার্চ কাউন্সিল সভায় আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক নির্বাচিত। প্রায় ছয় বছর এ পদে দায়িত্ব পালন। শেখ মুজিবুর রহমানের সাথে ৬ দফার প্রচারাভিযানে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ। ৮ই মে ১৯৬৬ দেশরক্ষা আইনে গ্রেপ্তার। গণ-আন্দোলনের চাপে ১৯৬৯-এর ১২ই ফেব্রুয়ারি সরকার কর্তৃক মুক্তিদান। অতঃপর গণ-আন্দোলনে (জানুয়ারি-মার্চ) ১৯৬৯ নেতৃত্বের ভূমিকা পালন। বিরোধী দল ও সরকারের মধ্যে রাজনৈতিক বিরোধ মীমাংসার জন্য রাওয়ালপিন্ডিতে প্রেসিডেন্ট আইয়ুব খান কর্তৃক আহূত গোলটেবিল বৈঠকে (২৫শে ফেব্রুয়ারি, ১০, ১১ ও ১২ই মার্চ ১৯৬৯) আওয়ামী লীগের প্রতিনিধিদলের সদস্য হিসেবে যোগদান। ১৯৭০-এর ৭ই ডিসেম্বর আওয়ামী লীগের প্রার্থী হিসেবে ঢাকা-৫ আসন থেকে জাতীয় পরিষদের সদস্য নির্বাচিত। ১৯৭১-এর মার্চের অসহযোগ আন্দোলনের অন্যতম পরিচালক। ২৫শে মার্চ (১৯৭১) রাতে পাকিস্তানি সামরিক বাহিনী নিরস্ত্র বাঙালিদের ওপর সশস্ত্রভাবে ঝাঁপিয়ে পড়ে গণহত্যা শুরু করলে ঢাকা ত্যাগ করে ভারত গমন। ১২ই এপ্রিল (১৯৭১) স্বাধীন বাংলাদেশ সরকার গঠিত হলে সরকারের প্রধানমন্ত্রীর দায়িত্ব গ্রহণ। ১৭ই এপ্রিল (১৯৭১) মুজিবনগরে এ সরকারের আনুষ্ঠানিকভাবে শপথ গ্রহণ। বাংলাদেশ থেকে পাকিস্তানি হানাদার বাহিনীকে বিতারিত করার জন্য তাঁর সরকার কর্তৃক সর্বাত্মক মুক্তিযুদ্ধের ডাক। সে আহ্বানে সাড়া দিয়ে দলে দলে ছাত্র-জনতা, ইপিআর, পুলিশ ও বাঙালি সৈনিকদের মুক্তিযুদ্ধে যোগদান। এদের সমন্বয়ে মুক্তিবাহিনী গঠন। মুক্তিবাহিনীর জন্য অস্ত্র সংগ্রহ ও মুক্তিযুদ্ধের পক্ষে আন্তর্জাতিক সমর্থন আদায়ের ব্যাপারে কৃতিত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন। ভারত, রাশিয়া, পূর্ব জার্মান ও পূর্ব ইউরোপের সমাজতান্ত্রিক দেশসমূহ তাঁর সরকারের প্রতি সমর্থন জ্ঞাপন করে মুক্তিযুদ্ধে সাহায্য ও সহযোগিতা প্রদান। বাংলাদেশের সর্বত্র মুক্তিবাহিনী গেরিলা যুদ্ধের কৌশলে আক্রমণ চালিয়ে পাকিস্তানি হানাদার বাহিনীকে পর্যুদস্ত করে তোলে। ৩রা ডিসেম্বর (১৯৭১) পাকিস্তান ভারত আক্রমণ করলে মুক্তিবাহিনী ও ভারতীয় মিত্রবাহিনীর যৌথ কমান্ড কর্তৃক বাংলাদেশে যুদ্ধাভিযান পরিচালনা। ১৬ই ডিসেম্বর (১৯৭১) ঢাকার সোহরাওয়ার্দী উদ্যানে উক্ত যৌথ কমান্ডের কাছে পাকিস্তানি হানাদার বাহিনী আত্মসমর্পণ করলে বাংলাদেশের চূড়ান্তভাবে স্বাধীনতা লাভ। ২৩শে ডিসেম্বর (১৯৭১) তাজউদ্দীনের সরকারের মুজিবনগর থেকে বিমানযোগে ঢাকায় আগমন এবং তেজগাঁ বিমানবন্দরে বিপুল সংবর্ধনা লাভ। পাকিস্তানের কারাগার থেকে মুক্তি পেয়ে ১৯৭২-এর ১০ই জানুয়ারি শেখ মুজিবুর রহমানের ঢাকায় প্রত্যাবর্তন। ১২ই জানুয়ারি তাঁর নেতৃত্বে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের নতুন মন্ত্রিপরিষদ গঠিত হলে তাজউদ্দীন আহমদের অর্থমন্ত্রীর পদ লাভ। ১৯৭২-এর ১১ই এপ্রিল শাসনতন্ত্র প্রণয়ন কমিটির সদস্য নিযুক্ত ও গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধান (১৯৭২) রচনায় বিশিষ্ট ভূমিকা পালন। ১৯৭৩-এর ৭ই মার্চ ঢাকা-২২ আসন থেকে জাতীয় সংসদের সদস্য নির্বাচিত। ১৯৭৪-এর ২৬শে অক্টোবর মন্ত্রিত্ব থেকে পদত্যাগ। ১৯৭৫-এর ১৫ই আগস্ট সামরিক বাহিনীর কিছু সংখ্যক সদস্যের হাতে রাষ্ট্রপতি শেখ মুজিবুর রহমান নিহত হলে খোন্দকার মোশতাক আহমদ ক্ষমতা দখল করে দেশে সামরিক আইন জারি করলে ২৩শে আগস্ট গ্রেপ্তার। অসাম্প্রদায়িক প্রগতিশীল রাজনীতিতে বিশ্বাসী। আওয়ামী লীগকে বাঙালির আশা-আকাঙ্ক্ষার প্রতীক-প্রতিষ্ঠানে গড়ে তোলার জন্য দীর্ঘকাল সংগ্রাম পরিচালনা। ষাটের দশকে পূর্ব বাংলায় বাঙালি জাতীয়তাবাদী আন্দোলন উজ্জীবনে বিশিষ্ট ভূমিকা পালন। সমাজতান্ত্রিক অর্থনৈতিক ব্যবস্থার প্রতি দৃঢ় আস্থাশীল রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব হিসেবে খ্যাত। বাংলাদেশের অর্থমন্ত্রী থাকাকালে ব্যাংক, বিমা ও বৃহৎ শিল্পপ্রতিষ্ঠান জাতীয়করণ করার ক্ষেত্রে বলিষ্ঠ ভূমিকা পালন। বাংলাদেশের স্থপতি শেখ মুজিবুর রহমানের একজন সুযোগ্য সহকর্মী। স্বাধীন ও সার্বভৌম বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য অবদান রাখেন। মৃত্যু. ঢাকার কেন্দ্রীয় কারাগারে বন্দি থাকা অবস্থায় কারাগারের প্রচলিত নিয়ম অগ্রাহ্য করে প্রবেশকারী সশস্ত্রবাহিনীর কতিপয় ব্যক্তির হাতে গুলিবিদ্ধ হয়ে ৩.১১.১৯৭৫-এ নিহত।

এম মনসুর আলী, ক্যাপ্টেন (১৯১৯-১৯৭৫): জন্ম. কড়িপাড়া গ্রাম, কাজীপুর, সিরাজগঞ্জ, ১৯১৯। রাজনীতিবিদ। সিরাজগঞ্জ বি.এল. স্কুল থেকে ম্যাট্রিক, পাবনা এডওয়ার্ড কলেজ থেকে আই.এ., কলকাতা ইসলামিয়া কলেজ থেকে বি.এ. (১৯৪১) এবং আলীগড় মুসলিম বিশ্ববিদ্যালয় থেকে অর্থনীতিতে এম.এ. (১৯৪৫) ও ল' পাস। পাবনা বার-এ আইন ব্যবসায় যোগদান। পাবনা আইনজীবী সমিতির পর পর তিনবার নির্বাচিত সভাপতি। ১৯৪৬-১৯৫০ পর্যন্ত পাবনা জেলা মুসলিম লীগের সহ-সভাপতি। একই সঙ্গে লীগের গার্ড বাহিনীর পাবনা জেলা শাখার ক্যাপ্টেন। সে সময় থেকে ক্যাপ্টেন মনসুর আলী নামে পরিচিত। ১৯৫১ আওয়ামী লীগে যোগদান। ১৯৫৩-১৯৬৬ ও ১৯৭২-১৯৭৫ পর্যন্ত

আওয়ামী লীগ কার্যনির্বাহী কমিটির সদস্য। ১৯৫২-র ফেব্রুয়ারি মাসের ভাষা আন্দোলনে পাবনায় নেতৃত্ব প্রদান এবং কারানির্যাতন ভোগ। ১৯৫৪-তে যুক্তফ্রন্টের মনোনয়নে পূর্ববঙ্গ আইন সভার সদস্য নির্বাচিত। ১৯৫৬-র ৬ই সেপ্টেম্বর আতাউর রহমান খানের নেতৃত্বাধীন আওয়ামী লীগ-কংগ্রেস দলীয় পূর্ববঙ্গ কোয়ালিশন সরকারের মন্ত্রী নিযুক্ত। আইন ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রী (সেপ্টেম্বর ১৯৫৬–মার্চ ১৯৫৭), খাদ্য ও কৃষিমন্ত্রী (মার্চ ১৯৫৭–মার্চ ১৯৫৮) এবং বাণিজ্য, শ্রম ও শিল্পমন্ত্রী (মার্চ ১৯৫৮–অক্টোবর ১৯৫৮)। ১৯৫৮-তে সামরিক জান্তা কর্তৃক নিরাপত্তা আইনে গ্রেপ্তার। ১৯৫৯-এর শেষের দিকে মুক্তিলাভ। ১৯৬৭-র ১২ই নভেম্বর আওয়ামী লীগের অন্যতম ভাইস-প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত। ১৯৭০-এর ১৭ই ডিসেম্বর নির্বাচনে পাবনা-১ আসন থেকে পূর্ব পাকিস্তান প্রাদেশিক পরিষদের সদস্য নির্বাচিত। ১৯৭১-র ১৭ই এপ্রিল মুজিবনগরে প্রতিষ্ঠিত স্বাধীন বাংলাদেশ সরকারের অর্থমন্ত্রী নিযুক্ত। বাংলাদেশ স্বাধীন হবার (১৬ই ডিসেম্বর ১৯৭১) পর অর্থ, শিল্প, প্রাকৃতিক সম্পদ ও বাণিজ্য দপ্তরের মন্ত্রী। বঙ্গবন্ধু সরকারের পুনর্গঠিত মন্ত্রিসভায় যোগাযোগ মন্ত্রী (১২ই জানুয়ারি ১৯৭২–৭ই জুলাই ১৯৭৪) এবং স্বরাষ্ট্র ও যোগাযোগ মন্ত্রী (৮ই জুলাই ১৯৭৪–২৫শে জানুয়ারি ১৯৭৫)। ১৯৭৩-এর ৭ই মার্চ পাবনা-১ আসন থেকে পুনরায় জাতীয় সংসদের সদস্য নির্বাচিত। ১৯৭০ ও ১৯৭৩-এর জাতীয় নির্বাচনে আওয়ামী লীগ পার্লামেন্টারি বোর্ডের সদস্য। ১৯৭৫-এর ২৫শে জানুয়ারি দেশে সংসদীয় সরকারের পরিবর্তে এক দলীয় রাষ্ট্রপতি পদ্ধতির সরকার প্রতিষ্ঠিত হলে প্রধানমন্ত্রী নিযুক্ত। ২৪শে ফেব্রুয়ারি (১৯৭৫) কৃষক-শ্রমিক আওয়ামী লীগ (বাকশাল) গঠিত হলে সেক্রেটারি জেনারেল নিযুক্ত। ১৫ই আগস্ট (১৯৭৫) সামরিক বাহিনীর একটি দলের হাতে রাষ্ট্রপতি শেখ মুজিবুর রহমান নিহত হলে আত্মগোপন। ২৩শে আগস্ট মোশতাক সরকার কর্তৃক গ্রেপ্তার। জেলে বন্দি থাকা অবস্থায় কারাগারের প্রচলিত নিয়ম অগ্রাহ্য করে প্রবেশকারী সশস্ত্রবাহিনীর কতিপয় ব্যক্তির হাতে গুলিবিদ্ধ হয়ে নিহত। বাঙালি জাতির স্বাধিকার আন্দোলনে ও বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধে এবং যুদ্ধবিধ্বস্ত বাংলাদেশের পুনর্গঠনে তাঁর অবদান স্মরণীয়। ষাটের দশকের ৬ দফাভিত্তিক বাঙালি জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের অন্যতম রূপকার। স্বাধীন ও সার্বভৌম বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে তাঁর অবদান উল্লেখযোগ্য। মৃত্যু. কেন্দ্রীয় কারাগার, ঢাকা, ৩.১১.১৯৭৫।

আবুল হাসনাত মোহাম্মদ কামরুজ্জামান (১৯২৬-১৯৭৫): জন্ম. রাজশাহী শহর, ১৯২৬। রাজনীতিবিদ। ভূ-স্বামী পরিবারে জন্ম। কামরুজ্জামান নামে সমধিক পরিচিত। ১৯৪৬-এ কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে অর্থনীতিতে অনার্সসহ স্নাতক এবং ১৯৫৬-তে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ল' পাস। ১৯৪২-এ নিখিল বঙ্গ

মুসলিম ছাত্র লীগের রাজশাহী জেলা শাখার সম্পাদক, ১৯৪৩–১৯৪৫ পর্যন্ত নিখিল বঙ্গ মুসলিম ছাত্র লীগের সহ-সভাপতি। ১৯৫৬-তে রাজশাহী আদালতে আইন ব্যবসায় যোগদান। একই বছর রাজশাহী মিউনিসিপালিটির কমিশনার নির্বাচিত এবং আওয়ামী লীগে যোগদান। ১৯৫৫–১৯৬৪ পর্যন্ত রাজশাহী জেলা আওয়ামী লীগের সম্পাদক। ১৯৬২-র এপ্রিল মাসে প্রথমবার ও ১৯৬৫-র মার্চ মাসে দ্বিতীয়বার রাজশাহী থেকে মৌলিক গণতন্ত্রের প্রথায় প্রথম জাতীয় পরিষদের সদস্য নির্বাচিত। ১৯৬২–১৯৬৪ ও ১৯৬৫–১৯৬৯ পর্যন্ত জাতীয় পরিষদের সম্মিলিত বিরোধী দলের সম্পাদক। ১৯৬৭–১৯৭০ পর্যন্ত নিখিল পাকিস্তান আওয়ামী লীগের আহ্বায়ক ও ১৯৭০–১৯৭১ পর্যন্ত নিখিল পাকিস্তান আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক। আইয়ুব সরকারের নির্যাতনের প্রতিবাদে ও ছাত্র সংগ্রাম পরিষদের ১১ দফা দাবির সমর্থনে ১৯৬৯-এর ১২ই ফেব্রুয়ারি জাতীয় পরিষদের সদস্য থেকে পদত্যাগ। আইয়ুববিরোধী গণ-আন্দোলন চলাকালে দেশের রাজনৈতিক সংকট মীমাংসাকল্পে রাওয়ালপিন্ডিতে প্রেসিডেন্ট আইয়ুব খান কর্তৃক আহূত গোলটেবিল বৈঠকে (২৫শে ফেব্রুয়ারি, ১০–১২ই মার্চ ১৯৬৯) আওয়ামী লীগের প্রতিনিধিদলের সদস্য হিসেবে অংশগ্রহণ। ১৯৭০-এর নির্বাচনে রাজশাহী-৬ আসন থেকে জাতীয় পরিষদের সদস্য নির্বাচিত। ১৯৭০ ও ১৯৭৩-এর নির্বাচনে আওয়ামী লীগের পার্লামেন্টারি বোর্ডের সদস্য। ১৯৭১-এ স্বাধীনতা যুদ্ধ চলাকালে মুজিবনগরে গমন। একই বছরের ১৭ই এপ্রিল মুজিবনগরে স্বাধীন বাংলাদেশ সরকার গঠিত হলে ত্রাণ ও পুনর্বাসন মন্ত্রী নিযুক্ত। দেশ স্বাধীন হওয়ার পর ১৯৭১-এর ২৩শে ডিসেম্বর স্বরাষ্ট্র, সাহায্য ও পুনর্বাসন মন্ত্রী নিযুক্ত। ১৯৭২ থেকে ১৯৭৩ পর্যন্ত ত্রাণ ও পুনর্বাসন মন্ত্রী এবং ১৯৭৩ থেকে ১৯৭৪ পর্যন্ত বাণিজ্য মন্ত্রী। ১৯৭৩-এর নির্বাচনে রাজশাহী-১০ ও রাজশাহী-১১ আসন থেকে জাতীয় সংসদের সদস্য নির্বাচিত। ১৯৭৪-এর ১৮ই জানুয়ারি মন্ত্রিসভা থেকে পদত্যাগ। একই বছরের ২০শে জানুয়ারি কাউন্সিল অধিবেশনে আওয়ামী লীগের সভাপতি নির্বাচিত এবং ১৯৭৫-এর ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত এ পদে অধিষ্ঠিত। একই বছরের ২৫শে জানুয়ারি (১৯৭৫) মন্ত্রিসভা পুনর্গঠিত হলে শিল্পমন্ত্রীর দায়িত্ব লাভ। ১৯৭৫-এর ৭ই জুন বাকশালের কার্যনির্বাহী কমিটির সদস্য নিযুক্ত। ঐ বছরের ১৫ই আগস্ট সামরিক বাহিনীর একটি দলের হাতে রাষ্ট্রপতি শেখ মুজিবুর রহমান নিহত হলে মন্ত্রিত্ব হারান ও কারারুদ্ধ হন। একই বছরের নভেম্বর মাসে জেলে বন্দি থাকা অবস্থায় কারাগারের প্রচলিত নিয়ম অগ্রাহ্য করে প্রবেশকারী সশস্ত্রবাহিনীর কতিপয় ব্যক্তির হাতে গুলিবিদ্ধ হয়ে নিহত। কামরুজ্জামান বাঙালি জাতীয়বাদী আন্দোলনের স্থপতিদের একজন। বাঙালির স্বাধিকার আন্দোলন ও স্বাধীনতা যুদ্ধে তাঁর দান অপরিসীম। মৃত্যু. কেন্দ্রীয় কারাগার, ঢাকা, ৩.১১.১৯৭৫।

———○———

জননন্দিত হুমায়ূন আহমেদ

ড. শিহাব শাহরিয়ার

"জোছনা নামক এই ফ্রাংকেনস্টাইন আমার নিজের তৈরি করা। আমার বেশ কিছু বইতে আমি জোছনা-বন্দনা করেছি। 'এইসব দিনরাত্রি' নামের নাটকের পাত্র-পাত্রীরা ভরা জোছনায় ছাদে বসে গান গাইছে' 'আজ জোছনা রাতে সবাই গেছে বনে'। হিমু বিষয়ক কোনো একটা বই-এ হিমু বলেছে, ঢাকা শহরের লোকজন জোছনা দেখতে পারে না, কাজেই ঢাকার মেয়র সাহেবের উচিত অন্তত পূর্ণিমার রাতে এক ঘণ্টার জন্যে ইলেকট্রিসিটি বন্ধ করে পুরো শহর অন্ধকার করে দেয়া, যাতে শহরের মানুষ এক ঘণ্টার জন্যে হলেও প্রাণ ভরে জোছনা দেখতে পারে। এইসব পড়ে-টড়ে কারো কারো সম্ভবত ধারণা হয়েছে–আমি খুবই অস্বাভাবিক একজন মানুষ। 'ওয়ের উলফ'-এর মতো পূর্ণচন্দ্র দেখলেই আমার সবকিছু এলোমেলো হয়ে যায়। লোকজনের এই ধারণা ভাঙাবার চেষ্টাও খুব সচেতনভাবে আমি কখনো করিনি। আমি যে খুবই একজন সাধারণ মানুষ, আর দশটা সাধারণ মানুষের চেয়ে বেশি জোছনাপ্রীতি আমার নেই–এটা বলতে ইচ্ছা করে না। হয়ত বা মনের গভীরে একটা বাসনাও আছে– 'কেউ কেউ আমাকে সাধারণ ভাবছে ভাবুক না'। ক্ষতি তো কিছু হচ্ছে না। মানুষ মিথ তৈরি করে আনন্দ পায়, তাদেরকে সেই আনন্দ থেকে বঞ্চিত করার দরকার কী?"

হুমায়ূন আহমেদের 'জোছনা বিলাস' প্রবন্ধ থেকে উল্লিখিত অংশটুকু তুলে ধরলাম। জ্যোৎস্না বিলাসী হুমায়ূন আহমেদ ঠিকই বলেছেন যে, মানুষ মিথ তৈরি করে আনন্দ পায়, তাদেরকে আনন্দ থেকে বঞ্চিত করার দরকার কী? এই বাক্যটি তিনি যেমন ইউনিভার্সেল করেছেন, তেমনি তিনি বাংলাদেশের মানুষের জন্যে, বাংলা ভাষাভাষী পাঠকের কাছে তাঁর লেখার মাধ্যমে শুধু আনন্দই বিলাননি, একটি মিথও তৈরি করেছেন, বা নিজেও গল্পের মিথ হয়েছেন। লিখেছেন– কবিতা, গল্প, উপন্যাস, নাটক, গান, শিশুতোষ ও কিশোর উপন্যাস, ভ্রমণকাহিনি, আত্মজীবনী ও স্মৃতিকথা, বৈজ্ঞানিক কল্পকাহিনি। পাশাপাশি তিনি চিত্রনাট্যকার, চলচ্চিত্র ও নাট্য নির্মাতা এবং রবীন্দ্রনাথের মতো জীবনের শেষে এসে আঁকলেন দৃষ্টিনন্দিত বেশ কিছু ছবি, অর্থাৎ একজন চিত্রকরও তিনি। এই অর্থে তিনি বহুমাত্রিক লেখক। তিনি বাংলা সাহিত্যের সেই নন্দিত লেখক যিনি তাঁর লেখার মাধ্যমে পাঠক তৈরিতে অনন্য ভূমিকা পালন করেছেন। বিশেষ করে তরুণ বয়সের মানুষেরা তাঁর প্রত্যেকটা লেখা পড়ে আনন্দ আহরণ করেছেন। তাঁর একটি বই প্রকাশের সাথে সাথে তরুণরা ঝাঁপিয়ে পড়েন। লেখার মাধ্যমে তারুণ্যকে জয় করা অর্থাৎ লেখার মাধ্যমে জনপ্রিয়তার শীর্ষে পৌঁছানো যায়, তার সবচেয়ে বড়ো উদাহরণ বা কীর্তিমান মানুষটির নাম হুমায়ূন আহমেদ।

১৯৭২ সাল, সার্বভৌম বাংলাদেশ রাষ্ট্রের যাত্রা শুরু হলো, কাকতালীয় সেই একই বছরে হুমায়ূন আহমেদ তাঁর প্রথম উপন্যাস *নন্দিত নরকে* লিখে বাংলা সাহিত্যে নিজের যাত্রা আরম্ভ করেন। তারপর *শঙ্খনীল কারাগার*। এই দুই উপন্যাস দিয়েই শক্তিশালী আগমনী বার্তা দিলেন। মধ্যবিত্ত বাঙালির আবেগময় গল্প বুনলেন এবং পাঠকরাও সেই মধ্যবিত্ত মানুষ। চরিত্র নীলু-বীলু মধ্যবিত্ত ঘরের নারীরা ঘোর লাগিয়ে দিলো ব্রহ্মপুত্রের জলের মতো। সেন্টিমেন্ট, সমাজের চোখে আলো ফেলল। এসব চরিত্র নির্মাণের মধ্য দিয়ে তিনি পাড়ি দিতে শুরু করলেন টেকনাফ থেকে তেঁতুলিয়ার দিকে। তাঁর গাড়ি কখনো থামেনি। দিনরাত, সকাল-সন্ধ্যা নিরন্তর, অবিরত চলেছে, চলেছে। তাঁর গাড়ির নাম ফাউন্টেন পেন বা বলপেন বা জেল পেন। পেনের কালি কখনো শুকাতে দেননি। তাঁর লেখার অক্ষরে কখনো শোনা গেছে গৌরীপুর, নান্দাউল, মোহনগঞ্জ, কখনো বা নিউইয়র্কের রোদ, কখনো বা কলম্বোর কলতান বা সেইগিরেয়ার ছায়াতল। তিনি গল্পটা বুনতে পারতেন সুনিপুণভাবে। সহজসরল ও হৃদয়গ্রাহী করে। বুঝতেন মানুষের নার্ভ, বুঝতেন মধ্যবিত্তের মন। তারুণ্যকে জাগাতে চেয়েছিলেন। পাঠমুখী মানুষ তৈরি করতে চেয়েছিলেন এবং সেটি শতভাগ পেরেছিলেন। তাঁর সবচেয়ে বড়ো চেতনা ছিল মাতৃভূমি বাংলাদেশ। মুক্তিযুদ্ধকে দেখেছেন গভীরভাবে। অনেকেই জানেন, পাকিস্তানি হানাদার বাহিনী তাঁকে একাত্তর সালে আটক করে, তাঁর ওপর নির্যাতন চালায় এবং গুলি করে কিন্তু অলৌকিকভাবে বেঁচে যান তিনি। এই দেশপ্রেমী যখন মুক্তিযুদ্ধ ও রাজনীতি নিয়ে লিখেন– *সৌরভ*, *আগুনের পরশমণি*, *অনিল বাগচীর একদিন*, *শ্যামল ছায়া*, *জ্যোৎস্না ও জননীর গল্প*, *দেয়াল* এবং *একাত্তর*

ও আমার বাবা উপন্যাসসমূহ তখন পুরো বাংলাদেশকেই যেন ধারণ করেন অথবা বুকের ভেতর রেখে দেন ছাপ্পান্ন হাজার বর্গমাইল। যে বর্গমাইলজুড়ে বর্বর পাকিস্তানি হানাদার চালিয়েছে নির্মম হত্যাযজ্ঞ, রক্তাক্ত করেছে প্রান্তরের পর প্রান্তর। তিনি এসব দেখেছেন, শুনেছেন, বুঝেছেন এবং পরবর্তীকালে কলম ধরেছেন এবং খুরধার কলমে তুলে এনেছেন দুঃখী বাংলার মহান মুক্তিযুদ্ধ, যুদ্ধে অবতীর্ণ বাঙালির ক্ষয়ক্ষতি, মানুষের হাহাকার, অসহায়ত্ব, বেদনা, রাজনৈতিক নেতৃত্বের দৃঢ়তা, অবশেষে বিজয় অর্থাৎ ১৯৭১ সালের ক্লেদাক্ত, বাঙালির নিপীড়িত হওয়ার পুরো কাহিনিকে ব্যক্ত করার বলিষ্ঠ প্রয়াস চালিয়েছেন তাঁর উল্লিখিত উপন্যাসগুলোতে এবং এই উপন্যাসগুলো মুক্তিযুদ্ধের ওপর লেখা সফল উপন্যাস।

বিজ্ঞানের ছাত্র, বিজ্ঞানের শিক্ষক, মার্কিন মুল্লুক থেকে উচ্চতর ডিগ্রি ও পিএইচডি অর্জন করেছেন– এই অর্জন ও জ্ঞান-গরিমা এবং অভিজ্ঞতাকে কাজে লাগিয়েই খুবই সচেতনভাবে নেমে পড়েছিলেন উর্বর বাংলা সাহিত্যের পলিমাটিতে। কবিতা দিয়েই অনেক লেখকের মতো শুরু করলেও, পরিণত হয়ে উঠলেন কথাসাহিত্যে। বাংলাদেশের সাহিত্যে তিনিই একমাত্র লেখক যিনি সার্বক্ষণিক লিখেছেন। এজন্য ছেড়ে দিয়েছিলেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকতা। একটার পর একটা উপন্যাস লিখে বাংলাদেশের সাহিত্যে আলোড়ন তুললেন। কেউ কেউ তাঁকে তরল কাহিনিকারও বললেন। কিন্তু না, পাঠক তৈরি এবং পাঠকের মাধ্যমে জনপ্রিয় ও নন্দিত হয়ে ওঠা চাট্টিখানি কথা নয়। হুমায়ূন আহমেদ নিশ্চয়ই সস্তা জনপ্রিয়তার জন্য লিখেননি। তাঁর লেখার মেধা, দক্ষতা, প্রখর সৃজনক্ষমতা ছিল– অস্বীকার করার উপায় নেই। স্বাধীন বাংলাদেশে এত পাঠক তৈরি করা কোনো লেখকের পক্ষে সম্ভব হয়নি, যেটি তিনি করতে পেরেছিলেন এবং সফলভাবেই। তাঁর প্রকাশিত উপন্যাসগুলো যেমন–*নন্দিত নরকে, শঙ্খনীল কারাগার, আমার আছে জল, ফেরা, প্রিয়তমেষু, সম্রাট, আকাশ জোড়া মেঘ, দ্বৈরথ, সাজঘর, এইসব দিনরাত্রি, অন্ধকারের গান, সমুদ্র বিলাস, অয়োময়, বহুব্রীহি, নীল অপরাজিতা, দুই দুয়ারী, আশাবরী, কোথাও কেউ নেই, দি একসরসিস্ট, পাখি আমার একলা পাখি, জলপদ্ম, আয়নাঘর, কৃষ্ণপক্ষ, তুমি আমায় ডেকেছিলে ছুটির নিমন্ত্রণে, জল জোছনা, পোকা, মন্দ্রসপ্তক, তিথির নীল তোয়ালে, নবনী, ছায়াবীথি, জয়জয়ন্তী, যখন গিয়েছে ডুবে পঞ্চমীর চাঁদ, তোমাকে, শ্রাবণ মেঘের দিন, গৌরীপুর জংশন, জীবনকৃষ্ণ মেমোরিয়াল ইস্কুল, পারুল ও তিনটি কুকুর, পেন্সিলে আঁকা পরী, কবি, আমাদের শাদা বাড়ি, জলকন্যা, দূরে কোথায়, রুমালী, অপেক্ষা, মেঘ বলেছে যাব যাব, কালো যাদুকর, চৈত্রের দ্বিতীয় দিবস, মীরার গ্রামের বাড়ি, ইস্টিশন, এই মেঘ, রৌদ্রছায়া, রূপার পালঙ্ক, বৃষ্টি বিলাস, যদিও সন্ধ্যা, আজ চিত্রার বিয়ে, তেতুল বনে জোছনা, বৃষ্টি ও মেঘমালা, মৃন্ময়ী, কুটু মিয়া, নীল মানুষ, আসমানীরা তিন বোন, বাসর, একজন মায়াবতী, উড়ালপঙ্খি, অচিনপুর, আজ আমি কোথাও যাব না, আমি এবং কয়েকটি প্রজাপতি, রজনী, রোদনভরা এ বসন্ত, একা একা, প্রথম প্রহর, দিনের শেষে, নক্ষত্রের রাত, এপিটাফ, এই বসন্তে, লীলাবতী, সেদিন চৈত্রমাস, অরণ্য, কে কথা কয়, মৃন্ময়ীর মন ভালো নেই, কুহুরানী, লিলুয়া বাতাস, কিছুক্ষণ, মধ্যাহ্ন, অপরাহ্ণ, অমানুষ, চক্ষে আমার তৃষ্ণা, দিঘির জলে কার ছায়া গো, বাদল দিনের দ্বিতীয় কদম ফুল, নির্বাসন, সবাই গেছে বনে, সে ও নর্তকী, মানবী, সানাউল্লার মহাবিপদ, অন্যদিন, চাঁদের আলোয় কয়েকজন যুবক, নলিনী বাবু বি.এসসি, মাতাল হাওয়া, রূপা, ম্যাজিক মুনশি, একটি সাইকেল এবং কয়েকটি ডাহুক পাখি, বাদশাহ নামদার, আমরা কেউ বাসায় নেই, দাঁড়কাকের সংসার কিংবা মাঝে মাঝে তব দেখা পাই* এবং *মেঘের ওপর বাড়ি*–বাংলা ভাষাভাষী বৃহত্তর পাঠকের অনুভূতিকে দারুণ নাড়া দিয়েছে। এমনকি ভারতের পশ্চিমবঙ্গ, আসামসহ পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে বসবাসরত বাংলা বইয়ের পাঠকের কাছে তিনি নন্দিত ও আদৃত হয়েছেন।

রসায়ন শাস্ত্রের শিক্ষক ধীরে ধীরে হয়ে উঠলেন একজন হিমুর স্রষ্টা, মিসির আলি আর শুভ্রর স্রষ্টা। আমাদের চোখের সামনেই হয়ত এই হিমু ও মিসির আলি ঘোরাফিরা করেন, কিন্তু আমরা দেখি না বা চিনি না বা কথা বলি না। অথচ হুমায়ূন আহমেদ ঠিকই দৃষ্টির গভীর আলো ফেলে তুলে ধরেছেন হিমু, মিসির আলি ও শুভ্র সিরিজে। এই তিন চরিত্রের দিকে দৃষ্টি দেওয়া যাক। হুমায়ূন আহমেদ নিজেই বলেছেন, 'পৃথিবীতে রং তিনটি– লাল, নীল ও হলুদ'। তিনি তিন নম্বর রংটি হিমুর গায়ে পরিয়ে দিলেন। বাংলাদেশে অসংখ্য হলুদ রঙের তরুণ-তরুণীতে ভরে গেল। আমাদের মনে হলো বসন্তে তিনি হলুদ রং ছড়িয়ে দিয়ে গাছে বসে যেন কোকিলের সুর তুললেন। অর্থাৎ তারুণ্যকে জাগিয়ে তুললেন। হিমু সেই তরুণ বা যুবক, যে প্রতিযুক্তিতে বিশ্বাসী, ইচ্ছে করেই কর্মহীন থাকে, এলোমেলো জীবনযাপন করে, বাবার দেওয়া নাম হিমালয় থেকে হিমু হয়ে ওঠেন স্বতন্ত্র, রসবোধসম্পন্ন, লোভ, লালসা, ঈর্ষা ও ভয়হীন একজন ব্যক্তি। হলুদ পাঞ্জাবি পরে এলোমেলো সারা শহর ঘুরে বেড়ান, একজন মহাপুরুষের মতো নিজেকে জাহির করেন আর প্রেম-ভালোবাসাকে উপেক্ষা করেন–এই

রকমের একজন যুবককে তুলে ধরতে তিনি লিখেছেন– *ময়ূরাক্ষী*, *দরজার ওপাশে*, *হিমু*, *পারাপার*, *এবং হিমু*, *হিমুর হাতে কয়েকটি নীলপদ্ম*, *হিমুর দ্বিতীয় প্রহর*, *হিমুর রূপালী রাত্রি*, *একজন হিমু কয়েকটি ঝিঁঝিঁ পোকা*, *তোমাদের এই নগরে*, *চলে যায় বসন্তের দিন*, *সে আসে ধীরে*, *আঙুল কাটা জগলু*, *হলুদ হিমু কালো র‍্যাব*, *আজ হিমুর বিয়ে*, *হিমু রিমান্ডে*, *হিমুর মধ্যদুপুর*, *হিমুর নীল জোছনা*, *হিমুর আছে জল*, *হিমু এবং একটি রাশিয়ান পরী*, *হিমু এবং হার্ভার্ড PhD বল্টুভাই*– মোট ২২টি উপন্যাস। এই হিমুকে নিয়ে যদি আমরা বাংলাদেশের আশির দশকের সমাজের গভীরে যাই, দেখব এরকম বিশ্ববিদ্যালয় পাস করা অথবা পড়াশুনা থেকে ছিটকে পরা অসংখ্য যুবক ঢাকা শহরে ঘুরে বেড়াচ্ছেন, রাস্তাঘাট, চায়ের দোকানে বসে আছেন ঘণ্টার পর ঘণ্টা, ফুটপাতে হেঁটে বেড়াচ্ছেন, যেখানে লুকিয়ে আছে সেই মধ্যবিত্ত মন। হুমায়ূন আহমেদ সমাজের নার্ভটা ধরতে পেরেছিলেন, কিন্তু তা যখন বয়ান করেছেন, সেখানে তিনি কঠিনকে সহজ করে উপস্থাপন করেছেন, যাতে বৃহত্তর পাঠককুল আদৃত হন।

হিমুর মতো একইভাবে সৃষ্টি করলেন রহস্যময় ও জনপ্রিয় আরেকটি চরিত্র মিসির আলি। এই মিসির আলি একেবারে হিমুর বিপরীত চরিত্র, যিনি বয়স্ক এবং বিশুদ্ধ যুক্তিবাদী। মিসির আলি প্রকৃতির রহস্য উদ্‌ঘাটন করতে চান। তার চরিত্রের নানামাত্রিক বৈশিষ্ট্য তুলে ধরতে তিনি লিখেছেন– *দেবী*, *নিশীথিনী*, *অন্যভুবন*, *নিষাদ*, *বৃহন্নলা*, *ভয়*, *বিপদ*, *অনীশ*, *আমি এবং আমরা*, *মিসির আলির আমীমাংসিত রহস্য*, *তন্দ্রাবিলাস*, *আমিই মিসির আলি*, *বাঘবন্দী মিসির আলি*, *কহেন কবি কালিদাস*, *হরতন ইশকাপন*, *মিসির আলির চশমা*, *মিসির আলি! আপনি কোথায়*, *মিসির আলি UNSOLVED*, *পুফি*, *যখন নামিবে আঁধার* উপন্যাসসমূহ। এগুলো পাঠক মহলে বেশ সাড়া জাগিয়েছে। আরেকটি চরিত্র শুভ্র। এই শুভ্রকে নিয়ে তিনি ছয়টি উপন্যাস লিখেছেন। সেগুলো হলো: *দারুচিনি দ্বীপ*, *মেঘের ছায়া*, *রূপালী দ্বীপ*, *শুভ্র*, *এই শুভ্র! এই* এবং *শুভ্র গেছে বনে*। শুভ্র বিষয়ক এই ছয়টি উপন্যাস লিখেছেন তিনি প্রায় দুই দশক সময় পরিসরে। হিমু, মিসির আলির পর শুভ্র চরিত্রটিও তাঁর অভিজ্ঞতা, পরিকল্পনা ও ইচ্ছা সৃজনের একটি বিশেষ চরিত্র। এই শুভ্ররও একটা বৈশিষ্ট্য হলো, সে একজন শুদ্ধতম মানুষ। এই শুদ্ধতা তার মনোভাবে এবং বহিঃপ্রকাশে। আমাদের সমাজে এরকম মানুষ আছে বলেই হুমায়ূন আহমেদ এদিকে নিজস্ব আলো ফেলে, মানব চরিত্রের একটি অংক কষেছেন। লেখকের আলাদা দৃষ্টিভঙ্গি থাকতেই পারে এবং তাঁর সাধনায় শুভ্রকেও একটি জনপ্রিয় চরিত্র হিসেবে তিনি দাঁড় করাতে পেরেছেন।

বিজ্ঞান ও কল্পকাহিনি নিয়েও তাঁর বারোটি উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ রয়েছে। এগুলো হলো: *তারা তিনজন*, *তোমাদের জন্য ভালোবাসা*, *নি*, *ফিহা সমীকরণ*, *শূন্য*, *ইমা*, *ওমেগা পয়েন্ট*, *ইরিনা*, *দ্বিতীয় মানব*, *অনন্ত নক্ষত্রবীথি*, *কুহক* ও *মানবী*। বিজ্ঞান ও কল্প জগৎ সম্পর্কে যারা বেশ আগ্রহী, তাদের কথা চিন্তা করে এই গ্রন্থগুলো তিনি রচনা করেছেন। গ্রন্থগুলোর নামকরণের ক্ষেত্রেও তাঁর বুদ্ধিদীপ্তি কাজ করেছে। ধরুন, নি। এক অক্ষর দিয়ে বইয়ের নাম। পাঠকের কাছে আকর্ষণ তৈরি করে সেই বইটি পাঠ করার আহ্বান তিনি সহজেই করেছেন। তাঁর একটি বড়ো গুণ, তিনি যে গল্পটাই বলতে চান, তা নদীর স্রোতের মতো টেনে নিয়ে যান, পাঠকও একটানে পড়ে ফেলেন। একই কথা তাঁর আত্মজীবনী ও স্মৃতিকথা বিষয়ক গ্রন্থগুলোর ক্ষেত্রেও। গ্রন্থগুলোর নামই যেন টানে স্মৃতির জগতে, যেমন– *এলেবেলে*, *আমার ছেলেবেলা*, *অনন্ত অম্বরে*, *আমার আপন আঁধার*, *এই আমি*, *আপনারে আমি খুঁজিয়া বেড়াই*, *সকল কাঁটা ধন্য করে*, *ছবি বানানোর গল্প*, *কিছু শৈশব*, *বলপয়েন্ট*, *কাঠপেন্সিল*, *ফাউন্টেনপেন*, *রঙপেন্সিল*, *নিউইয়র্কের নীলাকাশে ঝকঝকে রোদ*, *বস বিলাপ*। *পাশাপাশি তাঁর ভ্রমণ বিষয় বই– হোটেল গ্রেভার ইন*, *মে ফ্লাওয়ার*, *যশোহা বৃক্ষের দেশে*, *দেখা না-দেখা*, *রাবনের দেশে আমি ও আমরা*, *পায়ের তলায় খড়ম*। শিশু ও কিশোরদের জন্য লেখা তাঁর গ্রন্থসমূহ– *সূর্যের দিন*, *পুতুল*, *বোতল ভূত*, *ভূত ভূতং ভূতৌ*, *নুহাশ এবং আলাদিনের আশ্চর্য চেরাগ*, *পিপলী বেগম*, *বোকাভু*, *পরীর মেয়ে মেঘবতী*, *চেরাগের দৈত্য এবং বাবলু*, *তোমাদের জন্য রূপকথা*, *কানী ডাইনী*, *ছোটদের জন্য এক ব্যাগ হুমায়ূন*, *বোকা রাজার সোনার সিংহাসন*, *টগর এন্ড জেরী*, *ব্যাঙ কন্যা এলেং*, *কাক ও কাঠগোলাপ*, *তিনি ও সে*, *হিমু মামা*, *ছেলেটা*, *মিরখাইয়ের অটোগ্রাফ*, *হলুদ পরী*, *বনের রাজা*, *ভূতমন্ত্র*, *রাক্ষস খোক্কস* এবং *ভোক্ষস* এবং তাঁর কয়েকটি নাটক– 'নৃপতি', 'স্বপ্ন ও অন্যান্য', 'মহাপুরুষ' এবং মঞ্চ নাটক: '১৯৭১'। এই সব লেখা দিয়ে অল্প সময়ের মধ্যে তিনি বাংলা সাহিত্যকে সমৃদ্ধ করে গেছেন।

আপনারা সবাই লক্ষ করেছেন যে, বইমেলায় যখন তাঁর প্রকাশিত বই নিয়ে স্টলে বসতেন, তখন হাজার হাজার, লক্ষ লক্ষ পাঠক তাঁর অটোগ্রাফসহ বই নিতে দীর্ঘ লাইনে দাঁড়িয়ে থাকতেন। এটি অন্যভাবে নেওয়া যাবে না, কারণ এই পাঠকসব হুমায়ূন আহমেদ তাঁর মেধা ও সৃজন ক্ষমতা দিয়ে তৈরি করছেন। তিনি শুধু লিখতেন আর ভ্রমণ করতেন। বাইরের কোনো আড্ডা, অনুষ্ঠান কিংবা বক্তৃতা দিতে যেতেন না। লেখাই যে কর্ম এবং এক অর্থে ধর্ম ছিল। নিজের সৃজন দিয়ে অন্যের মনকে জাগিয়ে তোলা এক কঠিন সাধনা। এই সাধনায় মত্ত থেকে দিন পার করেছেন তিনি। তবে তাঁর কাছে গেলে, তিনি বিরক্ত হতেন না বরং আহ্বান জানিয়ে জম্পেস আড্ডায় মাততেন। মনে আছে ধানমন্ডিতে তাঁর 'দখিণ হাওয়া' বাড়িতে গিয়ে ঘণ্টা দুয়েক সময় আড্ডা দিয়েছিলাম। এটি তাঁর মৃত্যুর বছর খানেক আগে একদিন, সেদিন আমার অগ্রজ কবি ও সাংবাদিক সাইফুল্লাহ মাহমুদ এবং আমি গিয়েই দেখলাম ড্রয়িং রুমের মেঝেতে একটি পাটি বিছানো। আমরা গিয়ে সোফায় বসলাম। কিছুক্ষণ পর ভেতর থেকে হুমায়ূন আহমেদ আসলেন এবং সোফায় না বসে সরাসরি নীচে বিছানো পাটিতে বসলেন। আমরা তো অবাক, বললাম, হুমায়ূন ভাই নীচে কেন, উপরে বসুন? উত্তরে বললেন, আমার সব সময় নীচে বসতেই আরাম লাগে। তখন আমরা নীচের পাটিতে বসলাম। কুশলাদি জিজ্ঞেস করেই তিনি কথা শুরু করলেন, জানো, কয়েকদিন আগে দুটি মাদ্রাসার ছেলে আমাকে হত্যা করতে আমার বাসায় এসেছিল। আমি দরজা খুলেই তাদেরকে জিজ্ঞেস করলাম তোমরা কারা? আমার কাছে কেন এসেছ। উত্তরে জানাল, আপনাকে হত্যা করতে এসেছি, কারণ আপনি দেশের তরুণ-তরুণীদের নষ্ট করছেন। আমি বললাম, হত্যা পরে করো, আগে ভেতরে এসো, তোমাদের কথা আরও শুনি। কথা মতো তারা ভেতরে এলো, আমি আমার স্বভাবসুলভ সাহিত্য, সংস্কৃতি, মাদ্রাসা, ইসলাম ও বাংলাদেশ নিয়ে খুব মজা

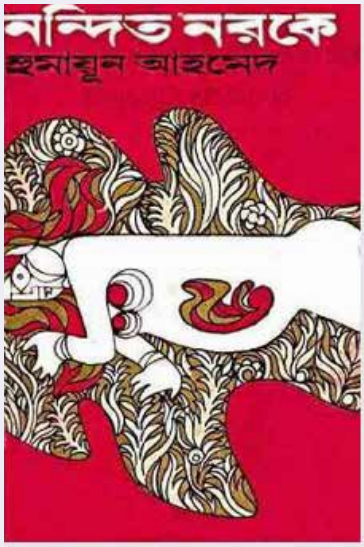

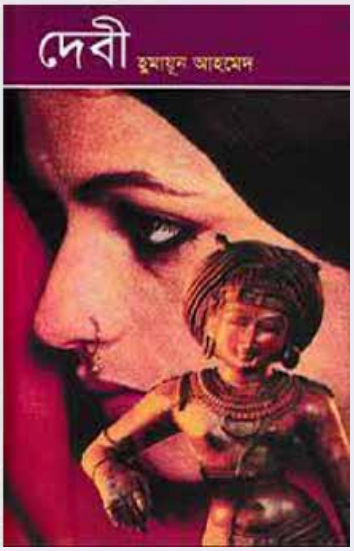

ও সহজ করে তাদের বললাম। তারা শুনে আমাকে হত্যা না করে, বরং আমার সঙ্গে চা খেয়ে এবং আমার পায়ে সেলাম করে বিদায় নিলো। এরপর বাংলা সংস্কৃতি নিয়ে একটি চমৎকার গল্প বললেন। গল্পটি এরকম: 'কোনো এক গ্রীষ্মের সকালে আমেরিকার একটি ফুটপাত ধরে দুই জন অধ্যাপক হেঁটে তাদের বিশ্ববিদ্যালয়ে দিকে যাচ্ছেন। এদের একজন সাদা রঙের, অন্যজন শ্যামলা রঙের। পাশাপাশি যেতে যেতে হঠাৎ দু'জনের গায়ে ঘষা লেগে গেল। তখন সাদা ভদ্রলোকটি, শ্যামলা ভদ্রলোককে বললেন, তুমি একটা অসভ্য। উত্তরে শ্যামলা ভদ্রলোকটি বললেন, তুমিই অসভ্য। প্রতি উত্তর, কীভাবে? প্রতি উত্তর, তোমার সভ্যতা পাঁচশো বছরের আর আমার সভ্যতা আড়াই হাজার বছরের' (শ্যামলা মানুষটি হুমায়ূন আহমেদ নিজেই)। গর্ব ও গৌরবের জায়গাটি ওখানেই। একজন সংস্কৃতিবান বা শিক্ষিত বা একজন সুসাহিত্যিক হিসেবে হুমায়ূন আহমেদ বাংলা সংস্কৃতির ল্যান্ডস্ক্যাপকে বুঝেছেন। তাঁর মতো অসংখ্য সংস্কৃতিবান মানুষ আমাদের সমাজে আছে এবং আছে বলেই আমাদের সংস্কৃতি এতো উঁচুতে। বাংলা ভাষার প্রতিও ছিল তাঁর অসম্ভব দরদ। সেই দরদ থেকেই লিখেছেন একের পর এক লেখা। লিখেছেন প্রায় ৩৪৫টি গ্রন্থ। সেদিনই একটি প্রশ্ন করেছিলাম যে, হুমায়ূন ভাই–বাংলাদেশের মোট জনসংখ্যার এক-তৃতীয়াংশ যুবসমাজ, এদের অধিকাংশই কর্মহীন, এই কর্মহীন বা বেকার যুবকদের নিয়ে আপনার মন্তব্য কী? কারণ আপনি তো এদের মনন গঠনে একটার পর একটা উপন্যাস লিখছেন? উত্তরে তিনি বলেছিলেন, যুবকরা দেশের সম্পদ, এদের মাধ্যমেই অধিকাংশ রেমিটেন্স আসছে আর ভবিষ্যতে ইউরোপের দেশগুলোতে ধীরে ধীরে জনসংখ্যা কমে যাচ্ছে আর বাঙালি যুবকরা সেখানে গিয়ে বসবাস করবে এবং দেশের জন্য আশীর্বাদ হবে। রবীন্দ্রনাথ, নজরুল যেমন তারুণ্যের জয়গান করেছেন, তেমনি হুমায়ূন আহমেদেরও যুবসমাজ অর্থাৎ তারুণ্যকে নিয়ে ভীষণ আশাবাদ ছিল।

হুমায়ূন আহমেদ খুব মজার এবং ব্যতিক্রমী স্বভাবের মানুষ ছিলেন। তাঁর এক সাক্ষাৎকারে বলেছেন, একবার ছেলেমেয়ে ও স্ত্রী নিয়ে ট্রেনে নিজ এলাকা গৌরিপুর থেকে ঢাকায় ফিরছিলেন। ট্রেন ময়মনসিংহে আসার আগে তাঁর এক কন্যা বলল, বাবা ঢাকায় না গিয়ে চলো কক্সবাজার যাই? তিনি বললেন, চলো। ট্রেন চেঞ্জ করে তারা প্রথমে চট্টগ্রাম ও পরে সেখান থেকে কক্সবাজার যান। কক্সবাজার যাবার পর কন্যাটি আবার বলল, বাবা কক্সবাজার তো এলাম, চলো সেন্টমার্টিন দ্বীপ ঘুরে আসি। আচ্ছা চলো। তো কক্সবাজার থেকে তাঁরা সেন্টমার্টিন গেলেন। চমৎকার এই দ্বীপটি দেখে তাঁদের ভালো লেগে গেল। তখন কন্যা আবার বলল, বাবা, সেন্টমার্টিন তো অনেক সুন্দর, এখানে একটি জায়গা কিনে বাড়ি বানাও না বাবা? তিনি বললেন, ঠিক আছে। আপনারা সেন্টমার্টিনে গিয়ে কাঠের তৈরি সেই বাড়িটি কেউ দেখেছেন কি না? আমি বেড়াতে গিয়ে সেই বাড়িটি দেখেছি? সুন্দর, ঘরে বসেই দেখা যায় নীল জলের বঙ্গোপসাগর। এই যে এক ধরনের পাগলামি, সেটিকে খাটো করে দেখার কিছু নেই। কারণ জীবনের থেকে আনন্দ আহরণের অভিপ্রায় এক এক জনের এক এক রকম। হুমায়ূন আহমেদ তাঁর জীবনকে গ্রহণ করেছেন তাঁর মতোই করে। সেখানে কাউকে অনুসরণ বা অনুকরণ করার কোনো দায় নেই তাঁর। কারণ যিনি পেশাদার লেখক হিসেবে– নাটক লিখে, উপন্যাস লিখে যে সম্মানি পেয়েছেন, তা দিয়েই তিনি ধীরে ধীরে তাঁর জীবনকে বদলেছেন। সার্বক্ষণিক লিখে জীবনকে বদলানো, বাংলাদেশের আর কোনো লেখক করতে পেরেছেন কি না আমি জানি না।

মনে হয়, রবীন্দ্রনাথের শান্তি নিকেতনকে সামনে রেখে তিনি গাজীপুরে গড়ে তুলেছিলেন নুহাশ পল্লী। সেখানে বসেই লিখবেন গল্প, উপন্যাস, নাটক, গান, চিত্রনাট্য। নির্মাণ করবেন নাটক, চলচ্চিত্র। শুরুও করেছিলেন কিন্তু মরণব্যাধি ক্যান্সার তাঁর সেই মনোবাসনা পূর্ণ করতে দেয়নি। মাত্র ৬৪ বছর বয়সে অনন্তলোকে চলে যান হুমায়ূন আহমেদ। তাঁর মৃত্যুতে অপূরণীয় ক্ষতি হয়েছে বাংলা সাহিত্যের।

ড. শিহাব শাহরিয়ার: কবি, প্রাবন্ধিক ও কিপার, জনশিক্ষা বিভাগ, বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘর, ঢাকা, editor.boitha@gmail.com

হেমন্ত: শীতের আগমনী বার্তা

ড. আবদুল আলীম তালুকদার

ঋতু বদলের সঙ্গে সঙ্গে বদলায় বাংলার প্রকৃতি ও জীবন। দক্ষিণ-পশ্চিম মৌসুমি বায়ু বাংলাদেশ থেকে বিদায় নেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে শীতের আমেজ শুরু হয়ে যায়। তখন উত্তর দিকে হিমালয় অঞ্চল থেকে শীত নামানো হাওয়া আসতে শুরু করে। প্রকৃতির এই পালাবদলে ষড়ঋতুর পথ পরিক্রমায় শুরু হলো হেমন্তকাল। সকালের শিশিরভেজা ঘাস আর হালকা কুয়াশায় শীতের আগমনী বার্তা নিয়ে হাজির হলো বাংলাদেশের প্রকৃতির এক অন্যতম প্রধান এ ঋতু। প্রকৃতি এসময়ই শীতের পরশ বুলিয়ে দেওয়া শুরু করে। দিনে সূর্যের তাপের প্রখরতাও কমতে থাকে। সকালের কোমল রোদে শিশির বিন্দু মুক্তদানার মতো জ্বলজ্বল করে ওঠে। মাঠে-ঘাটে শ্রমজীবীরা একটু স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলার অবকাশ পায়। পশ্চিমাকাশে সূর্য ঢলে পড়লে আরামবোধ যেন আরও বেড়ে যায়। সকালের মতোই সন্ধ্যার পল্লি যেন নীল কুয়াশার আঁচলে আচ্ছাদিত হয়ে যায় পরম মমতায়। গ্রামবাংলা তো বটেই, শহরেও এসময় কখনও বয়ে যায় শিরশিরে উত্তরা সমীরণ। রাত যত বাড়ে, তত শীতের অনুভবও বৃদ্ধি পায়। প্রকৃতির এই পরিবর্তন বার্তা দিয়ে যায়– এই বুঝি শীত এসে গেল।

প্রতিবছর শীতের এ আগমনী বার্তা যেন প্রকৃতিতে এক ভিন্ন রকম চাঞ্চল্য নিয়ে আসে। জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাবে বাংলাদেশে কয়েক দশক ধরে ষড়ঋতুর মধ্যে চারটি ঋতু উপলব্ধি করা যাচ্ছে। হেমন্ত এবং বসন্তের প্রকৃত রূপ হারিয়ে যেতে বসেছে। ফলে দেশের উত্তরাঞ্চলে হেমন্তের আগমনে শুরু হয়ে গেছে শীতের আমেজ।

এবার হেমন্তে শীত এসে কড়া নাড়ছে প্রকৃতিতে। বাতাসে ছড়িয়ে পড়েছে হিমেল আবহ। মাঝ রাত থেকেই শীত অনুভূত হচ্ছে। গাঁয়ের শিশিরসিক্ত মেঠো পথে জানান দিচ্ছে শীতের আগমনী বার্তা। সন্ধ্যার প্রকৃতি ঢেকে যাচ্ছে কুয়াশার হালকা চাদরে। সকালের শিশিরভেজা ঘাস আর হালকা কুয়াশায় প্রকৃতি সিক্ত হচ্ছে। গাছের পাতা, ধান গাছ ও ঘাসের ডগায় ফোঁটা ফোঁটা শিশির বিন্দু পথচারীদের আকৃষ্ট করছে। সূর্যের কিরণে তা মুক্তদানার মতো ঝকঝক করছে। শুধু ধানের ডগায় শিশির বিন্দু নয়, ফুলের রাজ্যে গন্ধরাজ, গাঁদা, মল্লিকা, শিউলি, ডালিয়া, কামিনী, দেবকাঞ্চন, সূর্যমুখী, রাজ অশোক, ছাতিম, বকফুলসহ আরও কয়েক প্রজাতির ফুল প্রকৃতিকে মুগ্ধ করছে। গ্রামবাংলায় তথা দেশের উত্তরাঞ্চলে মাঝরাত থেকেই শীত অনুভূত হচ্ছে। সন্ধ্যা রাতে হালকা গরম অনুভব হলেও মাঝরাতের দিকে কাঁথামুড়ি দিতে হচ্ছে পল্লিবাসীদের। ভোর থেকেই চারপাশে কুয়াশা দেখা গেলেও সূর্য ওঠার একটু পরেই তা কাটতে শুরু করে।

কৃষিপ্রধান বাংলাদেশে এ ঋতুতেই প্রধান ফসল ধান ঘরে ওঠে। মাঠের পাকা সোনালি ধান, কৃষকের ধান ঘরে তোলার দৃশ্য, কৃষক-কৃষানির আনন্দ– এ সবই এ ঋতুর রূপের অনিবার্য অনুষঙ্গ। সারা বছরে মহাজনের কাছ থেকে ধার নেওয়া পাওনা পরিশোধের সুযোগ হয় ফসল ঘরে ওঠার পরেই। কৃষকের সারা বছরের জোগানও আসে এসময়। বাঙালির জীবন মানসে এ ঋতুর প্রভাব সবচেয়ে বেশি।

এসময় খেজুরের রস দিয়ে বানানো হয় নানা রকম পিঠা-পুলি। নদীনালা, খালবিল শুকিয়ে যেতে থাকে। এসময় নানা জায়গায় ঘুরে বেড়ানো আর শিশু-কিশোরদের মাঝে চড়ুইভাতির ধুম পড়ে যায়। ভোর হওয়ার আগে থেকেই গ্রামে কৃষানিদের ধান সিদ্ধ করা, মাঠে ব্যস্ত কৃষক নতুন করে ফসল ফলানোর, শীত থেকে রক্ষা পেতে আগুন পোহানো– এসবই ধরা পরে চিরায়ত শীতের রূপ হিসেবে রূপসি বাংলাদেশে।

গ্রামবাংলায় শীতের আগমনী বার্তার সাথে পাল্লা দিয়ে শীত নিবারণের উপকরণ লেপ-তোষক তৈরিতে ব্যস্ত হয়ে পড়ে কারিগররা। এসময় লেপ-তোষক কারিগর ও ব্যবসায়ীদের মাঝে কর্মচঞ্চলতা ফিরে আসে। কারণ প্রতিটি এলাকাতেই শীত জেঁকে বসার আগেই শীত নিবারণে লেপ-তোষক তৈরির দোকানে ভিড় করে এ অঞ্চলের মানুষ। সারা বছরের মধ্যে এ শীত মৌসুমেই কারিগরেরা কাজের বেশি অর্ডার পান। ফলে এসময় তাদের কাজ বেশি করতে হয়।

অপরদিকে শীত মৌসুমের শুরুতেই বিভিন্ন গ্রাম্য পরিবারের গৃহবধূরা কাঁথা সেলাই শুরু করে দেন। গ্রামাঞ্চল ও মফস্বল শহর অঞ্চলে অনেক পরিবার রয়েছে, যারা কাঁথা সেলাইয়ের মাধ্যমে জীবিকানির্বাহ করে থাকেন। আবার গরিব পরিবারের নারীরা পুরনো শাড়ি, লুঙ্গি দিয়ে কাঁথা তৈরি করে থাকেন। তাদের লেপ-তোষকের সাধ থাকলেও অনেকের সাধ্য না থাকায় রং-বেরঙের সুতা ও কাপড় দিয়ে কাঁথা বুনেন তীব্র হাড়কাঁপানো শীতের কবল থেকে নিজেদের সুরক্ষার জন্য।

ভোরের সূর্যোদয়ের মধ্য দিয়ে মিষ্টি রোদ আর সবুজ ঘাসের পাতার ওপর শিশির বিন্দু জানিয়ে দেয় দরজায় কড়া নাড়ছে শীত। এখন প্রতিদিন ভোরে বিভিন্ন জায়গায় দেখা মিলছে কুয়াশার। ফসলের মাঠে উঁকি দিচ্ছে নতুন বীজের প্রস্ফুটিত চারা। তাতে শিশির বিন্দু ছড়িয়ে দিচ্ছে মৃদু শীতলতা। এসময় মৌমাছির গুঞ্জনে মুখরিত হয় হলদেবরণ সরষে ক্ষেত আর নানা প্রজাতির ফুলের বাগান। এদিকে শীতের আগাম সবজি চাষে ব্যস্ত সময় পার করছে কৃষকরা। লালশাক, পালংশাক, পুঁইশাক, বেগুন,

ডাটা, বরবটি, গোল আলু, মটরশুটি, শালগম, ওলকপি, মূলা, ফুলকপি, বাঁধাকপি, শিম, লাউ, টমেটোসহ বিভিন্ন ধরনের আগাম শীতকালীন সবজি চাষ হয়।

প্রকৃতির এই রূপ অনেকের কাছেই প্রিয়। তাই এই মৃদু শীত শীত ভাব অনেক বাঙালির কাছেই প্রিয় একটি সময়। এখন থেকে দিন যতই গড়াবে পৌষের দিকে ততই সাইবেরিয়ান বায়ুপ্রবাহ বাড়বে এ দেশ অভিমুখে। হিমালয়সংলগ্ন দেশের উত্তরের জেলাগুলোতে অবশ্য ইতোমধ্যে শীতের আমেজ শুরু হয়ে গেছে। এখন থেকে ধীরে ধীরে শীতের তীব্রতা বৃদ্ধি পাবে। পাশাপাশি বাড়ছে কুয়াশার প্রকোপ। যে কারণে সেখানে গোধূলিলগ্নে দেখা মেলে কুয়াশার। আবার কোথাও সন্ধ্যার পর থেকেই কুয়াশা এমনভাবে বিস্তৃত হয় যে, তা দৃষ্টিসীমা হরণ করার উপক্রম হয়। রাত পেরিয়ে যখন ভোরের আগমন ঘটে তখন গাঢ় কুয়াশার দেখা মেলে কোথাও। তার মধ্যেই উঁকি দেয় ভোরের নবীন সূর্য। শীতের এই অনুভূতি উপভোগ করতে ইতোমধ্যে রূপসি বাংলার ঘরে ঘরে তুলে রাখা নিজ হাতে সেলাই করা পাতলা কাঁথা আর চাদর-কম্বল স্থান পেতে শুরু করেছে খাট-চৌকিতে।

ইট-পাথরের শহরের চিত্র অবশ্য আলাদা। এখানে ভরা শীত মৌসুমেও তেমন শীতের তীব্রতা অনুভূত হয় না। প্রায় বারো মাসই গরম গরম একটা ভাব থাকে এখানে। তারপরেও পৌষের দিনগুলোতে প্রত্যন্ত গ্রামের আবহাওয়া বিরাজ করে শহরাঞ্চলে। অনেকটা গ্রামীণ পরিবেশের মতো পরিবর্তনশীল আবহাওয়ায় অনেকেই খাপ খাওয়াতে পারেন না। যে কারণে কেউ কেউ সর্দি-জ্বর, কাশিসহ শীতজনিত রোগে আক্রান্ত হয়ে পড়েন। সব বয়সির মধ্যে এই সমস্যা দেখা গেলেও শিশু আর বয়স্করা একটু বেশি নাজুক হয়ে পড়ে এসময়।

জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাবে প্রায় প্রতিবছরই শীত হানা দেয় দেশের উত্তরাঞ্চলসহ গ্রামাঞ্চলে, বিশেষ করে লা নিনো ও দুর্বল (পোলার ভরটেক্স) মেরু ঘূর্ণির কারণে বাংলাদেশসহ এশীয় অঞ্চলের দেশগুলোতে শৈত্যপ্রবাহ লক্ষ করা যায়। পোলার ভরটেক্স তথা মেরু ঘূর্ণি হচ্ছে– পৃথিবীর উভয় মেরু অঞ্চলের বিশাল অঞ্চলের লঘুচাপ এবং ঠান্ডা বায়ুর এলাকা। এটা সবসময় মেরু অঞ্চলের কাছাকাছি অবস্থান করে এবং গ্রীষ্মে দুর্বল হয়ে যায় ও শীতে শক্তিশালী হয়। মেরু অঞ্চলের কাছের বায়ুমণ্ডলে ঘড়ির কাঁটার বিপরীত দিকে ঘুরে মেরু অঞ্চলের পরিবেশ ঠান্ডা রাখে। অনেক সময় উত্তর গোলার্ধের ভরটেক্সেও সম্প্রসারণ ঘটে এবং জেট স্ট্রিমের (খুবই ঠান্ডা বায়ুপ্রবাহ) সঙ্গে ঠান্ডা বায়ু দক্ষিণ দিকে পাঠিয়ে থাকে। পরিবেশবিদদের মতে, নিরক্ষীয় বায়ুর প্রভাবে সমুদ্রের গভীর থেকে শীতল স্রোত তৈরি হয়। প্রশান্ত মহাসাগরে ইতোমধ্যে এই স্রোত দেখা দিয়েছে। যার জন্য উত্তর নিরক্ষীয় অঞ্চলের উষ্ণতা কমতে শুরু করেছে। সেই লা নিনোর প্রভাবেই এখন এ অঞ্চলে শীত পড়তে শুরু করেছে।

ড. আবদুর আলীম তালুকদার: কবি, প্রাবন্ধিক ও সহকারী অধ্যাপক, শেরপুর সরকারি মহিলা কলেজ, শেরপুর, dr.alim1978@gmail.com

ন্যাশনাল কার্ড স্কিম 'টাকা পে' উদ্বোধন

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বাংলাদেশের প্রথম স্থানীয় মুদ্রা কার্ড 'টাকা পে' উদ্বোধন করেন। এর লক্ষ্য হচ্ছে– ভিসা, মাস্টারকার্ড ও অ্যামেরের মতো আন্তর্জাতিক কার্ডের ওপর নির্ভরতা কমানোর পাশাপাশি বৈদেশিক মুদ্রা সাশ্রয় করা। ১লা নভেম্বর ২০২৩ প্রধানমন্ত্রী গণভবনে এক উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে এই 'ন্যাশনাল কার্ড স্কিম' প্রকল্পের উদ্বোধন করেন। অনুষ্ঠানের সঙ্গে ভার্চুয়ালি যুক্ত ছিল বাংলাদেশ ব্যাংক (বিবি), সোনালী ব্যাংক পিএলসি, ব্র্যাক ব্যাংক পিএলসি ও দি সিটি ব্যাংক লিমিটেড।

অনুষ্ঠানে শেখ হাসিনা বলেন, আজকের জাতীয় কার্ড স্কিম 'টাকা পে' স্মার্ট বাংলাদেশ গড়ার আরেকটি পদক্ষেপ। এই সার্বভৌম দেশীয় পেমেন্ট সিস্টেমটি বাংলাদেশে 'ক্যাশলেস সোসাইটি' প্রতিষ্ঠায় একটি যুগান্তকারী উদ্যোগ, যেটি দেশে দুর্নীতি ও বিদেশি নির্ভরতা হ্রাস করবে।

প্রাথমিকভাবে রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীন সোনালী ব্যাংক, বেসরকারি খাতের দি সিটি ব্যাংক ও ব্র্যাক ব্যাংক 'টাকা পে' কার্ড সেবা চালু করছে। বাংলাদেশ ব্যাংক পরিচালিত ইলেকট্রনিক পেমেন্ট প্ল্যাটফর্ম 'ন্যাশনাল পেমেন্ট সুইচ বাংলাদেশ' ব্যবহারের মাধ্যমে জাতীয়ভাবে একই সেবা দেবে 'টাকা পে'। প্রাথমিকভাবে অভ্যন্তরীণ ব্যবহারের জন্য এটি চালু হলেও পরে টাকা-রুপি কার্ড চালু করা হবে, যা দিয়ে গ্রাহক ভারতে লেনদেন করতে পারবেন।

জানা গেছে, অন্য ব্যাংকগুলো ধীরে ধীরে 'টাকা পে' কার্ড চালু করবে। শুরু থেকেই দেশের সব এটিএম, পয়েন্টস অব সেলস ও অনলাইন প্ল্যাটফর্মে এই কার্ড ব্যবহার করা যাবে। শুরুতে এটি ডেবিট কার্ড হিসেবে ব্যবহার করা গেলেও ভবিষ্যতে 'টাকা পে' ক্রেডিট কার্ডও আসবে। এই কার্ডের নিরাপত্তায় ব্যবহার করা হচ্ছে ম্যাগনেটিক স্ট্রিপ। তবে এখন সব ব্যাংকের কার্ডেই বাড়তি নিরাপত্তা সংবলিত নতুন ইএমভি প্রযুক্তি চালু হয়েছে। ধীরে ধীরে টাকা পে কার্ডেও ইএমভি প্রযুক্তি আনা হবে। বাংলাদেশ ব্যাংকের কর্মকর্তারা বলছেন, প্রাথমিকভাবে ব্যাংকগুলো পাইলট ভিত্তিতে টাকা পে কার্ড চালু করবে। ফ্রান্সের পরামর্শ প্রতিষ্ঠান 'ফাইম' কার্ডটি তৈরি করেছে।

প্রতিবেদন: শাওন আহমেদ

ঋতুকন্যা হেমন্ত

রহিম আব্দুর রহিম

নদীর দেশ, গানের দেশ, প্রাণের দেশ, ধানের দেশ ষড়ঋতুর বাংলাদেশ। অপূর্ব সৌন্দর্য, রূপ-রসের সম্ভার নিয়ে একের পর এক ঋতু পরিবর্তন ঘটে চলছে সবুজ শ্যামলিমায় ভরা বাংলা মায়ের প্রকৃতিতে। ষড়ঋতুর চতুর্থ সন্তান হেমন্ত। এই হেমন্তকেই ঋতুকন্যা বলা হয়। হালকা কুয়াশার চাদর গায়ে শরৎ শেষে হেমন্তের আগমন। এই হেমন্তই মধুর মাস বলে খ্যাত। যার ছোঁয়ায় নতুন প্রাণ ফিরে আসে আকাশে-বাতাসে বৃক্ষ চরাচরে।

প্রকৃতি যেমন সাজে তার নিজস্ব আদলে, তেমনি প্রকৃতির স্বজন প্রাণ-প্রাণীরাও ব্যস্ত হয়ে পড়ে অপরূপ প্রকৃতির স্বাদ গ্রহণে। গন্ধরাজ, মল্লিকা, শিউলি, কামিনীর সুবাস কতই না মধুর! দিঘির জলে, বিলে-ঝিলে, হাওরে ফোটে নানা রঙের পদ্ম, খালে-বিলে শাপলা-শালুক। নদীর তীরে শোভা পায় কাশফুল। কৃষিপ্রধান বাংলার কৃষকসমাজের অভাব-অনটন আর অলস সময় পেরিয়ে দুয়ারে নাড়া দেয় কর্মময় জীবনের প্রাণচাঞ্চল্য। কৃষি মাঠে সোনালি ফসলের মৌ মৌ গন্ধ, কিষান-কিষানির ব্যস্ত প্রহর; ঘরে ঘরে ঢেঁকির কচকচানি, উঠানে ধানের ঢিবি, শিশু-কিশোররা উল্লসিত, সকালের শিশিরভেজা দুর্বা, দুপুরের রৌদ্রোজ্জ্বল প্রকৃতির বিকেল হয়ে ওঠে কাব্যময়। নতুন ধানের নবান্নের শুরু হয় প্রতিটি বাড়িতে। আনন্দের বন্যা বয়ে যায় সমাজের পরতে পরতে। পিঠা-পুলির সে কী আয়োজন। মেয়ে এসেছে বাপের বাড়ি, ছেলে গিয়েছে শ্বশুরবাড়ি। নানা-নানি, দাদা-দাদি, নাতি-পুতিদের আড্ডায় হরেকরকম পিঠার পসরায়– ভাপা পিঠা, পুলি পিঠা, জামাই পিঠা, পোয়া পিঠা, দুধপায়েস পিঠা, তিলের পিঠা, চিতই পিঠা, পাকন পিঠা, কলার পিঠা, জামাইআদর পিঠা, ঝাল চাপটি পিঠা, সাদা দুধম্যাড়া পিঠা, ভাপাপুলি পিঠা, পাটিসাপটা পিঠা, সেমাই পিঠা, মরিচ পিঠা, ধলা পিঠাসহ শত রকমের পিঠার কৃষ্টিতে তৃপ্ত হয়ে ওঠে বাঙালির প্রাণ।

সুরের ভুবনে বসন্ত বন্দনায় যদিও 'শীত গেলো বসন্ত এলো/এলো ফাগুন মাস/ বিরহীনি মনে আগুন জ্বলছে বারো মাস–' এই গীতচরণকে উপেক্ষা করেই হেমন্তে বিয়েশাদির ধুম পড়ে যায় বাড়ি বাড়ি। নতুন ফসলের নবান্ন আর ফসল বিক্রির টাকায় বিয়েবাড়িতে সাজানো হয় কলা পাতার গেট। বর-কনে বসে যায় শীতলপাটির রাজকীয় বিছানায়, শুরু হয় গায়ে হলুদের চিরায়ত উৎসব, বেজে ওঠে বিয়ের গান– 'গতরে হলুদ লাগাইয়া-কন্যারে সাজাইয়ো বধূর সাজে মিলিয়া/', 'তোমরা কন্যারে সাজাও যতন করিয়া', 'আমি পালংক সাজাইলাম গো ফুলের মালা দিয়া/', 'তোমরা উষার করিয়া পারে বিছানা ও দয়ার ভাগিনা/', 'পালকি হেলে পালকি দুলে/ পালকিতে রত্ন জ্বলে/ পালকির দরজা গুছাইয়া দেখি দুলাভাই আসেনি সঙ্গে/', 'নতুন সাজে সাজাইলাম দামান, হলদী মেন্দী লাগাইয়া।' এই বিয়েশাদি উপলক্ষে বৃহত্তর ময়মনসিংহ, টাঙ্গাইল অঞ্চলে পিঠালি ভোজের ধুম পড়ে যায়। উত্তরাঞ্চলে বসে লোক পালাগানের আসর। এত গেল বিয়ে বাড়ির বাঙালি সংস্কৃতির ব্যঞ্জনাময় চিরায়ত দৃশ্য।

দুরন্ত বেলার শিশু-কিশোররা হেমন্তের অপরূপ সৌন্দর্যে মেতে ওঠে। ধানকাটা-মাড়ানো শেষে, বিস্তর পতিত জমিতে চড়ুইভাতির আসর বসে হরদম। যেখানে প্রেম-প্রীতি, ভালোবাসা, মানবপ্রেমের প্রকৃতিগত শিক্ষা অর্জন করার সুযোগ পায়। মেতে ওঠে নানাবিধ খেলাধুলায়, গাঁয়ের মেঠোপথ পেরিয়ে এগাঁও-ওগাঁয়ের শিশুরা দলবেঁধে বাড়ির আঙিনায়, নদীর কিনারায় দিগন্তজোড়া খোলা মাঠে মেতে ওঠে ডাংগুলি, গোল্লাছুট, সাতচাড়া, দাঁড়িয়াবান্ধা, মারবেল খেলাসহ নানাবিধ বিলুপ্তপ্রায় খেলাধুলায়। একইভাবে মেয়ে শিশুরা বৌচি, ইচিং-বিচিং, এক্কা দোক্কা, কুতকুত, রুমাল লুকানো, ওপেনটি বায়োস্কোপ, ফুলটোকা, দড়িলাফ খেলার মতো নানা ধরনের খেলাধুলায় অংশ নেয়।

বাঙালি জীবনে হেমন্ত আসে উৎসবের ভরা যৌবন নিয়ে। শুরু হয় পূজা-পার্বণ– কার্তিকপূজা, শনিপূজা, বুড়াবুড়ির পূজা, মনসাপূজা, দুর্গাপূজা, ভাইফোঁটা উৎসব, রাখিবন্ধন, কালিপূজাসহ নানা ধরনের উৎসব। এই উৎসব ঘিরে বসে গ্রামীণ মেলা, যে মেলায় চুড়ি-মুড়ি, খুরমা, লাড্ডু, পুঁতিরমালা, বাঁশের বাঁশি, পুতুল, মাটির তৈরি হাঁড়ি-পাতিল, কাঠের তৈরি লাঙল-জোয়াল, লোহার তৈরি কাস্তি-কোঁদাল, বেতের তৈরি ডোলা-ডালিসহ শতরকমের তৈজসপণ্যের বেচাকেনার হাট। চলে সার্কাস, জাদু, পুতুল নাচের মতো বিনোদন। বটতলায় কিচ্ছার আসরে বয়াতি পায়ে ঘুঙুর বেঁধে, কোমর দুলিয়ে, মাথা নাচিয়ে গাইতে থাকে কন্যা বরণের গান– 'তারপরে পিন্দিলো শাড়ি/শাড়ির নামটি হিয়া/যে শাড়ি পিন্দিলে কন্যার হয়ে যায়গো বিয়া/এই শাড়ি পিন্দিয়া কন্যা অঙ্গের দিকে চায়/অঙ্গেতে না পোসায় শাড়ি/টানিয়া খসায়।'

সকালের শিশির, দুপুরের রৌদ্রোজ্জ্বল প্রকৃতির বিকেলের সূর্যালোকের আলোকচ্ছটা অপরূপ সৌন্দর্য বিকায়। জ্যোৎস্নাস্নাত রাতের কুয়াশার চাদর ছিন্ন করে গ্রামবাংলার হাটে-মাঠে, বাজারের ময়দানে বিশাল প্যান্ডেল করে শুরু হয় বাঙালির চিরায়ত অমর সংস্কৃতি যাত্রাপালা। বৈরাগী রাগে বাঁশির সুর, চতুরপাশের বাদ্যযন্ত্রের মধুময় তালে ঝংকৃত হয় দেশ বন্দনা– 'এই তো আমার দেশ, সোনার বাংলাদেশ/দোয়েল শ্যামা কোয়েল ডাকে রূপের নাইকো শেষ/দেশ বন্দনা শেষে শুরু হয় গ্রামীণ জীবনের দুঃখ-

কষ্ট, হাসি-কান্না, প্রেম-বিরহের মধুময় ঝুমুরপালা– 'পুষ্পমালা', 'সাগরভাসা', 'আলোমতি প্রেমকুমার', 'রূপবান', 'গুনাইবিবি', 'খায়রন সুন্দরী', 'নছিমন', 'আলিফ লায়লা', 'কাশেম মালার প্রেম', 'কমলার বনবাস', 'অরুণ বরুণ কিরণমালা', 'বেহুলা লক্ষিন্দর', 'প্যাঁচকাটার সংসার', 'ভাষান যাত্রা'র মতো অসংখ্য লোকজপালা। এছাড়া বাউলের একতারা, দোতারায় প্রাণবন্ত হয়ে ওঠে সুরের ভুবন। পরিবেশিত হয় বাউলগান, পালাগান, গাজিরগীত। বাড়ির উঠানে চলে পুথি পাঠের আসর। উত্তরাঞ্চলের মানপাচালী, রংপাচালী, ধামের পালায় উঠে আসে হাস্যরসাত্মক জীবন আলখ্যের প্রমাণ্যচিত্র। দক্ষিণাঞ্চলে একইভাবে গম্ভীরাগানের আসর জমে। বৃহত্তর ময়মনসিংহ অঞ্চলে বিভিন্ন স্থানে আয়োজন করা হয় ষাঁড়ের লড়াই, ঘোড়দৌড় ও গুটিখেলা। আধুনিক শহরের কৃষি-বাণিজ্য, ক্ষুদ্র ও কুটিরশিল্প মেলা ঘিরে জমে ওঠে সহস্র বছরের দুঃখ-বেদনা ভারাক্রান্ত সমাজের অধিকার আদায়ে সামাজ সচেতনতার জীবন্ত আলেখ্য যাত্রাপালা– 'পাপের প্রায়শ্চিত্ত', 'থানায় যাচ্ছে ছোটো বউ', 'অচল পৃথিবী', 'রক্ত দিয়ে মায়ের পূজা', 'কলিযুগের বৌ', 'অনুসন্ধান', 'সিঁদুর নিও না মুছে', 'ফাঁসির মঞ্চে', 'ভিখারির ছেলে', 'প্রেম হলো অভিশাপ', 'জীবন নদীর তীরে', 'গলি থেকে রাজপথ', 'নীচু তলার মানুষ', 'এই পৃথিবী টাকার গোলাম', 'দেবী সোলতানা', 'স্বর্গের পরের স্টেশন', 'শশী বাবুর সংসার', 'নবাব সিরাজউদ্দৌল্লা'সহ অসংখ্য জ্ঞানগর্ভ গণজাগরণমূলক যাত্রাপালা।

হেমন্তের মায়াময় রূপ সৌন্দর্যের ডানামেলা, প্রাণখোলা উৎসব শুধু বাঙালিদের মাঝেই নয়, রাশিয়া, জাপান, চীন, ভারত, কানাডা, যুক্তরাজ্য, যুক্তরাষ্ট্রসহ মধ্যপ্রাচ্যের দেশগুলোতে নিজ নিজ দেশীয় ঐতিহ্য-আচারের মধ্য দিয়ে পালিত হয়। হেমন্ত প্রকৃতি আমাদের মাঝে আবির্ভূত হয় কখনও মায়ের সাজে, কখনও বোনের রূপে, কখনও আবার আদরের দুলালি কন্যা কিংবা অর্ধাঙ্গিনী হয়ে। এই হেমন্ত ঘিরে শিল্প, সাহিত্য-সংস্কৃতিতে নানা মাত্রা যোগ হয়। কবি তার কবিতায়, প্রাবন্ধিক তার প্রবন্ধে, গল্পকারের গল্প-উপন্যাসে, চিত্রকর তার চিত্রকলায় তুলে আনে হেমন্তের রূপ সৌন্দর্যের পূজনীয় প্রকৃতি। কবি রবীন্দ্রনাথ হেমন্তের বর্ণনা দিতে গিয়ে গেয়ে উঠেছেন– 'ও মা অঘ্রাণে তোর ভরা ক্ষেতে আমি কি দেখেছি মধুর হাসি।' যে গানটি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এদেশের জাতীয় সংগীত হিসেবে স্বীকৃতি দিয়ে হেমন্তকে প্রখর, প্রসার, জীবন্ত ও অমর করে গেছেন। এছাড়াও কবি ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত, মাইকেল মধুসূদন দত্ত, কাজী নজরুল ইসলাম, কবি জসীমউদ্‌দীন, বেগম সুফিয়া কামাল প্রমুখরা তাঁদের কবিতায় হেমন্তের বর্ণনা দিয়েছেন দরদি ভাষায়। বাঙালি জীবনের ঋতু সংস্কৃতিতে হেমন্ত ঘিরে যে আবেদন এক সময় ছিল তা এখন পুরোপুরি বিলীন না হলেও হারিয়ে যেতে বসেছে তাতে কোনো সন্দেহ নেই। এই হেমন্ত উৎসব এখন শহরেও পালিত হচ্ছে। তবে কৃষিপ্রধান বাঙালির জীবন থেকে হেমন্ত কখনও হারিয়ে যাবে না, যেতে পারে না, যেতে দেওয়া যায় না, তার অমর বাণী প্রতিষ্ঠিত করে গেছেন কবি জসীমউদ্‌দীন এভাবে–

অর্ধেক রাতে উঠানেতে ধানের মলন মলা/
বনের পশুরা মানুষের সাথে মিশায় গলায় গলা

তিনি আবারও লিখেছেন–

কোনদিন চাষী শুইয়া শুইয়া গাহে বিরহের গান–
কিষানের নারী ঘুমাইয়া পড়ে ঝাড়িতে ঝাড়িতে ধান।

ষড়ঋতুর হেমন্ত জাগ্রত থাকুক যুগে যুগে, ঘরে ঘরে, প্রকৃতি-পরিবেশে, গানে-প্রাণে, কবিতা-গল্পে, মাঠে-ময়দানে।

রহিম আব্দুর রহিম: শিক্ষক, নাট্যকার, কলামিস্ট ও গবেষক,
bskt1967@gmail.com

স্মার্ট বাংলাদেশ সংক্রান্ত স্মারক ডাকটিকিট অবমুক্ত

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ২০৪১ সালের মধ্যে স্মার্ট বাংলাদেশ গড়তে সরকারের পদক্ষেপ উপলক্ষে একটি ১০ টাকার স্মারক ডাকটিকিট, ১০ টাকার উদ্বোধনী খাম এবং একটি পাঁচ টাকার ডাটা কার্ড অবমুক্ত করেন। ১৬ই অক্টোবর ২০২৩ গণভবনে এক অনুষ্ঠানে এসব স্মারক ডাকটিকিট, উদ্বোধনী খাম, ডাটা কার্ড ও স্যুভেনির অবমুক্ত করেন তিনি। এ উপলক্ষে প্রধানমন্ত্রী বিশেষ সিলমোহর ব্যবহার করেন।

আন্তর্জাতিক সিভিল এভিয়েশনে বাংলাদেশের সদস্য হওয়ার ৫০ বছর পূর্তি উপলক্ষে এদিন ৫০ টাকার একটি স্মারক ডাকটিকিট, স্যুভেনির শিট, একটি ১০ টাকার উদ্বোধনী খাম ও একটি পাঁচ টাকার ডাটা কার্ডও অবমুক্ত করেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। ঢাকা জিপিওর ফিলাটেলিক ব্যুরো থেকে এসব স্মারক ডাকটিকিট, উদ্বোধনী খাম, ডাটা কার্ড বিক্রি করা হবে এবং পরে অন্যান্য জিপিওতে ও সারা দেশে প্রধান ডাকঘরে পাওয়া যাবে।

এসময় ডাক ও টেলিযোগাযোগ মন্ত্রী মোস্তাফা জব্বার, বেসামরিক বিমান পরিবহণ ও পর্যটন প্রতিমন্ত্রী এম মাহবুব আলী, প্রধানমন্ত্রীর মুখ্য সচিব এম তোফাজ্জেল হোসেন মিয়া, ডাক ও টেলিযোগাযোগ সচিব আবু হেনা মোরশেদ জামান, বেসামরিক বিমান পরিবহণ ও পর্যটন সচিব মো. মোকাম্মেল হোসেন, বাংলাদেশ বেসামরিক বিমান চলাচল কর্তৃপক্ষের চেয়ারম্যান এয়ার ভাইস মার্শাল মো. মফিদুর রহমান ও ডাক অধিদপ্তরের মহাপরিচালক তরুণ কান্তি সিকদার উপস্থিত ছিলেন।

প্রতিবেদন: উষা রানি

বাংলাদেশে সমবায় আন্দোলন

সেলিনা আকতার

সমবায় বিশ্বব্যাপী স্বীকৃত একটি আদর্শ ও সামাজিক আন্দোলন। দরিদ্র ও অবহেলিত মানুষের কাঙ্ক্ষিত মুক্তির হাতিয়ার হচ্ছে সমবায়। সৎ উদ্দেশ্য নিয়ে নিজেদের অর্থনৈতিক ও সামাজিক উন্নয়নের জন্য একদল মানুষের যৌথ উদ্যোগকে সমবায় বলা হয়। সমবায় হলো একটি ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠান যেটি একদল সদস্য তাদের সম্মিলিত কল্যাণের জন্য পরিচালনা করেন। আন্তর্জাতিক সমবায় মৈত্রী তাদের সমবায় পরিচিতি নির্দেশিকাতে সমবায়ের সংজ্ঞা দিয়েছে এভাবে যে, সমবায় হলো সমমনা মানুষের স্বেচ্ছাসেবামূলক একটি স্বশাসিত সংগঠন– যা নিজেদের আর্থসামাজিক উন্নয়নের জন্য কাজ করে এবং এ লক্ষ্যে অংশীদারিত্বের ভিত্তিতে গণতান্ত্রিকভাবে নিয়ন্ত্রিত ব্যাবসা পরিচালনা করে। একটি সমবায় প্রতিষ্ঠান এমনও হতে পারে যেখানে ব্যাবসাটি এর সুবিধাভোগী সকলে সমভাবে নিয়ন্ত্রণ করে অথবা তারাই এ প্রতিষ্ঠানে কাজ করে। সমবায় শুধু একটি অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড নয়। সমবায়ের মূলমন্ত্র হচ্ছে– সকলের তরে সকলে আমরা প্রত্যেকে আমরা পরের তরে। সমবায়ের মূলকথা হলো মুনাফার শরিকানা লাভ যা বণ্টন করা হয়, সমবায়গুলো স্ব-সহায়তা, স্ব-দায়িত্ব, গণতন্ত্র, সাম্য, ন্যায়পরায়ণতা এবং সংহতির মূল্যবোধের ওপর ভিত্তি করে তৈরি। সমবায়ের সদস্যরা সততা, উন্মুক্ততা, সামাজিক দায়বদ্ধতা এবং অন্যদের যত্ন নেওয়ার নৈতিক মূল্যবোধে বিশ্বাস করে। সমবায়ের মূল ভিত্তি একতা ও সহযোগিতা। এক কথায় বলা যায়, সমবায় হচ্ছে শোষণ ও বঞ্চনার হাত থেকে নিজেদের রক্ষা করে সংঘবদ্ধভাবে বৈধ উপায়ে অর্থনৈতিক মুক্তি লাভ করা। সমবায় সমিতির ইতিহাস প্রায় সভ্যতার ইতিহাসের ন্যায় প্রাচীন। বর্তমান সমবায় সমিতির সাংগঠনিক রূপ প্রতিষ্ঠিত হয় ইউরোপে শিল্পবিপ্লবের কিছু পূর্বেই। ১৭৬১ সালে সর্ব প্রথম ফেনউইক উইভারস সোসাইটি গঠন করা হয় তাঁতিদের ঋণ সুবিধা, শিক্ষা ও অভিবাসন সুবিধা দেওয়ার জন্য। পরবর্তীতে শুধু ইংল্যান্ডেই এক হাজারেরও অধিক সমবায় প্রতিষ্ঠান কর্মকাণ্ড শুরু করে।

গ্রামীণ অর্থনৈতিক অবকাঠামো উন্নয়নে সমবায়ের রয়েছে সুদীর্ঘকালের ঐতিহ্য ও ইতিহাস। ঊনবিংশ শতাব্দীর শুরুতে সর্বপ্রথম ইংল্যান্ডে সমবায় আন্দোলনের যাত্রা শুরু হয়। ইউরোপের শিল্পবিপ্লবের পর হাজার হাজার শ্রমিক চাকরিচ্যুত হয়ে বেকারত্বের কঠিন অভিশাপে চোখে-মুখে অন্ধকার দেখছিল। এই সময় ১৮২১ সালে রবার্ট ওয়েন ইংল্যান্ডের নিউ লানার্ক নামক শহরে ও তার আশপাশের শ্রমিকদের সংগঠিত করে সমবায় গ্রাম প্রতিষ্ঠা করেন। সমবায়ের মাধ্যমে নিজস্ব সঞ্চয় সংগ্রহ করে শ্রমিকরা তাদের ভাগ্যোন্নয়নে ব্রতী হয়। সমবায় সমিতি আইনের অধীনে গঠিত, পরিচালিত, পৃথক সত্তা ও সীমিত দায় বিশিষ্ট একটি স্বেচ্ছা প্রণোদিত ব্যাবসা সংগঠন। এ সংগঠন গণতান্ত্রিক রীতি-নীতি অনুসরণ করে এবং এর মূল লক্ষ্য হলো সদস্যদের আর্থিক কল্যাণ নিশ্চিত করা।

সমবায়ের মূলনীতি হলো ৭টি

১। স্বতঃস্ফূর্ত ও অবাধ সদস্যপদ
২। সদস্যের গণতান্ত্রিক নিয়ন্ত্রণ
৩। সদস্যের আর্থিক অংশগ্রহণ
৪। স্বায়ত্তশাসন ও স্বাধীনতা
৫। শিক্ষা, প্রশিক্ষণ ও তথ্য
৬। আন্তঃসমবায় সহযোগিতা ও
৭। সামাজিক অঙ্গীকার

সমবায় সমিতির উদ্দেশ্য হলো

১। সদস্যদের অর্থনৈতিক কল্যাণ সাধন
২। মধ্যস্বত্বভোগীদের উচ্ছেদ
৩। মূলধনের জোগান
৪। কর্মসংস্থান
৫। সম্পদের সুষ্ঠু বণ্টন
৬। জীবনযাত্রার মানোন্নয়ন
৭। ঐক্য প্রতিষ্ঠা
৮। নেতৃত্ব সৃষ্টি
৯। সামাজিক কল্যাণ ও
১০। সঞ্চয়ের প্রবণতা সৃষ্টি

বিংশ শতাব্দীর শুরুর দিকে ভারতীয় উপমহাদেশে প্রথম সমবায় আন্দোলনের যাত্রা শুরু হয়। ১৯৪৭ সালে দেশ বিভাগের পর সমবায় আন্দোলনে অচলাবস্থা সৃষ্টি হয়। পূর্ব পাকিস্তানে তখন ২৬ হাজারের বেশি সমবায় সমিতি বিরাজ থাকলেও এগুলোর অবস্থা ভালো ছিল না। পরবর্তীতে সরকার ও সমবায়ীদের যৌথ উদ্যোগে ১৯৪৮ সালে পূর্ব পাকিস্তান প্রাদেশিক সমবায় ব্যাংক প্রতিষ্ঠিত হয়। এরমধ্যে সরকার সমবায় সমিতিগুলোর ঋণ কার্যক্রম পুনরায় চালু করার উদ্যোগ গ্রহণ করে। ১৯৫৬ সালে ড. আখতার হামিদ খান প্রয়োগিক গবেষণা প্রতিষ্ঠান হিসেবে কুমিল্লার কোটবাড়িতে পল্লী উন্নয়ন একাডেমি প্রতিষ্ঠা করেন। তাঁর উদ্যোগে ১৯৬০ সালে কুমিল্লার কোতোয়ালি থানায় দ্বি-স্তর সমবায় পদ্ধতির যাত্রা শুরু। গ্রাম পর্যায়ে প্রাথমিক সমবায় সমিতি এবং থানা পর্যায়ে কোতোয়ালি থানা সেন্ট্রাল কো-অপারেটিভ অ্যাসোসিয়েশন গঠন করার মাধ্যমে উক্ত কর্মসূচি চালু হয়। ১৯৬০ সালে সমবায় অধিদপ্তর থেকে মাসিক সমবায় এবং ইংরেজি ষান্মাসিক *কো-অপারেশন* পত্রিকার প্রকাশনা শুরু। ১৯৬২ সালে প্রথমবারের মতো জাতীয় সমবায় নীতিমালা গৃহীত ও প্রচারিত হয়। ১৯৭১ সালে সমন্বিত পল্লী উন্নয়ন কর্মসূচি চালু করার মাধ্যমে কুমিল্লায় দ্বি-স্তর সমবায় পদ্ধিতির কার্যক্রম প্রদেশব্যাপী ছড়ানোর পদক্ষেপ নেওয়া হয়। স্বাধীনতার পর সমবায়ের গুরুত্ব উপলব্ধি করে বাংলাদেশের সংবিধানের ১৩ (খ) অনুচ্ছেদে সমবায়কে মালিকানার অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ খাত হিসেবে ঘোষণা দেওয়া হয়েছে। এসময়ে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান সমবায়ের গুরুত্ব অনুধাবন করে দেশের প্রত্যেক ইউনিয়নভিত্তিক বহুমুখী সমবায় সমিতির মাধ্যমে দেশের সাধারণ মানুষের কাছে সহজে এবং সুলভমূল্যে নিত্যপ্রয়োজনীয় খাদ্য দ্রব্য এবং কৃষি উপকরণ পৌঁছে দেওয়ার প্রতিশ্রুতি প্রদান করেন। এছাড়া দেশের প্রত্যেকটি গ্রামে কৃষি সমবায় সমিতি গঠনের মাধ্যমে কৃষকদের মাঝে সহজ শর্তে ঋণ প্রদান করা হয়েছিল।

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান প্রতিটি গ্রামে বহুমুখী কো-অপারেটিভ গঠনের স্বপ্ন দেখেছিলেন। কিন্তু ১৯৭৫ সালের ১৫ই আগস্ট পৃথিবীর এক নিকৃষ্টতম হত্যাযজ্ঞের মাধ্যমে বাঙালি জাতির মানুষের সেই স্বপ্ন নস্যাৎ হয়ে যায়। যার ফলে বঙ্গবন্ধুর স্বপ্নের ইউনিয়নভিত্তিক সমবায় সমিতি এবং কৃষি সমবায় সমিতি সমূহের কার্যক্রম এগিয়ে যায়নি। অন্যদিকে সমবায় আন্দোলনে দ্বিমুখী ধারা প্রবাহিত হওয়ায় সমবায় বিভাগ পরিচালিত কার্যক্রম কৃষি ক্ষেত্র ছাড়াও মৎস্য চাষ, ইক্ষু চাষ, তাঁতশিল্প, হস্তশিল্প, দুগ্ধ উৎপাদন ও প্রক্রিয়াজাতকরণ ইত্যাদি ক্ষেত্রে চালু হয়। ১৯৭৩ সালে বঙ্গবন্ধুর প্রচেষ্টায় সমবায় ভিত্তিতে দুগ্ধ উৎপাদন, প্রক্রিয়াজাতকরণ ও বিপণনের লক্ষ্যে বাংলাদেশ দুগ্ধ উৎপাদনকারী সমবায় ইউনিয়ন লিমিটেড মিল্কভিটা প্রতিষ্ঠিত হয়। ১৯৭৫ সালে বংলাদেশ গণপরিবহণ চালক সমিতি ও পরে বাংলাদেশ অটো রিকশা চালক সমিতি গড়ে ওঠে। আইআরডিপি মহিলা উন্নয়ন কর্মসূচি গ্রহণের মাধ্যমে মহিলা সমবায় সমিতি গঠনের কার্যক্রম শুরু হয়। ১৯৮২ সালে বাংলাদেশ ট্রাক চালক ফেডারেশন গঠন করে পরিবহণ সমবায় কার্যক্রম আরও জোরদার করে। ১৯৮৩ সালে বাংলাদেশে কো-অপারেটিভ ফেডারেশন গঠনের মাধ্যমে হাউজিং সমবায় সমিতি গঠনের উদ্যোগ নেওয়া হয়।

১৯৮৪ সালের ৩১শে ডিসেম্বর ১৯৪০ সালের বঙ্গীয় সমবায় আইন বাতিল করে 'সমবায় সমিতি অধ্যাদেশ ১৯৮৪' জারি করে যা ১৪ই জানুয়ারি ১৯৮৫ তারিখে পুরাতন সরকারি গেজেট প্রকাশিত হয়। একই সালে সরকার সমবায় বিভাগের চাকরি বিসিএস ক্যাডারে অন্তর্ভুক্ত করে। ১৯৮৭ সালের ২০শে জানুয়ারি 'সমবায় সমিতি নিয়মাবলী ১৯৮৭' গেজেট বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে জারি করা হয়। এতে নির্বাচন সংক্রান্ত সমবায়ের নতুন বিধিমালাসহ অনেক বিধি প্রণয়ন ও সংশোধন করা হয়। ১৯৮৯ সালে স্বাধীন বাংলাদেশে প্রথমবারের মতো সমবায় নীতিমালা প্রবর্তন করা হয়। ২০০১ সালে বাংলায় সমবায় আইন জারি করা হয়। ২০০২ সালে আইনের কতিপয় ধারা সংশোধন করা হয়। সমবায় সমিতি আইন ২০০১ ও সংশোধিত আইন ২০০২-এর সমর্থনে ২০০৪ সালে সমবায় সমিতি বিধিমালা ২০০৪ জারি করা হয়। দারিদ্র্যমুক্ত আত্মনির্ভরশীল বাংলাদেশ গড়ায় সমবায় উদ্যোগকে উৎসাহ প্রদান এবং গণমুখী সমবায় আন্দোলনের দিক নির্দেশনার প্রয়োজনে ১৯৮৯ সালে প্রণীত সমবায় নীতিমালাকে যুগোপযোগী করে 'জাতীয় সমবায় নীতিমালা ২০১২' প্রণয়ন করা হয়। ২০১৩ সালে সমবায় আইনকে অধিকতর সংশোধন করে সংশোধিত সমবায় আইন ২০১৩ জারি করা হয়।

এ সুদীর্ঘ পথপরিক্রমায় সমবায় আন্দোলন অর্থনীতির বিভিন্ন ক্ষেত্রে ছড়িয়ে পড়েছে। দেশের অর্থনীতির বিভিন্ন সেক্টরে সংগঠিত এসব সমিতির সংখ্যা বর্তমানে বাংলাদেশে প্রায় পৌনে দুই লাখ। দেশের এক কোটিরও বেশি মানুষ এসব সমিতির সদস্যপদ গ্রহণ করে সমবায় আন্দোলনকে জোরদার করেছে। বঙ্গবন্ধু সমবায়ের মাধ্যমে সমাজ থেকে দারিদ্র্য ও বেকারত্ব দূর করে শোষণহীন সুখী সমৃদ্ধ সোনার বাংলা গড়ার লক্ষ্যে সার্বিক গ্রাম উন্নয়ন বহুমুখী সমবায় সমিতি গঠনে জনগণকে উদ্বুদ্ধ করেছিলেন। আর সেই আদর্শ ও নীতি ধারণ করে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা সমবায় খাতকে সর্বাধিক গুরুত্ব দিয়ে দেশের সুবিধাবঞ্চিত মানুষের ভাগ্য উন্নয়নে নিরলস কাজ করে যাচ্ছেন। ২০২১ সালের মধ্যে মধ্যম আয়ের বাংলাদেশ এবং ২০৪১ সাল নাগাদ উন্নত সমৃদ্ধ বাংলাদেশ গড়ে তোলার মাধ্যমে জাতির পিতার স্বপ্ন পূরণে টেকসই সমবায় আন্দোলন গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে।

সেলিনা আকতার: উপপরিচালক, চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তর

জননী সাহসিকা কবি সুফিয়া কামাল

জায়েদুল আলম

১৯১১ সালের ২০শে জুন বরিশালের শায়েস্তাবাদ নবাব পরিবারে কবি সুফিয়া কামালের জন্ম। ১৯৯৯ সালের ২০শে নভেম্বর ঢাকায় কবি সুফিয়া কামালের জীবনাবসান ঘটে।

সুফিয়া কামালের ডাকনাম ছিল হাসনা বানু। তাঁর নানি রেখেছিলেন এই নামটি আরব্য উপন্যাসের হাতেম তাইয়ের কাহিনি শুনে। সুফিয়া খাতুন নামটি রেখেছিল তাঁর নানা।

কবির পিতা সৈয়দ আবদুল বারি পেশায় ছিলেন উকিল। সুফিয়ার যখন সাত বছর বয়স তখন তাঁর পিতা গৃহত্যাগ করেন। নিরুদ্দেশ পিতার অনুপস্থিতিতে তিনি মা সৈয়দা সাবেরা খাতুনের পরিচর্যায় লালিতপালিত হতে থাকেন। শায়েস্তাবাদে নানার বাড়ির রক্ষণশীল অভিজাত পরিবেশে বড়ো হয়েও সুফিয়া কামালের মনোগঠনে দেশ, দেশের মানুষ ও সমাজ এবং ভাষা ও সংস্কৃতি মূল প্রেরণা হিসেবে কাজ করে।

কবি সুফিয়া কামাল তেমন কোনো প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা লাভ করেননি। তখনকার পারিবারিক ও সামাজিক প্রতিবেশে বাস করেও তিনি নিজ চেষ্টায় হয়ে ওঠেন স্বশিক্ষিত ও সুশিক্ষিত। পর্দার ঘেরাটোপ থেকে বেরিয়ে তিনি হয়ে ওঠেন একজন আধুনিক মানুষ। যে পরিবারে সুফিয়া কামাল জন্মগ্রহণ করেন সেখানে নারী শিক্ষাকে প্রয়োজনীয় মনে করা হতো না। তাঁর মাতৃকুল ছিল শায়েস্তাবাদের নবাব পরিবারে এবং সেই পরিবারের কথ্য ভাষা ছিল উর্দু। এই কারণে অন্দরমহলে মেয়েদের আরবি, ফারসি শিক্ষাব্যবস্থা থাকলেও বাংলা শেখানোর কোনো ব্যবস্থা ছিল না। তিনি বাংলা শেখেন মূলত তাঁর মায়ের কাছে। নানাবাড়িতে তাঁর বড়ো মামার একটি বিরাট গ্রন্থাগার ছিল। মায়ের উৎসাহ ও সহায়তায় এ লাইব্রেরির বই পড়ার তাঁর সুযোগ ঘটেছিল ।

১৯১৮ সালে কলকাতায় গিয়েছিলেন সুফিয়া কামাল। সেখানে বেগম রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেনের সঙ্গে তাঁর দেখা হয়েছিল। সুফিয়া কামালের শিশুমনে তখন বেগম রোকেয়ার কথা ও কাজ বিশেষ জায়গা করে নিয়েছিল। তাই সুফিয়া কামালের কাজেকর্মেও বেগম রোকেয়ার ছাপ পাওয়া যায় ।

১৯২৩ সালে মামাতো ভাই সৈয়দ নেহাল হোসেনের সঙ্গে সুফিয়ার বিয়ে হয়। পরে তিনি সুফিয়া এন হোসেন নামে পরিচিত হন।

২

সৈয়দ নেহাল হোসেন সুফিয়াকে সমাজসেবা ও সাহিত্যচর্চায় উৎসাহ দেন। সাহিত্য ও সাময়িক পত্রিকার সঙ্গে সুফিয়ার যোগাযোগও তিনি ঘটিয়ে দেন। ফলে তিনি বাংলা ভাষা ও সাহিত্যে আগ্রহী হয়ে ওঠেন। ১৯২৩ সালে তিনি রচনা করেন তাঁর প্রথম গল্প 'সৈনিক বধূ', যা বরিশালের *তরুণ* পত্রিকায় প্রকাশিত হয়।

১৯২৫ সালে বরিশালে মহাত্মা গান্ধীর সঙ্গে সুফিয়ার সাক্ষাৎ হয়। এর পূর্বে গান্ধীর স্বাধীনতা সংগ্রামের দ্বারা উদ্বুদ্ধ হয়ে তিনি কিছুদিন চরকায় সুতা কাটেন। তিনি এসময় নারীকল্যাণমূলক সংগঠন মাতৃমঙ্গল-এ যোগ দেন।

১৯২৬ সালে তাঁর প্রথম কবিতা 'বাসন্তী' সেসময়ের প্রভাবশালী সাময়িকী *সওগাতে* প্রকাশিত হয়। ত্রিশের দশকে কলকাতায় অবস্থানকালে বাংলা সাহিত্যের উজ্জ্বল নক্ষত্র যেমন রবীন্দ্রনাথ, নজরুল, শরৎচন্দ্র প্রমুখের দেখা পান তিনি। মুসলিম নারীদের সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডে অংশগ্রহণকে উৎসাহিত করার জন্য বেগম রোকেয়ার প্রতিষ্ঠিত সংগঠন আঞ্জুমানে খাওয়াতিনে ইসলামে রোকেয়ার সঙ্গে সুফিয়া কামালের পরিচয় হয়। বেগম রোকেয়ার চিন্তাধারা ও প্রতিজ্ঞা তাঁর মধ্যেও সঞ্চারিত হয়, যা তাঁর জীবনে সুদূরপ্রসারী প্রভাব ফেলে। কবি সুফিয়া কামাল তাঁর সাহিত্য প্রয়াসের সূচনা প্রসঙ্গে স্মৃতিচারণ করেছেন এভাবে– 'এমনি কোনো বর্ষণমুখর দিনে মুসলমান সাহিত্য পত্রিকায় প্রকাশিত কাজী নজরুল ইসলামের লেখা পড়ছিলাম বানান করে। প্রেম, বিরহ, মিলন এসবের মানে কি তখন বুঝি? তবু যে কী ভালো, কী ব্যথা লেগেছিল তা প্রকাশের ভাষা কি আজ আর আছে ? গদ্য লেখার সেই নেশা। এরপর প্রবাসী পত্রিকায় রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের কবিতা পড়তে পড়তে অদ্ভুত এক মোহগ্রস্ত ভাব এসে মনকে যে-কোনো অজানা রাজ্যে নিয়ে যেত। এরপর দেখতাম রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেন, বেগম সারা তাইফুর লিখছেন। কবিতা লিখছেন বেগম মোতাহেরা বানু। মনে হলো ওরা লিখছেন আমিও কি লিখতে পারি না? শুরু হলো লেখা লেখা খেলা। কী গোপনে, কত কুণ্ঠায়, ভীষণ লজ্জার সেই হিজিবিজি লেখা ছড়া, গল্প। কিন্তু কোনোটাই কি মনের মতো হয়! কেউ জানবে, কেউ দেখে ফেলবে বলে ভয়ে ভাবনায় সে লেখা কত লুকিয়ে রেখে আবার দেখে দেখে নিজেই শরমে সংকুচিত হয়ে উঠি।' এভাবে বেগম সুফিয়া খাতুন সচেতনতা বৃদ্ধির পাশাপাশি তাঁর সাহিত্যচর্চা করতে থাকেন ।

৩

১৯৩২ সালে তাঁর প্রথম স্বামীর আকস্মিক মৃত্যু তাঁকে আর্থিক সমস্যায় নিপতিত করে। তিনি কলকাতা কর্পোরেশন স্কুলে শিক্ষকতা শুরু করেন এবং ১৯৪২ সাল পর্যন্ত এ পেশায় নিয়োজিত থাকেন। এর মাঝে ১৯৩৭ সালে তাঁর গল্পের সংকলন *কেয়ার কাঁটা* প্রকাশিত হয়।

১৯৩৮ সালে প্রকাশিত হয় তাঁর *সাঁঝের মায়া* প্রথম কাব্যগ্রন্থটি। *সাঁঝের মায়ার* মুখবন্ধে কবি লিখেছেন– বইটি বিদগ্ধজনের প্রশংসা কুড়ায়, যাদের মাঝে ছিলেন কবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। কাব্যগ্রন্থটির ভূমিকা লিখেছিলেন কবি কাজী নজরুল ইসলাম। রবীন্দ্রনাথ এটি পড়ে উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করেছিলেন। কবি রবীন্দ্রনাথ একটি চিঠিতে সুফিয়া এন. হোসেন (তাঁর তখনকার পরিচয়)কে লিখেছিলেন, 'তোমার কবিতা আমাকে বিস্মিত করে। বাংলা সাহিত্যে তোমার স্থান উচ্চে এবং ধ্রুব তোমার প্রতিষ্ঠা'। শুধু সাহিত্যে নয়, বাংলাদেশের জনগণের মনে বেগম সুফিয়া কামাল ধ্রুব প্রতিষ্ঠা লাভ করেছেন তাঁর স্বকীয় স্বভাবগুণে।

১৯৩৯ সালে তিনি চট্টগ্রামের লেখক ও অনুবাদক কামালউদ্দীন আহমদের সঙ্গে পুনরায় পরিণয়সূত্রে আবদ্ধ হন। সেই থেকে তিনি কবি সুফিয়া কামাল নামে পরিচিত হন।

কিছুকাল তিনি নারীদের জন্য প্রকাশিত সাময়িকী *বেগমের* সম্পাদক ছিলেন।

১৯৪৭ সালে দেশ বিভাগের পর সুফিয়া কামাল পরিবারসহ ঢাকায় চলে আসেন। ভাষা আন্দোলনে তিনি নিজে সক্রিয়ভাবে অংশ নেন এবং এতে অংশ নেওয়ার জন্য নারীদের উদ্বুদ্ধ করেন।

১৯৪৮ সালে সুফিয়া কামাল ব্যাপকভাবে সমাজসেবা ও রাজনীতির সঙ্গে যুক্ত হয়ে পড়েন। তিনি হিন্দু-মুসলিম সম্প্রীতি রক্ষার উদ্দেশ্যে শান্তি কমিটিতে যোগ দেন। এবছরই তাঁকে সভানেত্রী করে 'পূর্ব পাকিস্তান মহিলা সমিতি' গঠিত হয়। ১৯৪৯ সালে তাঁর যুগ্ম সম্পাদনায় প্রকাশিত হয় *সুলতানা* পত্রিকা, বেগম রোকেয়ার *সুলতানার স্বপ্ন* গ্রন্থের প্রধান চরিত্রের নামানুসারে যার নামকরণ করা হয় ।

৪

১৯৫২ সালের ভাষা আন্দোলনে কবি সুফিয়া কামাল সরাসরি অংশগ্রহণ করেন। শুধু তা-ই নয়, পাকিস্তান সরকার বাংলা ভাষা ও বাঙালি সংস্কৃতির ওপর দমন-নীতির অঙ্গ হিসেবে রবীন্দ্রনাথকে নিষিদ্ধ ঘোষণা করলে তিনি তার বিরুদ্ধেও তীব্র প্রতিবাদ জানান। ১৯৬১ সালে রবীন্দ্রনাথের জন্মশতবর্ষে তিনি সাংস্কৃতিক স্বাধিকার আন্দোলন পরিচালনা করেন। ১৯৬৯ সালে মহিলা সংগ্রাম পরিষদ (বর্তমানে বাংলাদেশ মহিলা পরিষদ) গঠিত হলে তিনি তার প্রতিষ্ঠাতা প্রধান নির্বাচিত হন এবং আজীবন তিনি এর সঙ্গে জড়িত ছিলেন। স্বাধীনতার পরও সুফিয়া কামাল অনেক সংগঠন প্রতিষ্ঠা ও পরিচালনা করেন। তিনি যেসব সংগঠনের প্রতিষ্ঠা-প্রধানের দায়িত্ব পালন করেন সেগুলো হলো: বাংলাদেশ মহিলা পুনর্বাসন বোর্ড, বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন কমিটি এবং দুস্থ পুনর্বাসন সংস্থা। এছাড়াও তিনি ছায়ানট, বাংলাদেশ প্রতিবন্ধী ফাউন্ডেশন এবং নারী কল্যাণ সংস্থার সভানেত্রী ছিলেন।

১৯৫৬ সালে শিশুদের সংগঠন কচিকাঁচার মেলা প্রতিষ্ঠা করেন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম মহিলা হোস্টেলকে রোকেয়া হল নামকরণের দাবি জানান। ১৯৬১ সালে পাকিস্তান সরকার কর্তৃক রবীন্দ্রসংগীত নিষিদ্ধের প্রতিবাদে সংগঠিত আন্দোলনে তিনি জড়িত ছিলেন। এই বছরে তিনি ছায়ানটের প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হন। ১৯৬৯ সালে মহিলা সংগ্রাম কমিটির সভাপতি নির্বাচিত হন। গণ-অভ্যুত্থানে অংশ নেন, পাকিস্তান সরকার কর্তৃক ইতিপূর্বে প্রদত্ত তমঘা-ই-ইমতিয়াজ পদক বর্জন করেন। ১৯৭০ সালে মহিলা পরিষদ প্রতিষ্ঠা করেন। ১৯৭১ সালের মার্চে অসহযোগ আন্দোলনে নারীদের মিছিলে নেতৃত্ব দেন। মুক্তিযুদ্ধের সময় তাঁর বাসভবনসংলগ্ন গোটা ধানমন্ডি এলাকা পাকিস্তানি বাহিনীর নিরাপত্তা হেফাজতে ছিল, আর ঐ সময় তিনি ধানমন্ডিতে নিজ বাসভবনে সপরিবার নিরাপদে অবস্থান করেন ।

১৯৭১ সালে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে সুফিয়া কামালের দুই মেয়ে মুক্তিবাহিনীতে যোগ দেন এবং ভারতের আগরতলায় মুক্তিযোদ্ধাদের সেবার জন্য একটি হাসপাতাল স্থাপন করেন। সুফিয়া, তাঁর স্বামী ও ছেলে দেশের মধ্যেই থেকে যান মুক্তিবাহিনীকে সাহস ও শক্তি জোগানোর জন্য এবং মুক্তিযোদ্ধাদের বিভিন্ন খবরাখবর সরবরাহের জন্য। যুদ্ধকালীন তিনি *একাত্তরের ডায়েরী* নামে একটি দিনলিপি রচনা করেন এবং এ সময়ে লেখা তাঁর কবিতাগুলো পরবর্তীকালে *মোর যাদুদের সমাধি পরে* নামে গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়। কবিতাগুলোতে তিনি বাঙালিদের ওপর পাকিস্তানি বাহিনীর নৃশংসতা বর্ণনা করেন এবং দেশের স্বাধীনতা যুদ্ধে মুক্তিযোদ্ধাদের অনুপ্রাণিত করেন।

৫

এ সময় রচিত 'বেণীবিন্যাস সময় তো আর নেই' কবিতায় মাতৃভূমির প্রতি দায়িত্ব পালনের জন্য তিনি নারীদেরও আহ্বান জানান। স্বাধীন বাংলাদেশে নারী জাগরণ আর সমঅধিকার প্রতিষ্ঠার সংগ্রামে তিনি উজ্জ্বল ভূমিকা রেখে গেছেন। ১৯৯০ সালে স্বৈরাচারবিরোধী আন্দোলনে শরিক হয়েছেন, কারফিউ উপেক্ষা করে নীরব শোভাযাত্রা বের করেছেন। মুক্তবুদ্ধির পক্ষে এবং সাম্প্রদায়িকতা ও মৌলবাদের বিপক্ষে আমৃত্যু তিনি সংগ্রাম করেছেন। প্রতিটি প্রগতিশীল আন্দোলনে অংশ নিয়েছেন। বেগম রোকেয়ার সামাজিক আদর্শ সুফিয়াকে আজীবন প্রভাবিত করেছে। তিনি বেগম রোকেয়ার ওপর অনেক কবিতা রচনা করেন এবং তাঁর নামে *মৃত্তিকার ঘ্রাণ* (১৯৭০) শীর্ষক একটি সংকলন উৎসর্গ করেন। তিনি রোকেয়া সাখাওয়াত স্মৃতি কমিটি গঠনে সহায়তা করেন, যার প্রস্তাবে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম মহিলা হল 'রোকেয়া হল' বেগম রোকেয়ার নামে করা হয়।

১৯৪১ সালে কবি সুফিয়া কামালের মা মারা যান । ১৯৬৩ সালে পুত্র শোয়েব মারা যান। ১৯৭৭ সালে স্বামী কামালউদ্দিন খান পরলোক গমন করেন।

সুফিয়া কামাল সাহিত্যচর্চার পাশাপাশি সমাজসেবা ও বিভিন্ন সংগঠনের কর্মকাণ্ডে বিশেষভাবে যুক্ত ছিলেন। তাঁর ভাষ্য অনুযায়ী জানা যায়, 'চৌদ্দ বছর বয়সে বরিশালে প্রথমে সমাজ সেবার সুযোগ পাই। বাসন্তী দেবী ছিলেন অশ্বিনীকুমার দত্তের ভাইয়ের ছেলের বৌ। তার সঙ্গে দুস্থ মেয়েদের বিশেষ করে মা ও শিশুদের জন্য মাতৃসদনে আমি কাজ শুরু করি'।

জীবনের পরবর্তী সময়ে সমাজ সেবা ও সংগঠনমূলক কাজের বিবরণ কবি সুফিয়া কামাল এভাবে বর্ণনা করেন– 'প্রথম জীবনে কাজ করার পর আঠারো থেকে বিশ বছর বয়স পর্যন্ত আমি বেগম রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেনের প্রতিষ্ঠিত কলকাতার আঞ্জুমান খাওয়াতিনে কাজ করি। এই প্রতিষ্ঠানের কাজ ছিল কলকাতার বস্তি এলাকার মুসলমান মেয়েদের মনোভাবে একটু শিক্ষিত করে তোলা'।

সুফিয়া কামালের কবিতার বিষয় প্রেম, প্রকৃতি, ব্যক্তিগত অনুভূতি, বেদনাময় স্মৃতি, জাতীয় উৎসবাদি, স্বদেশানুরাগ, মুক্তিযুদ্ধ এবং ধর্মানুভূতি। অন্তরঙ্গ আবেগের বিশিষ্ট পরিচর্যায় এবং ভাষাভঙ্গির সহজ আবেদনঘন স্পর্শে তাঁর কবিতা সুন্দর ও আকর্ষণীয়। তিনি ভ্রমণ ও ডায়রি জাতীয় গদ্য ও শিশুতোষ গ্রন্থও রচনা করেছেন। তাঁর প্রকাশিত গ্রন্থের সংখ্যা ২০টিরও বেশি।

৬

সুফিয়া কামাল *একালে আমাদের কাল* নামে একটি আত্মজীবনী রচনা করেছেন। তাতে তাঁর ছোটোবেলার কথা এবং রোকেয়া-প্রসঙ্গ স্থান পেয়েছে। তিনি অনেক ছোটোগল্প এবং ক্ষুদ্র উপন্যাসও রচনা করেছেন। *কেয়ার কাঁটা* (১৯৩৭) তাঁর একটি উল্লেখযোগ্য গল্পগ্রন্থ। তাঁর আরও কয়েকটি উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ হলো: *মায়া কাজল* (১৯৫১), *মন ও জীবন* (১৯৫৭), *উত্তপ্ত পৃথিবী* (১৯৬৪), *অভিযাত্রিক* (১৯৬৯) ইত্যাদি। তাঁর কবিতা চীনা, ইংরেজি, জার্মান, ইতালিয়ান, পোলিশ, রুশ, ভিয়েতনামি, হিন্দি ও উর্দু ভাষায় অনূদিত হয়েছে। ১৯৮৪ সালে রুশ ভাষায় তার *সাঁঝের মায়া* গ্রন্থটি সোভিয়েত ইউনিয়ন থেকে প্রকাশিত হয়। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বিভিন্ন পত্রপত্রিকায়ও তাঁর বেশ কিছু কবিতা প্রকাশিত হয়। ২০০১ সালে বাংলা একাডেমি তাঁর কিছু কবিতার ইংরেজি অনুবাদ দিয়ে *Mother of Pears and other poem* এবং ২০০২ সালে *সুফিয়া কামালের রচনা সমগ্র* প্রকাশ করেছে।

কেয়ার কাঁটা সমেত সুফিয়া কামালের মোট প্রকাশিত গদ্যগ্রন্থ সংখ্যা চার। অন্য তিনটি হলো– *সোভিয়েতের দিনগুলি* (ভ্রমণ, ১৯৬৮), *একালে আমাদের কাল* (আত্মজীবনীমূলক রচনা, ১৯৮৮) এবং *একাত্তরের ডায়েরী* (১৯৮৯)। অগ্রন্থিত গদ্যের মধ্যে রয়েছে একটি অসম্পূর্ণ উপন্যাস *অন্তরা*। বৈশাখ ১৩৪৫ থেকে পাঁচ কিস্তিতে *অন্তরা* প্রকাশিত হয় কলকাতার *মাসিক মোহাম্মদী* পত্রিকায়। এর পরে আছে আর একটি ছোট্ট উপন্যাস (Novella) *জনক*। সোভিয়েত ইউনিয়নের ক্রিমিয়ায় স্বাস্থ্য নিবাসে ১৯৭৭ সালে ৬ থেকে ২০শে জানুয়ারির মধ্যে মাত্র ১৫ দিনে সুফিয়া কামাল *জনক* রচনা করেন। ঢাকা থেকে প্রকাশিত নূরজাহান বেগম সম্পাদিত সাপ্তাহিক *বেগম* পত্রিকায় ১২ সংখ্যায় ধারাবাহিকভাবে উপন্যাসটি প্রকাশিত হয় ।

সাহিত্যচর্চার জন্য সুফিয়া কামাল অসংখ্য পুরস্কার ও সম্মাননা লাভ করেছেন। ১৯৬১ সালে তিনি পাকিস্তান সরকার কর্তৃক তমঘা-ই-ইমতিয়াজ নামক জাতীয় পুরস্কার লাভ করেন; কিন্তু ১৯৬৯ সালে বাঙালিদের ওপর অত্যাচারের প্রতিবাদে তিনি তা বর্জন করেন। উল্লেখযোগ্য আরও কয়েকটি পুরস্কার ও পদক হলো: বাংলা একাডেমি পুরস্কার (১৯৬২), একুশে পদক (১৯৭৬), জাতীয় কবিতা পরিষদ পুরস্কার (১৯৯৫), Women's Federation for World Peace Crest (1996), বেগম রোকেয়া পদক (১৯৯৬), দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ স্বর্ণপদক (১৯৯৬), স্বাধীনতা দিবস পুরস্কার (১৯৯৭) ইত্যাদি।

৭

তিনি সোভিয়েত ইউনিয়নের Lenin Centenary Jubilee Medal (1970) এবং Czechoslovakia Medal (1986)সহ বেশ কয়েকটি আন্তর্জাতিক পুরস্কারও লাভ করেন।

সবশেষে বলতে হয়, সুফিয়া কামাল কবি হিসেবে সমধিক পরিচিত কিন্তু গদ্যলেখক হিসেবেও তাঁর অবদান রয়েছে। বুদ্ধিজীবী, সমাজকর্মী ও সচেতন নাগরিক হিসেবে তাঁর ভূমিকা ছিল বিশেষভাবে উজ্জ্বল। তাঁর সময়কালে পশ্চাৎপদ মুসলিমসমাজের একজন নারী হিসেবে সীমাবদ্ধ গণ্ডি পেরিয়ে ভূমিকা রাখা ছিল শুধু গৌরবের নয়, বিশেষভাবে অসাধারণ বিষয়।

কবি সুফিয়া কামাল রাজনৈতিক বিবেচনা থেকে দেশের উন্নয়ন ও সমৃদ্ধির কথা ভেবেছেন, অন্যদিকে বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গির মাধ্যমে প্রগতির পথে এগিয়ে যাওয়ার বাসনা অনুভব করেছেন। মানুষে মানুষে ভালোবাসা ও সাম্য তাঁর লেখা ও কর্মকাণ্ডে ভিত্তিমূল হিসেবে কাজ করেছে। দার্শনিক বিবেচনাবোধ থেকে এভাবে তিনি ইতিহাস ও সমাজ বিশ্লেষণ করেছেন।

কবি সুফিয়া কামালের ব্রত ছিল মানুষের কল্যাণ। তাঁর ছিল সত্যের সাধনা। কঠিন দুঃকীর্ণ সত্যের। সততার সাধনায় মেলে সাহস, অর্জিত হয় চারিত্রিক দৃঢ়তা। তাঁর ব্যক্তিত্বের শিরদাঁড়া এই চরিত্র-ঋজু ব্যক্তিত্ব, দৃঢ় চরিত্র আর স্বচ্ছ মানস জন্ম দেয় সুন্দরের। যে সুন্দর সাহসী এবং ওজস্বী। আত্মবিশ্বাস ও আত্মমর্যাদায় পরিপক্ব। সুফিয়া কামাল সংসারকে কখনো প্রাধান্য পেতে দেননি, এমনকি কাব্যকেও জীবনজুড়ে দাঁড়াতে দেননি, খ্যাতি বা প্রতিষ্ঠা গ্রাস করতে পারেনি জীবন। তাঁর পটভূমি ও ক্ষেত্র হয়ে উঠেছিল দেশ ও ইতিহাস। দেশের কাজ এবং ইতিহাসের দায় সুফিয়া কামালকে সবসময়ে রেখেছে ব্যস্ত। কঠিন এবং অবশ্যই সঠিক সিদ্ধান্ত তাঁকে নিতে হয়েছে বারংবার। ইতিহাসের কী সব ঘূর্ণিপাক, বাঁক তিনি পেরিয়েছেন সাবলীল স্বচ্ছতায় যখন বহু মনীষী হোঁচট খেয়েছেন, বোকা হয়েছেন। এভাবে সুফিয়া কামাল যেন হয়ে উঠেছিলেন সত্য পথের ধ্রুবতারা। প্রজ্ঞার মাধুর্যে স্থির আর চিত্তের জৌলুসে উজ্জ্বল।

কবি সুফিয়া কামালকে আমরা বলি জননী সাহসিকা। তাঁর এই জননী-প্রতিমা জাতি-ধর্ম-বর্ণ অতিক্রম করে তাঁর স্বতঃস্ফূর্ত স্বাভাবিক কল্যাণময়তায় সবাইকে নাড়া দেয়। সেখানে ছেলেমেয়ের বৈষম্যও থাকে না। জননীত্ব স্বয়ং সার্বভৌমত্ব পায়। তা শুধু আগলেই রাখে না, বাড়তেও দেয়।

৮

জীবনের শোভন সুন্দর বিকাশের মানসিক আশ্রয় হয়ে থাকে। ব্যাপ্ত চরাচরে প্রকৃতি যেমন তেমনই। একই রকম স্বয়ংক্রিয় সুষমা। একই রকম প্রত্যয়দৃঢ় আত্মগরিমা। অহংকারের আস্ফালন নেই, কিন্তু সংকোচ বা আপোশ নেই। মৃদু মাধুর্যে অন্তরাত্মার সত্য ছবি আঁকে। মুক্ত প্রাণের অবাধ মহিমাকে অকুণ্ঠে ফুটিয়ে তোলে। শুধু নিজের ভেতরে নয়। জাগিয়ে তোলে তা আর সবার ভেতরেও। তাই শুধু তিনি জননী নন, জননী সাহসিকা।

সুতরাং, প্রকৃতি যে নারীত্বের সমার্থক, তাঁরই প্রাণশক্তিকে পরিপূর্ণ ধারণ করে তিনি আপন জীবন ধারায় তাঁর সর্বোত্তম প্রকাশ করেছেন ।

জায়েদুল আলম: শিক্ষাবিদ ও গবেষক, zaidulalam@yahoo.com

নবান্ন উৎসব

মঈনুল হক চৌধুরী

ষড়ঋতুর দেশ আমাদের মাতৃভূমি বাংলাদেশ। গ্রীষ্ম, বর্ষা, শরৎ, হেমন্ত, শীত ও বসন্ত নিয়ে আমাদের ষড়ঋতু। ঋতু বদলের পালায় আবার আমাদের মাঝে ফিরে এলো হেমন্ত ঋতু। ষড়ঋতুর মাঝে হেমন্ত একটি চমৎকার ঋতু। কী শান্ত, কী স্নিগ্ধ, কী মধুর ঋতু। হেমন্তের যেন তুলনাই হয় না। উল্লেখ্য, কার্তিক ও অগ্রহায়ণ বাংলা এ দু'মাসকে আমরা 'হেমন্তকাল' বলে থাকি। এক সময় বাংলার বছর শুরু হতো হেমন্ত দিয়ে। সম্রাট আকবর বাংলা পঞ্জিকা তৈরির সময় অগ্রহায়ণ মাসকেই বছরের প্রথম মাস বা খাজনা আদায়ের মাস হিসেবে ঘোষণা করেছিলেন। ষড়ঋতুর পালাবদলে সোনালি রঙের সৌন্দর্য নিয়ে হেমন্ত আসে আমাদের মাঝে। এসময় মাঠে মাঠে থাকে সোনালি ধান। হিম শীতল হাওয়ায় সোনালি ধানের শিষে ঢেউ খেলে আসে হেমন্ত। কিচিরমিচির পাখির ডাক, শিশিরে ভেজানো দুর্বা ঘাস, শুকিয়ে যাওয়া পথঘাট, পাকা ধানের মৌ মৌ ঘ্রাণ নিয়ে, মিষ্টি সূর্যের হাসি ছড়িয়ে, নবান্নের আমন্ত্রণে হেমন্ত আসে সোনা মাখা জাদু মাখা শিল্পীর ছবি আঁকা আমার বাংলাদেশে। কৃষক-কৃষানির মুখে অনাবিল হাসি, রাখাল রাজার মধুর বাঁশির ঝংকার ধ্বনিতে, মন-প্রাণ আকুলিবিকুলি করে। কবি লিখেন অনুপম কবিতা, ছড়াকার লিখেন শাশ্বত ছড়া। বাউল মনে জাগে ভাব আর ছন্দ, একতারা বাজিয়ে মেঠোপথ দিয়ে, যান দূর সীমানায় মিলিয়ে। কিছুটা লেপ কাঁথার প্রয়োজন পড়ে। এসময় কুয়াশার চাঁদরে ঢাকা পড়ে নদনদী, গোটা গ্রামবাংলা। এককালে গ্রামবাংলায় হেমন্তই ছিল উৎসব আনন্দের প্রধান মৌসুম। ঘরে ঘরে ফসল তোলার আনন্দ আর ধান ভানার গান ভেসে আসত বাতাসে। ঢেকির তালে মুখর হতো বাড়ির আঙিনা। নবান্ন আর পিঠে-পুলির আনন্দে মাতোয়ারা হতো সবাই।

আমাদের দেশে হেমন্তের আগের ঋতু বর্ষা আর শরৎ। হিম অর্থাৎ ঠান্ডা শব্দ থেকে এসেছে হেমন্ত। কারণ হেমন্ত হিম হিম বাতাসের সাথে শীতের আগমনী বার্তা নিয়ে আসে। সোনার আরেক নাম হিম। এই প্রকৃতি সোনালি রঙে সাজে সে জন্যও এই সময়কে হেমন্তকাল বলা হয়। এই হেমন্ত ঋতুতেই ধান কাটা, মাড়াই এবং কৃষকের গোলায় তোলা উপলক্ষে গ্রামবাংলার ঘরে ঘরে শুরু হয় নবান্ন উৎসব। নবান্ন উৎসব মানে নতুন অন্ন বা ভাতের উৎসব। নতুন ফসল ঘরে তোলা উপলক্ষে কৃষকরা এই উৎসব পালন করে থাকেন। সাধারণত নবান্ন হয় অগ্রহায়ণ মাসে। সে সময় আমন ধান কাটা হয়। এই নতুন ধানের চাল রান্না উপলক্ষে নবান্ন উৎসব হয়ে থাকে। আগের দিনে কোনো কোনো অঞ্চলে ফসল কাটার আগে বিজোড় সংখ্যক ধানের ছড়া কেটে নিয়ে ঘরের চালে বেঁধে রাখা হতো এবং পরে ক্ষেতের বাকি ধান কাটার পর নতুন চালের পায়েস করে নবান্ন করা হতো। ঐতিহাসিকদের গবেষণা থেকে জানা যায়, কৃষির মতোই প্রাচীন এই নবান্ন প্রথা। এই ভারতীয় উপমহাদেশের বঙ্গদেশে বারো মাসে তেরো পার্বণেরই একটি 'নবান্ন' উৎসব। নিজস্ব সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের ধারায় বাংলাদেশের বিভিন্ন অঞ্চলে এই উৎসব এখনও হয়ে থাকে। বাংলাদেশের কোনো কোনো অঞ্চলে ফসল তোলার পরদিনই নতুন ধানের চালে ফিরনি-পায়েস অথবা ক্ষীর তৈরি করে আত্মীয়স্বজন ও পাড়া-প্রতিবেশীর ঘরে ঘরে বিতরণ করা হয়। নবান্নে জামাইকে নিমন্ত্রণ করা হয়, মেয়েকেও বাপের বাড়িতে 'নাইওর' আনা হয়। নবান্নে বিভিন্ন ধরনের দেশীয় নৃত্য, গান, বাজনাসহ আবহমান বাংলার সাংস্কৃতিক কর্মসূচি পালিত হয়। এছাড়া লাঠিখেলা, বাউলগান, নাগরদোলা, বাঁশি, শখের চুড়ি, খৈ ও মোয়ার পসরা বসে গ্রাম্য মেলায়।

নদী ও হাওর-বিলে পানি বেশ নেমে যায়। তখন জেলেরা একটি ভিন্ন আনন্দের অনুভূতি নিয়ে মাছ ধরা শুরু করেন। শান্ত নদীতে ভেসে চলে এক বা একাধিক নৌকা। এমন দৃশ্য কার না ভালো লাগে। উল্লেখ্য, হেমন্তের শেষ দিকে দূর দেশ থেকে দলবেঁধে আসে অতিথি পাখি। শীত বা তুষারপ্রবণ অঞ্চল থেকে এসব পাখি ছুটে আসতে শুরু করে আমাদের দেশে কিছুটা উষ্ণতার আশায়। তাই হেমন্তকে বলা হয় শীতের পূর্বাভাস। এসময় কুয়াশার চাঁদরে ঢাকা পড়ে নদনদী, গোটা গ্রামবাংলা। গ্রামে গ্রামে ধুম পড়ে যায় খেজুর রসের পিঠা আর শিন্নি বানানোর অঘোষিত প্রতিযোগিতার। ছেলেমেয়ের কলকাকলি আর ধান মাড়াইয়ের শব্দে জেগে ওঠে সমস্ত পাড়াগাঁও। হাটুরে হাটে যান। ফেরিওয়ালা নানাবিধ পণ্য নিয়ে পথে যেতে যেতে হাঁক ছাড়েন, বাজান ঘন্টি। দুধওয়ালা দুধে ভরা কলসি নিয়ে ছোটেন গ্রাম পেরিয়ে শহরের উদ্দেশ্যে। লোকজন নিয়ে গরুর কিংবা মহিষের গাড়ি ছুটে এ গ্রাম থেকে ভিনগাঁয়ে অথবা অন্য পথপ্রান্তরে। নৌপথে নববধূ চলেন নাইওরে। তার দু'চোখে ভাসে ফেলে আসা দিনগুলো, দুরন্ত শৈশব, কৈশোর আর আগামীর স্বপ্ন। থেকে থেকে পরাণ মাঝি গেয়ে ওঠে ভাটিয়ালি, মুরশিদি। সব মিলে অন্যরকম একটা ভালোলাগা দোল দিয়ে যায় 'হেমন্ত ঋতু' গ্রামীণ জনপদে। আসলে হেমন্তের আবহাওয়া সত্যিই মনোরম। যদি সারা বছরই হেমন্তকাল হতো! গরমও না, ঠান্ডাও না, এমনকি বৃষ্টিও না। সত্যি এক মনোরম আবহাওয়া নিয়ে প্রতিবছর আমাদের মাঝে ফিরে আসে হেমন্ত ঋতু। আর আমরা তাই হেমন্তের গুণগান করি তার রূপ সৌন্দর্য দেখে।

মঈনুল হক চৌধুরী: সাংবাদিক ও শিশুসাহিত্যিক

নীরব ঘাতক ডায়াবেটিস

ডা. মোহাম্মদ হাসান জাফরী

১৪ই নভেম্বর ছিল বিশ্ব ডায়াবেটিস দিবস। ইনসুলিনের আবিষ্কারক স্যার ফ্রেডরিক বেন্টিং-এর জন্মদিনকে বেছে নেওয়া হয়েছে এ দিবস পালনের জন্য। এ বছরের প্রতিপাদ্য বিষয় ছিল– 'ডায়াবেটিসের ঝুঁকি জানুন, প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিন।' অতীতের মানুষ সংক্রামক রোগের বিষয়ে বেশি ভয় পেত। কিন্তু বর্তমান যুগ অসংক্রামক রোগের যুগ, যারা নীরব ঘাতক হিসেবে মানুষের মৃত্যু ডেকে আনে। ডায়াবেটিস বা বহুমূত্র একটি নন-কমিউনিকেবল (অসংক্রমণযোগ্য) রোগ, যা একবার হলে সম্পূর্ণ প্রতিকার করা সম্ভব নয় কিন্তু নিয়ন্ত্রণে রাখা সম্ভব। ডায়াবেটিসকে নীরব ঘাতক বলার কারণ, আমাদের আশপাশের অনেকেই জানেন না যে তার ডায়াবেটিস আছে, যে জন্য চিকিৎসার সুযোগ প্রাপ্তিও হয়ে ওঠে না। এজন্যই এ বছর এ প্রতিপাদ্য বিষয়কে সামনে আনা হয়েছে। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার জরিপ অনুযায়ী, সারা বিশ্বে এ সমস্যা বেড়েই চলেছে। বর্তমান বিশ্বে ডায়াবেটিসে আক্রান্ত মানুষের সংখ্যা প্রায় ৫০ কোটি। ৩০ বছর আগের তুলনায় এই সংখ্যা এখন চার গুণেরও বেশি। ইন্টারন্যাশনাল ডায়াবেটিস ফাউন্ডেশনের তথ্য অনুযায়ী, বাংলাদেশে বর্তমানে ডায়াবেটিস রোগীর সংখ্যা ৭৫ লাখেরও বেশি। অথচ এদের অর্ধেকেরই বেশি জানে না, তাদের ডায়াবেটিস রয়েছে। জীবনযাত্রার পরিবর্তন, কায়িক শ্রম কমে যাওয়া, খাদ্যে নানা ক্ষতিকর পদার্থের উপস্থিতি, দুশ্চিন্তা বেড়ে যাওয়া সব মিলিয়ে ডায়াবেটিস হওয়ার আশঙ্কা বেড়ে যায়। রোগীদের সক্ষমতা ও সচেতনতা বৃদ্ধি করার মাধ্যমে ডায়াবেটিস প্রতিরোধ ও নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব।

আমরা যখন কোনো খাবার খাই, তখন আমাদের শরীর সেই খাদ্যের শর্করাকে ভেঙে গ্লুকোজে রূপান্তরিত করে। অগ্ন্যাশয় থেকে ইনসুলিন নামক যে হরমোন নিঃসৃত হয়, তা আমাদের শরীরের কোষগুলোকে গ্লুকোজ গ্রহণ করতে সাহায্য করে। এই গ্লুকোজ শরীরের জ্বালানি বা শক্তি হিসেবে কাজ করে। শরীরে যখন ইনসুলিন তৈরি হতে না পারে অথবা এটা ঠিকমতো কাজ না করে, তখনই ডায়াবেটিস হয় এবং এর ফলে কোষে গ্লুকোজ ঢুকতে পারে না, যার ফলে রক্তে গ্লুকোজ জমা হতে শুরু করে।

ডায়াবেটিস বিভিন্ন ধরনের হতে পারে। তবে প্রধানত দুই ভাগে ভাগ করা যেতে পারে, টাইপ-১ ও টাইপ-২। টাইপ-১ (Insulin Dependent Diabetes) ডায়াবেটিস সাধারণত ছোটো বয়সেই দেখা দেয় এবং প্রত্যহ ইনসুলিন গ্রহণ ছাড়া এর কোনো চিকিৎসা নেই, অর্থাৎ ইনসুলিন নিয়েই বেঁচে থাকতে হয়। তবে সাধারণত ৪০ বছর বয়সের দিকে ডায়াবেটিস হয় এবং বংশ পরম্পরায় চলতে পারে। এই ডায়াবেটিসই টাইপ-২ (Insulin Non Dependent Diabetes) ডায়াবেটিস। তবে এ বয়সের মানুষের পাশাপাশি ছোটোদেরও ইদানীং টাইপ-২ ডায়াবেটিস লক্ষ্য করা যাচ্ছে এবং তা ক্রমেই বেড়ে চলেছে।

টাইপ-১ ডায়াবেটিসে অগ্ন্যাশয় থেকে ইনসুলিন উৎপাদন বন্ধ হয়ে যায়। তখন রক্ত প্রবাহে গ্লুকোজ জমা হতে শুরু করে। এর পেছনে জিনগত কারণ থাকতে পারে অথবা অগ্ন্যাশয়ে ভাইরাসজনিত সংক্রমণের কারণে ইনসুলিন উৎপাদনকারী কোষগুলো নষ্ট হয়ে গেলে এমন হতে পারে। আর টাইপ-২ ডায়াবেটিসে যারা আক্রান্ত তাদের অগ্ন্যাশয়ে যথেষ্ট ইনসুলিন উৎপন্ন হয় না অথবা এই হরমোনটি ঠিকমতো কাজ করে না।

সন্তানসম্ভবা হলেও অনেক নারীর ডায়াবেটিস হতে পারে (Gestational Diabetes)। তাদের দেহ থেকে যখন নিজের এবং সন্তানের জন্য প্রয়োজনীয় ইনসুলিন যথেষ্ট পরিমাণে তৈরি হতে না পারে, তখনই তাদের ডায়াবেটিস হতে পারে। গবেষণায় দেখা গেছে, ছয় থেকে ১৬ শতাংশ গর্ভবতী নারীর ডায়াবেটিস হতে পারে। ডায়েট, শরীরচর্চা অথবা ইনসুলিন নেওয়ার মাধ্যমে তাদের শরীরে গ্লুকোজের মাত্রা নিয়ন্ত্রণের মধ্যে রাখা গেলে তাদের টাইপ-২ ডায়াবেটিসে আক্রান্ত হওয়ার ঝুঁকি এড়িয়ে যাওয়া সম্ভব হয়।

ক্লান্তি বোধ করা ডায়াবেটিসের একটি বড়ো উপসর্গ। সবচেয়ে সাধারণ উপসর্গগুলোর মধ্যে রয়েছে– অতিরিক্ত তৃষ্ণা পাওয়া, বারবার ক্ষুধা লাগা, ঘন ঘন প্রস্রাব হওয়া (বিশেষ করে রাতের বেলায়); কোনো কারণ ছাড়াই ওজন কমে যাওয়া, প্রদাহজনিত রোগে বার বার আক্রান্ত হওয়া, দৃষ্টি ঝাপসা হয়ে যাওয়া, শরীরের কোথাও কেটে গেলে সেটা শুকাতে দেরি হওয়া ইত্যাদি। রক্তে স্বাভাবিক গ্লুকোজের পরিমাণ ৫.৫ থেকে ৬.০ mmol/L (খালি পেটে) এবং ৭.৭ mmol/L (ভরা পেটে)।

রক্তে গ্লুকোজের পরিমাণ বেশি হলে রক্তনালির মারাত্মক ক্ষতি হতে পারে। শরীরে যদি রক্ত ঠিকমতো প্রবাহিত হতে না পারে, তবে যেসব জায়গায় রক্তের প্রয়োজন সেখানে রক্ত পৌঁছাতে পারে না; ফলে স্নায়ু ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার ঝুঁকি বেড়ে যায়। এতে করে মানুষ দৃষ্টি শক্তি হারাতে পারে। ইনফেকশন দেখা দিতে পারে পায়ে। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা বলছে, অন্ধত্ব, কিডনি নষ্ট হয়ে যাওয়া, হার্ট অ্যাটাক, স্ট্রোক ইত্যাদির পেছনে একটি বড়ো কারণ ডায়াবেটিস। এছাড়া হাইপোগাইসেমিয়া, কিটোএসিডোসিস ইত্যাদি মারাত্মক জটিলতাও তৈরি হতে পারে।

ডায়াবেটিস নিয়ন্ত্রণে রাখতে শুধু ওষুধ বা ইনসুলিনই যথেষ্ট নয়। খাদ্যাভ্যাস, ওষুধ এবং শৃঙ্খলাবোধের মাধ্যমে ডায়াবেটিস নিয়ন্ত্রণে রাখা সম্ভব। এটাকে সংক্ষেপে বলা হয় 3D (Diet, Discipline,

Drug)। প্রক্রিয়াজাত খাবার ও পানীয় এড়িয়ে চলতে হবে। এড়িয়ে চলতে হবে ফাস্টফুড, চিনি জাতীয় পানীয়, মিষ্টি ইত্যাদি। খেতে হবে শাকসবজি, ফল এবং মোটা দানার খাদ্যশস্যের মতো স্বাস্থ্যকর খাবার। স্বাস্থ্যকর তেল, বাদাম খাওয়াও ভালো। যেসব মাছে ওমেগা থ্রি তেল আছে সেগুলো বেশি করে খেতে হবে। এক বেলা পেট ভরে না খেয়ে অল্প পরিমাণে বিরতি দিয়ে খেতে হবে। ডায়াবেটিস নিয়ন্ত্রণের মেডিসিনের মধ্যে আছে মূলত ইনসুলিন, যা বিভিন্ন রোগীর ক্ষেত্রে বিভিন্ন মাধ্যমে এবং ডোজে দেওয়া হয়। এছাড়া আছে বিভিন্ন মুখে খাওয়ার বিভিন্ন ওষুধ, যেমন– সালফোনাইলইউরিয়া, মেটফরমিন, লিনাগ্লিপটিন ইত্যাদি।

জীবনযাপনে শৃঙ্খলাই ডায়াবেটিস নিয়ন্ত্রণের মূল চাবিকাঠি। শরীরচর্চা বা ব্যায়াম করার মাধ্যমে রক্তে গ্লুকোজের মাত্রা কমিয়ে রাখা সম্ভব। প্রতিসপ্তাহে আড়াই ঘণ্টার মতো ব্যায়াম করা দরকার। তার মধ্যে দ্রুত হাঁটা এবং সিঁড়ি বেয়ে ওপরে ওঠাও এর মধ্যে রয়েছে। শারীরিকভাবে থাকতে হবে সক্রিয়। ওজন নিয়ন্ত্রণে রাখতে হবে। ধূমপান পরিহার করাও জরুরি। নজর রাখতে হবে কোলেস্টেরলের মাত্রার ওপরও।

বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার মতে, ১৯৮০ সালে ১৮ বছরের বেশি বয়সি মানুষের ডায়াবেটিসের হার ছিল পাঁচ শতাংশেরও কম কিন্তু ২০১৪ সালে তাদের সংখ্যা বেড়ে দাঁড়ায় আট দশমিক পাঁচ শতাংশ। আন্তর্জাতিক ডায়াবেটিস ফেডারেশন বলছে, প্রাপ্তবয়স্ক ডায়াবেটিসে আক্রান্তদের প্রায় ৮০ শতাংশ মধ্য ও নিম্ন আয়ের দেশের, যেখানে খুব দ্রুত খাদ্যাভ্যাসের পরিবর্তন ঘটছে। সংস্থাটি বলছে, ২০১৬ সালে ডায়াবেটিসের কারণে বিশ্বে প্রায় ১৬ লাখ মানুষের মৃত্যু হয়েছে।

উন্নত দেশগুলোর তুলনায় উন্নয়নশীল দেশগুলোয় এ রোগের বৃদ্ধির হার অনেক বেশি। বাংলাদেশে বর্তমানে ডায়াবেটিস রোগীর সংখ্যা প্রায় ৭৫ লাখ। ২০৪০ সাল নাগাদ এ সংখ্যা দেড় কোটি ছাড়িয়ে যাওয়ার আশঙ্কা রয়েছে। এ অবস্থায় ডায়াবেটিস সম্পর্কে গণসচেতনতা সৃষ্টির লক্ষ্যে এবং চিকিৎসা সেবা প্রদানে বাংলাদেশ সরকার এবং বিভিন্ন সংগঠন নানা কার্যক্রম পরিচালনা করে যাচ্ছে। সরকারি হাসপাতালগুলোয় স্বল্প খরচে ডায়াবেটিসের টেস্টগুলো করার ব্যবস্থা আছে। সরকারি টারশিয়ারি হাসপাতালগুলোয় মেডিসিন বিভাগের পাশাপাশি এন্ডোক্রাইন (হরমোন) এবং ডায়াবেটিস বিভাগ চালু আছে, যা ডায়াবেটিস রোগীদের নিয়মিত চিকিৎসা সেবা দিয়ে যাচ্ছে। ঢাকা মেডিকেলসহ দেশের বিভিন্ন মেডিকেলে ডায়াবেটিক ক্লিনিক চালু আছে। এছাড়া বাংলাদেশ সরকারের উদ্যোগে বিভিন্ন মাঠ, পার্কগুলো হাঁটার উপযোগী করা হয়েছে। বুড়িগঙ্গাসহ ঢাকার চারপাশের নদীর পাশে তৈরি হচ্ছে ওয়াকওয়ে। নিঃসন্দেহে এসব উদ্যোগ দেশের জনগণের স্বাস্থ্য রক্ষা এবং ডায়াবেটিস নিয়ন্ত্রণে শারীরিক পরিশ্রমের সুযোগের ক্ষেত্রে বিশেষ ভূমিকা রাখবে।

দেশে ১৯৫৬ সালের ফেব্রুয়ারিতে বাংলাদেশ ডায়াবেটিক অ্যাসোসিয়েশন গঠিত হয় (তখন পাকিস্তান ডায়াবেটিক অ্যাসোসিয়েশন নামকরণ করা হয়)। ১৯৮২ সালে বারডেম বহুমূত্র প্রতিরোধ ও নিয়ন্ত্রণে কমিউনিটিভিত্তিক কর্মসূচি গঠনের লক্ষ্যে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার সহযোগী কেন্দ্র হিসেবে দায়িত্ব লাভ করে। ইউরোপের বাইরে এ ধরনের প্রতিষ্ঠান এটাই প্রথম। এছাড়া বাংলাদেশ ডায়াবেটিক সমিতি ধর্মীয় অনুষ্ঠান প্রচারের পাশাপাশি ধর্মীয় বিশ্লেষকদের মাধ্যমে স্বাস্থ্য সুরক্ষায় আমাদের করণীয় বিশেষভাবে 'ডায়াবেটিস প্রতিরোধ' বিষয়ে একটি বিশেষ প্রকল্প গ্রহণ করেছে।

ডায়াবেটিস এখন আর কোনো ছোটোখাটো অসুস্থতা নয়। এ রোগের ব্যাপারে জনগণকে আরও সচেতন করার জন্য আমাদের সবাইকে এগিয়ে আসতে হবে। বিশ্ব ডায়াবেটিস দিবসে এ বিষয়ক কর্মশালা, মাঠ পর্যায়ে প্রশিক্ষণ, জনগণকে ডায়াবেটিস সম্পর্কে জানানো এবং সর্বোপরি সবার মধ্যে সচেতনতা সৃষ্টির লক্ষ্যে কাজ করছে সরকার। সরকারের পাশাপাশি আমাদেরও এক্ষেত্রে সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দিতে হবে। সবাই মিলে সচেতন হয়ে এগিয়ে এলে আমরা ডায়াবেটিস প্রতিরোধ ও নিয়ন্ত্রণ করতে সক্ষম হব এবং ফিরে পাব সুস্থ স্বাভাবিক জীবন, এ প্রত্যাশা আমাদের সকলের।

ডা. মোহাম্মদ হাসান জাফরী: চিকিৎসক zafri.mhasan@gmail.com

'স্মার্ট বাংলাদেশ পুরস্কার ২০২৩' পেল এনটিএমসি

ন্যাশনাল টেলিকমিউনিকেশন মনিটরিং সেন্টার (এনটিএমসি) পেল 'স্মার্ট বাংলাদেশ পুরস্কার ২০২৩'। ১৮ই অক্টোবর বঙ্গবন্ধু আন্তর্জাতিক সম্মেলন কেন্দ্রে এ পুরস্কার প্রদান অনুষ্ঠানে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার কাছ থেকে পুরস্কার গ্রহণ করেন এনটিএমসির মহাপরিচালক মেজর জেনারেল জিয়াউল আহসান।

ডিজিটাল বাংলাদেশ বিনির্মাণের লক্ষ্য পূর্ণ হওয়ার পর থেকেই শুরু হয় স্মার্ট বাংলাদেশের যাত্রা। জাতীয় নিরাপত্তার স্বার্থে এবং স্মার্ট বাংলাদেশ বিনির্মাণের লক্ষ্যে এনটিএমসি জাতীয় বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ তথ্যভাণ্ডার সংরক্ষণ এবং সব আইন প্রয়োগকারী, গোয়েন্দা ও তদন্ত সংস্থাকে সার্বক্ষণিক সহায়তা দিয়ে আসছে।

অন্যদিকে, এনটিএমসিতে সংরক্ষিত জাতীয় গুরুত্বপূর্ণ তথ্য, সাইবার সন্ত্রাসীদের দ্বারা চুরি হওয়ারও আশঙ্কা তৈরি হয়। এমতাবস্থায় অভ্যন্তরীণ ও বহির্গত নেটওয়ার্কগুলোকে নিরাপদ এবং তথ্যভাণ্ডারগুলোর নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে এনটিএমসি সম্পূর্ণ নিজস্ব উদ্যোগ এবং প্রযুক্তি ব্যবহার করে অত্যাধুনিক সিকিউরিটি অপারেশন সেন্টার (এসওসি) স্থাপন করেছে। নিজেদের সাইবার নিরাপত্তার পাশাপাশি দেশমাতৃকার সাইবার স্পেসের সুরক্ষা জোরদারকরণের লক্ষ্যে এনটিএমসি 'সবার আগে দেশ' এই মূলমন্ত্রে নিরলস কাজ করে যাচ্ছে। এরই স্বীকৃতিস্বরূপ কারিগরি ক্যাটাগরিতে শ্রেষ্ঠ সরকারি প্রতিষ্ঠান হিসেবে ১৮ই অক্টোবর এনটিএমসিকে 'স্মার্ট বাংলাদেশ পুরস্কার ২০২৩' প্রদান করা হয়েছে।

প্রতিবেদন: মেহেদি হাসান

কৃষি উন্নয়নে রোল মডেল বাংলাদেশ

মোতাহার হোসেন

মহান মুক্তিযুদ্ধের মধ্য দিয়ে স্বাধীনতা অর্জনের পরপরই মুক্তিযুদ্ধে পরাজিত শত্রু এবং কতিপয় বিদেশি অনুচর বাংলাদেশকে একটি ব্যর্থ ও অকার্যকর রাষ্ট্রে পরিণত করার অশুভ চক্রান্তে লিপ্ত হয়। ঐ সময়ের মার্কিন পররাষ্ট্রমন্ত্রী হেনরি কিসিঞ্জার বাংলাদেশকে তলা বিহীন ঝুড়ি'র তকমা দিয়েছিলেন। এখন তথাকথিত তলাবিহীন ঝুড়ি'র দেশ খাদ্যে উদ্বৃত্ত এবং সম্পদে উপচে পড়া দেশে পরিণত হয়েছে। কৃষি বিপ্লবের সঙ্গী ছিল কৃষি সম্প্রসারণ অধিদফতর, বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট, বাংলাদেশ পরমাণু কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট, কৃষি তথ্য সার্ভিস, বিএডিসিসহ মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন সংস্থাসমূহ। প্রযুক্তির এই যুগেও কৃষি দেশের অর্থনীতি এবং জনগণের জীবিকানির্বাহের অন্যতম প্রধান চালিকাশক্তি। পরিসংখ্যান অনুযায়ী জিডিপি'তে কৃষি খাতের অবদান ১১.২০% আর কৃষিতে নিয়োজিত জনশক্তি ৪৬.৯৬। দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে কৃষির গুরুত্ব বিবেচনায় বিজ্ঞানভিত্তিক চাষাবাদ কৌশল প্রবর্তনের মাধ্যমে টেকসই কৃষি বিপ্লবের সূচনা দেশের কৃষির উন্নয়নে কার্যকর সংযোগ স্থাপন, ন্যায্য মূল্যে কৃষি উপকরণ বিতরণ, কৃষি গবেষণায় বিনিয়োগ বৃদ্ধি, ফসলের নতুন নতুন জাত ও প্রযুক্তি উদ্ভাবন ও সম্প্রসারণের সুযোগ সৃষ্টি করা হয়। ফলে কৃষি ব্যবস্থার আমূল পরিবর্তন হয়। আধুনিক এবং যান্ত্রিক কৃষি ব্যবস্থার প্রবর্তন হয়। উচ্চফলনশীল ও জলবায়ু পরিবর্তন সহিষ্ণু নতুন নতুন জাত উদ্ভাবন ও প্রবর্তনের ফলে খাদ্যশস্য, সবজি ও ফল উৎপাদনে বৈচিত্র্য এসেছে এবং ফসল উৎপাদনে দেশ অভূতপূর্ব সাফল্য অর্জন করে। কোভিড-১৯ অভিঘাত ও চলমান বৈশ্বিক সংকট সত্ত্বেও কৃষি উৎপাদন কার্যক্রম অব্যাহত রেখে দেশের খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত করা হয়েছে। এর ফলে দেশের অর্থনীতির ভিত্তিকে সুদৃঢ় রাখতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছে।

খাদ্যশস্য উৎপাদনে স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জনের পর উৎপাদন বৃদ্ধির ধারা অব্যাহত রয়েছে। ২০০৮-২০০৯ সালে যেখানে খাদ্যশস্য উৎপাদন ছিল তিন কোটি ২৮ লক্ষ ৯৬ হাজার মেট্রিক টন, সেখানে ২০২২-২০২৩ অর্থবছরে তা বেড়ে চার কোটি ৭৭ লক্ষ ৬৮ হাজার মেট্রিক টন হয়েছে। ২০০৮-২০০৯ অর্থবছরে চাল ৩১৩.১৭ টন এবং ২০২২-২০২৩ বছরে ৪০১.৭৬ টন। একই সময় গম, ভুট্টা,আলু, ডাল, তেলবীজ, সবজির উৎপাদন বেড়েছে কয়েকগুণ বেশি।

বিগত ১৫ বছরে ভুট্টা উৎপাদন বৃদ্ধি পেয়ে হয়েছে প্রায় নয় গুণ, আলু দুই গুণ, ডাল চার গুণ, তেলবীজ ২.৫ গুণ ও সবজি আট গুণ। ফলশ্রুতিতে বাংলাদেশের কৃষির সাফল্য বিশ্বে সমাদৃত হয়েছে। দেশের ২২টি কৃষিপণ্য উৎপাদনে বিশ্বে শীর্ষ ১০ দেশের মধ্যে ধান উৎপাদনে তৃতীয়, সবজি ও পেঁয়াজ উৎপাদনে তৃতীয়, পাট উৎপাদনে দ্বিতীয় স্থানে রয়েছে। গবেষণার সুযোগ বৃদ্ধি এবং দেশে-বিদেশে বিজ্ঞানীদের উচ্চশিক্ষা ও প্রশিক্ষণের কারণে এ অর্জন সম্ভব হয়। এই ১৫ বছরে বৈরী পরিবেশ সহনশীল জাতসহ

মোট ৬৯৯টি উচ্চ ফলনশীল জাতের ফসল উদ্ভাবন ও ৭০৮টি প্রযুক্তি উদ্ভাবন করা হয়েছে। এসময় ধানের ৮০টি জাত উদ্ভাবন করা হয়। এর মধ্যে বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট কর্তৃক ৬১টি জাত উদ্ভাবন করা হয়। বিশেষ করে লবণাক্ত সহনীয় জাত নয়, জলমগ্নতা ও জলাবদ্ধতা এবং খরা সহনীয় তিনটি, জোয়ারভাটা সহনীয় দুইটি, প্রিমিয়ার কোয়ালিটি সাতটি, জিংক সমৃদ্ধ সাতটি জাত রয়েছে। বাংলাদেশ পরমাণু কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট (বিনা) বিগত ১৫ বছরে ১৯টি ধানের জাতসহ বিভিন্ন ফসলের মোট ৮৬ জাত উদ্ভাবন করেছে। বিনা উদ্ভাবিত ধানের জাত হচ্ছে– স্বল্প জীবনকালীন ধান, লবণ সহিষ্ণু বোরো ধানের দুইটি, জলমগ্নতা ও লবণাক্ততা সহিষ্ণু জাতের বিনা ধান। এছাড়া বিনা গম-দুটি, সরিষা, তিল, চিনাবাদাম ও সয়াবিন রয়েছে। মসুর, মুগ, ছোলা, মাষকলাই, খেসারি, টমেটো'র বেশ কিছু জাত উদ্ভাবন

করা হয়। এই ১৫ বছরে বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট ২০৯টি ফসলের উচ্চ ফলনশীল ও প্রতিকূল পরিবেশ সহিষ্ণু ও হাইব্রিডসহ ৩৪৭টি জাত এবং ৪০৩টি ফসল উৎপাদনের উন্নত প্রযুক্তি উদ্ভাবন করেছে।

প্রসঙ্গত দুর্যোগের ঝুঁকি হ্রাস ও জলবায়ু পরিবর্তনজনিত পরিস্থিতি মানিয়ে নিতে আধুনিক টেকসই কৃষি প্রযুক্তি উদ্ভাবন ও সম্প্রসারণের মাধ্যমে ক্রমাগত কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধি পাচ্ছে। উপকূলীয় অঞ্চলের লবণ সহিষ্ণু, বন্যাপ্রবণ এলাকায় বন্যাসহিষ্ণু এবং খরা প্রবণ এলাকার জন্য খরা সহিষ্ণু জাত উদ্ভাবন করা হয়। পাশাপাশি কৃষকের দোরগোড়ায় সার, বীজসহ অন্যান্য উপকরণ পৌঁছাতে নেওয়া হয় যুগান্তকারী পদক্ষেপ। একইসঙ্গে কয়েক দফায় সারের মূল্য কমিয়ে দেওয়া হয়। এছাড়াও ভর্তুকি মূল্যে প্রতি কেজি ইউরিয়া ২৭ টাকা দরে কৃষক পর্যায়ে সরবরাহ করা হয়েছে।

কৃষিবিপ্লবের অন্যতম উপকরণ হচ্ছে ভালো বীজ। এজন্য মানসম্পন্ন ধান, গম, ভুট্টা, আলু, পাট, সবজি, ডাল ও তৈলবীজ উৎপাদন করে কৃষকের হাতে তুলে দিতে ৩৪টি ভিত্তি বীজ বর্ধন খামার ৮৬টি কন্ট্রাক্ট গ্রোয়ার্স জোন ও ৯৮ হাজার ৬৯৩ জন চুক্তিবদ্ধ কৃষকের মাধ্যমে বিগত ১৫ বছরে ২০ লক্ষ ৬৬ হাজার মেট্রিক টন বিভিন্ন ফসলের বীজ উৎপাদন এবং বিতরণ করে বিএডিসি। ২০০৮-২০০৯ অর্থবছরে বীজ বিতরণের পরিমাণ ছিল ৯০ হাজার ৯২৮ মেট্রিক টন। আর বর্তমানে এক লক্ষ ৫২ হাজার মেট্রিক টন। করোনার কারণে বীজের দাম ২৫% হ্রাস করা হয়। পাশাপাশি কৃষির উৎপাদন খরচ নিম্নপর্যায়ে রাখতে সার, সেচ কাজে ব্যবহৃত বিদ্যুৎ ও ইক্ষু চাষে ভর্তুকি দেওয়া হয়। গত ১৫ বছরে সার, বিদ্যুৎ ও ইক্ষু উৎপাদনে এক লক্ষ ২৮,৯১৫ কোটি টাকা ভর্তুকি দেওয়া হয়। ২০০৮-২০০৯ তে এ খাতে ব্যয় ছিল ৫,১৭৮ কোটি টাকা, ২০২২-২০২৩ অর্থবছরে ব্যয় হয় প্রায় ২৬ হাজার কোটি টাকা। ২০০৮-২০০৯ থেকে ২০২১-২০২৩ পর্যন্ত সময়ে এডিপির আওতায় ২৪ হাজার ৬৫৭ কোটি টাকার উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়ন করা হয়। বিগত ১৫ বছরের প্রকল্প বাস্তবায়নে গড় অগ্রগতির হার ৯৭.১৫%। ২০২২-২০২৩ অর্থবছরে ৮৫টি প্রকল্প বাস্তবায়নে প্রায় সাড়ে তিন হাজার কোটি টাকা ব্যয় হয়েছে।

নির্বাচনি প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী, খামার যান্ত্রিকীকরণের মাধ্যমে কৃষিকে আধুনিকায়নের উদ্যোগ নেওয়া হয়। কৃষিযন্ত্রের ক্রয়মূল্যের ওপর হাওর ও উপকূলীয় এলাকায় ৭০%, অন্যান্য এলাকায় ৫০% আর্থিক সহায়তার মাধ্যমে কৃষি যন্ত্রপাতি সরবরাহ করা হচ্ছে। ২০১০ থেকে ২০২৩ পর্যন্ত কম্বাইন হারভেস্টর, রাইস ট্রান্সপ্লান্টার, রিপার, সিডার ও পাওয়ার থ্রেসারসহ প্রায় এক লক্ষ ৩৩ হাজার কৃষি যন্ত্রপাতি সরবরাহ করা হয়েছে। এর ফলে কৃষি শ্রমিকের অপ্রতুলতা মোকাবিলা এবং উৎপাদন ব্যয় হ্রাস হয়েছে।

কৃষিজমিতে বিএডিসি ও বিএডিএ-এর মাধ্যমে সেচের আওতায় আসে ১২.৫৯ লক্ষ হেক্টর। ১৪,৮৪৬ কিলোমিটার খাল পুনঃখনন এবং ৩০,৫৬২ কিলোমিটার সেচ নালা স্থাপন করা হয়। রাবার ড্যাম নির্মাণ করা হয় ১৫টি এবং সেচ অবকাঠামো ২,৮৩২টি। দেশে প্রথমবারের মতো চট্টগ্রামের আনোয়ারায় ভরাশঙ্খ খাল এবং কক্সবাজারের চকোরিয়ায় অত্যাধুনিক প্রযুক্তিনির্ভর দুইটি হাইড্রোলিক এলিভেটর ড্যাম নির্মাণ করা হয়েছে। উক্ত ড্যাম দুইটি নির্মাণের ফলে অতিরিক্ত ২,০৫০ হেক্টর জমি সেচের আওতায় এসেছে।

প্রচলিত ব্যাংকিং চ্যানেলে সুবিধাবঞ্চিত বর্গাচাষিদের দোরগোড়ায় সময়মতো, স্বল্পসুদে, জামানতবিহীন কৃষিঋণ সুবিধা পৌঁছে দিতে সরকার ২০০৯-২০১০ অর্থবছর থেকে বাংলাদেশ ব্যাংকের অর্থায়নে 'বর্গাচাষিদের জন্য কৃষিঋণ' কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়। প্রতিবছর এ কর্মসূচির আওতায় কৃষকদের ঋণ প্রদান করা হয়। ২০০৯-২০১০ অর্থবছরে ১৭.২৯ লক্ষ ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক চাষিরা বিভিন্ন ব্যাংকের মাধ্যমে চার হাজার ৭৬৫ কোটি টাকা ঋণ পেয়েছে। ২০২২-২০২৩ অর্থবছরে ২৭.৩৬ লক্ষ ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক চাষি বিভিন্ন ব্যাংক থেকে ২২ হাজার ৪০২ কোটি টাকা ঋণ পেয়েছেন। বন্যা, খরা, শিলা বৃষ্টি, অতি বৃষ্টি, ঘূর্ণিঝড়, উজানের ঢল, পাহাড়ি ঢলসহ বিভিন্ন প্রাকৃতিক দুর্যোগের ক্ষতি পুষিয়ে নিতে ফসল চাষে কৃষকদের উদ্বুদ্ধ করতে বিগত ১৪ বছরে ১ হাজার ৯৩৭ কোটি ৩৪ লক্ষ টাকা প্রণোদনা দেওয়া হয়েছে। এর ফলে দুই কোটি ২৩ লক্ষ ২১ হাজার জন কৃষক উপকৃত হয়েছে। ২০০৮-২০০৯ অর্থবছরে ৪৭ কোটি ৮১ লক্ষ টাকার প্রণোদনা ৬ লক্ষ ৪৩ হাজার কৃষককে প্রদান করা। ২০২২-২০২৩ অর্থবছরে বন্যার ক্ষয়ক্ষতি পুষিয়ে নিতে এবং ধান, গম, ভুট্টা, পেঁয়াজ, পাট, সরিষা, সূর্যমুখী, আনারসসহ বিভিন্ন ফসল চাষে কৃষকদের উদ্বুদ্ধ করতে ৫০০ কোটি টাকা প্রণোদনা প্রদান করা হয়।

সুবিধাবঞ্চিত বর্গাচাষিদের দোরগোড়ায় সময়মতো, স্বল্পসুদে, জামানতবিহীন কৃষিঋণ সুবিধা পৌঁছে দিতে সরকার ২০০৯-২০১০ অর্থবছর থেকে বাংলাদেশ ব্যাংকের অর্থায়নে 'বর্গাচাষিদের জন্য কৃষিঋণ' কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়। 'কৃষি ও পল্লী ঋণ নীতিমালা' –এর আওতায় কৃষকদের ঋণ প্রদান করা হয়। ২০০৯-২০১০ অর্থবছরে ১৭.২৯ লক্ষ ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক চাষিরা বিভিন্ন ব্যাংকের মাধ্যমে চার হাজার ৭৬৫ কোটি টাকা ঋণ পেয়েছেন। ২০২২-২০২৩ অর্থবছরে ২৭.৩৬ লক্ষ ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক চাষি বিভিন্ন ব্যাংক থেকে ২২ হাজার ৪০২ কোটি টাকা ঋণ পেয়েছেন। একইভাবে করোনাকালে ৪% রেয়াতি সুদে ৯১৭৫.৯৫ কোটি টাকা কৃষিঋণ দেওয়া হয় ৯ লক্ষ গ্রাহককে। তাছাড়া বন্যা, খরা, শিলা বৃষ্টি, অতি বৃষ্টি, ঘূর্ণিঝড়, উজানের ঢল, পাহাড়ি ঢল ইত্যাদি বিভিন্ন প্রাকৃতিক দুর্যোগের ক্ষয়ক্ষতি পুষিয়ে ফসল চাষে কৃষকদের উদ্বুদ্ধ করতে গত ১৪ বছরে এক হাজার ৯৩৭ কোটি ৩৪ লক্ষ টাকা প্রণোদনা দেওয়া হয়। এর ফলে দুই কোটি ২৩ লক্ষ ২১ হাজার জন কৃষক উপকৃত হয়েছে। ২০০৮-২০০৯ অর্থবছরে ৪৭ কোটি ৮১ লক্ষ টাকার প্রণোদনা ৬ লক্ষ ৪৩ হাজার কৃষককে প্রদান করা হয়। এতে উপকারভোগী কৃষকের সংখ্যা প্রায় এক কোটি।

জেনম সিকুয়েন্সিং আবিষ্কারের মাধ্যমে বিশ্বে সর্বপ্রথম তোষা পাটের জীবন রহস্য উন্মোচন করেন দেশের কৃষি বিজ্ঞানীরা। পরবর্তীতে পাটসহ পাঁচ শতাধিক উদ্ভিদের বিধ্বংসী রোগের জন্য দায়ী ছত্রাকের ও দেশি পাটের জীবন রহস্য উন্মোচন হয়। ২০১৮ সালে ধইঞ্চার জীবন রহস্যও উন্মোচন করা হয়েছে। উৎপাদিত কৃষিজাত পণ্যের প্রক্রিয়াজাতকরণ, বাজারজাত ও সংরক্ষণে বেসরকারি উদ্যোগকে উৎসাহিত করার কাজও চলছে। এর মধ্যে চার তলা বিশিষ্ট ১৪,০০০ বর্গফুট করে পাঁচ জেলায় পাঁচটি অফিস কাম ট্রেনিং অ্যান্ড প্রসেসিং সেন্টার স্থাপন করা হয়। গাবতলীতে একটি সেন্ট্রাল মার্কেট, ২১টি পাইকারি বাজার, ৭২টি কৃষকের বাজার, ২৩টি এসেম্বল সেন্টার ও গৃহ পর্যায়ে ৪০টি আলু সংরক্ষণাগার। এছাড়াও, শাকসবজি ফলমূল গৃহ পর্যায়ে দীর্ঘদিন সতেজ রাখার নিমিত্ত সিলেট বিভাগের চারটি জেলায় ৩০টি জিরো এনার্জি কুল চেম্বার নির্মাণ করা হয়েছে। এ লক্ষ্যে ৪৩৮.৪৭ কোটি টাকা ব্যয়ে 'অনাবাদি পতিত জমি ও বসতবাড়ির আঙ্গিনায় পারিবারিক পুষ্টি বাগান স্থাপন'– শীর্ষক একটি প্রকল্প গ্রহণ করা হয়। ২০২৩-এর জুন পর্যন্ত সময়ে বাগানের সংখ্যা ২,৫২,০৯৬টি।

বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট (বিএআরআই) কর্তৃক ২০০৯-২০২৩ সাল পর্যন্ত ২০৯টি ফসলের উচ্চ ফলনশীল ও প্রতিকূল পরিবেশ সহিষ্ণু ও হাইব্রিডসহ ৩৪৭টি জাত এবং ৪০৩টি ফসল উৎপাদনের উন্নত প্রযুক্তি উদ্ভাবন করা হয়েছে। দুর্যোগ, ঝুঁকি হ্রাস ও জলবায়ু পরিবর্তনজনিত অভিযোজন বা খাপ খাওয়ানোর নিমিত্ত আধুনিক লাগসই কৃষিপ্রযুক্তি উদ্ভাবন ও সম্প্রসারণের মাধ্যমে কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধি পাচ্ছে। উপকূলীয় অঞ্চলের লবণাক্ত এলাকায় ব্রি-৪৭, ব্রি-৫৩, ব্রি-৫৪, ব্রি-৬১, বিনা-৮ ও বিনা-১০ ধান সম্প্রসারণ, বন্যাপ্রবণ এলাকায় ব্রি-৫১, ব্রি-৫২ এবং খরা এলাকায় বিনা-৭ ও ব্রি-৩৩, ব্রি-৩৯, ব্রি-৫৬, ব্রি-৫৭ কৃষক পর্যায়ে জনপ্রিয়করণ ও সফলভাবে সম্প্রসারণ করা হচ্ছে। গমের তাপ সহিষ্ণু জাত বারি-২৬, বারি-২৭, বারি-২৮, বারি-৩০ এবং লবণাক্ততা সহিষ্ণু জাত বারি-২৫ সম্প্রসারণের ফলে গমের একর প্রতি উৎপাদন বৃদ্ধি পেয়েছে।

কৃষিতে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির ব্যবহার

কৃষি সেবাকে সহজে কৃষকের দোরগোড়ায় পৌঁছে দেওয়ার জন্য 'কৃষি বাতায়ন' তৈরি করা হয়েছে। দেশে মোট ৪৯৯টি কৃষি তথ্য ও যোগাযোগ কেন্দ্র (এআইসিসি) স্থাপন করা হয়। যে-কোনো ফোন থেকে কৃষি কল সেন্টারের ১৬১২৩ নম্বরে যোগাযোগ করে কৃষকগণ কৃষি তথ্য সেবা গ্রহণ করে। এছাড়া, কৃষি কমিউনিটি রেডিও, কৃষক বন্ধু ফোন-৩৩৩১, অনলাইন সার সুপারিশ, ই-সেচ সেবা, রাইস নলেজ ব্যাংক, কৃষি প্রযুক্তি ভাণ্ডার, ই-বালাইনাশক প্রেসক্রিপশন, কৃষকের জানালা, কৃষকের ডিজিটাল ঠিকানা ইত্যাদির মাধ্যমে কৃষকদের দোরগোড়ায় কৃষি তথ্যসেবা পৌঁছে দেওয়া হচ্ছে। এছাড়া, ফসল উৎপাদনের এলাকা উপযোগী জায়গা নির্বাচনপূর্বক শস্য আবাদের লক্ষ্যে বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা কাউন্সিল কর্তৃক অনলাইন ও জিআইএস ভিত্তিক 'Crop Zoning Website' এবং 'খামারি' মোবাইল অ্যাপ চালু করা হয়েছে। এ পর্যন্ত ৩৫৫টি উপজেলায় মোট ৭৬টি ফসলের ক্রপ জোনিং কার্যক্রম সম্পন্ন হয়েছে।

চতুর্থ শিল্পবিপ্লব সংক্রান্ত কার্যক্রম

চতুর্থ শিল্পবিপ্লবকে অন্তর্ভুক্ত করে ডিপ্লোমা কৃষি শিক্ষার প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় পর্বের সিলেবাস প্রণয়ন করা হয়েছে। সে সাথে, চতুর্থ শিল্পবিপ্লবের সাথে সামঞ্জস্য রেখে কৃষি খাত উন্নয়নে সমন্বিত কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন করা হয়েছে।

বিগত ১৫ বছরে ভুট্টা উৎপাদন বৃদ্ধি পেয়ে হয়েছে প্রায় নয় গুণ, আলু দুই গুণ, ডাল চার গুণ, তেলবীজ আড়াই গুণ ও সবজি আট গুণ। ফলশ্রুতিতে বাংলাদেশের কৃষির সাফল্য বিশ্বে সমাদৃত হয়েছে। বাংলাদেশের ২২টি কৃষিপণ্য উৎপাদনে বিশ্বে শীর্ষ ১০ দেশের মধ্যে রয়েছে: যেমন, ধান উৎপাদনে তৃতীয়, সবজি ও পেঁয়াজ উৎপাদনে তৃতীয়, পাট উৎপাদনে দ্বিতীয়, চা উৎপাদনে চতুর্থ এবং আলু ও আম উৎপাদনে সপ্তম ।

কৃষিতে বিস্ময়কর সাফল্যে এদেশের কৃষি বিজ্ঞানী ও গবেষকদের গবেষণায় স্বীকৃতি দেয় কানাডার সাস্কাচুয়ান বিশ্ববিদ্যালয়। এই বিশ্ববিদ্যালয়ে 'গ্লোবাল ইনস্টিটিউট ফর ফুড সিকিউরিটি'– তে বঙ্গবন্ধু চেয়ার স্থাপন করেছে কানাডা সরকার । এ চেয়ার স্থাপনের মাধ্যমে দেশের কৃষি গবেষকদের কানাডায় উন্নত প্রযুক্তির বিষয়ে জ্ঞান অর্জনের নতুন দুয়ার উন্মোচিত হয়েছে। একই সঙ্গে কানাডার 'গ্লোবাল ইনস্টিটিউট ফর ফুড সিকিউরিটির' সহযোগিতায় বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট, গাজীপুর-এ 'বঙ্গবন্ধু-পিয়েরে ট্রুডো কৃষি প্রযুক্তি কেন্দ্র' স্থাপন স্থাপন করা হয়।

গত ১৫ বছরে দেশের কৃষিতে অভূতপূর্ব বিপ্লব সাধিত হয়েছে। আবার করোনার অভিঘাত মোকাবিলায়ও কৃষি খাত অগ্রণী ভূমিকা রেখেছে। বর্তমান বৈশ্বিক সংকট মোকাবিলায় কৃষি উৎপাদন অব্যাহত রাখা জরুরি। কৃষিতে বিস্ময়কর সাফল্যেও ধারবাহিকতা রক্ষায় প্রয়োজন কৃষি পণ্যের ন্যায্য মূল্য নিশ্চিত করা সার, বীজ, কৃষিযন্ত্রপাতি সহজলভ্য করা।

মোতাহার হোসেন: কলাম লেখক এবং সাধারণ সম্পাদক-বাংলাদেশ ক্লাইমেট চেঞ্জ জার্নালিস্ট ফোরাম

বঙ্গবন্ধুকে 'ডক্টর অব লজ' ডিগ্রি দিলো ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে মরণোত্তর 'ডক্টর অব লজ' ডিগ্রি দিয়েছে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় (ঢাবি)। ২৯শে অক্টোবর ২০২৩ বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রীয় খেলার মাঠে আয়োজিত বিশেষ সমাবর্তন অনুষ্ঠানে উপাচার্য ড. মো. আখতারুজ্জামান এই ডিগ্রি দেন। বঙ্গবন্ধুর পক্ষে ডিগ্রি গ্রহণ করেন তাঁর জ্যেষ্ঠ কন্যা প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা।

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বলেন, যে বিশ্ববিদ্যালয়ে তিনি আইন বিভাগের শিক্ষার্থী ছিলেন, আজ তাঁকে ডক্টর অব লজ ডিগ্রি প্রদান করে যে সম্মাননা জানানো হয়েছে, এজন্য কৃতজ্ঞ। আজ মুজিবকন্যা হিসেবে আমার জন্য দিনটি সম্মানের।

সমাবর্তনের প্রধান বক্তা বঙ্গবন্ধুকন্যা, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবেক শিক্ষার্থী, প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বঙ্গবন্ধুর পক্ষে এই ডক্টর অব লজ ডিগ্রি গ্রহণ করেন। পরে প্রধান বক্তার বক্তব্যে বঙ্গবন্ধুর আজীবন সংগ্রামের ইতিহাস তুলে ধরেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা।

প্রতিবেদন: মুবিন হক

শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা

অসিত কুমার মন্ডল

Education is the greatest ornament of human life– অর্থাৎ শিক্ষা হচ্ছে মানবজীবনের শ্রেষ্ঠ অলংকার। শিক্ষা ছাড়া কোনো জাতি পৃথিবীতে কখনও মাথা উঁচু করে দাঁড়াতে পারে না। সমাজ-সংসারে তার কোনো মূল্য নেই। শিক্ষা মানুষকে অজ্ঞানতার অন্ধকার থেকে মুক্তি দেয়। জীবনকে জানতে হলে, বুঝতে হলে শিক্ষা গ্রহণ অপরিহার্য। কারণ শিক্ষা মানুষের মনের আঁধার দূর করে জ্ঞানের আলোয় উদ্ভাসিত করে। এ জগতের যত অজানা-অচেনা ক্ষেত্র রয়েছে– তা জানার ও বোঝার একমাত্র উপায় শিক্ষা।

বর্ণপরিচয় জ্ঞানহীন কোনো মানুষ যদি বইপত্র, পুথি-পুস্তক, পত্রপত্রিকা পড়তে না পারে, তাহলে তার বাস্তব জীবনের অনেক কিছুই অজানা-অচেনার বাইরে থেকে যায়। কোনো কিছু পড়তে না পারার কারণে সে না বোঝে ধর্ম, না বোঝে রাজনীতি, না বোঝে সংস্কৃতি। মানুষের দৈনন্দিন জীবন প্রণালির সঠিক বিষয়গুলো জানতে হলে শিক্ষার একান্ত প্রয়োজন। জীবনকে জানতে হলে, বুঝতে হলে শিক্ষা ব্যতীত বিকল্প কোনো পথ নেই।

একজন মানুষের জীবনের উত্তম রাস্তা হলো শিক্ষা। তেমনি উত্তম বন্ধু হলো একখানা বই। বই পড়ে যদি মানুষ তার কাঙ্ক্ষিত বিষয়টিকে জানতে ও বুঝতে পারে, তাহলে তার মনের অজ্ঞতা দূর হয়। তার ভেতরে নিজেকে জানার এবং বোঝার বাসনা জাগ্রত হয়। তখন মানুষের আর বন্ধুর প্রয়োজন হয় না ।

শিক্ষা গ্রহণ করা মানুষের নৈতিক অধিকার। শিক্ষার আলো মানুষের জীবনকে আলোকিত করে। শিক্ষা মানুষকে আদর্শের পথে পরিচালিত করে। শিক্ষা সত্য ও সুন্দরের পথ দেখায়। ন্যায় ও নীতির পথে চলতে শেখায়। শিক্ষার শক্তিতে মানুষ মুক্তিমান হয়ে ওঠে।

আমরা শিক্ষা বলতে শুধু স্কুল-কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষাকে বুঝি। সার্টিফিকেট অর্জনের শিক্ষাকে বুঝি। কিন্তু স্কুল-কলেজে না গিয়েও স্বশিক্ষার দ্বারা অনেকেই জ্ঞান অর্জন করতে পারেন। শুধু প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষার মাধ্যমে। বড়ো বড়ো ডিগ্রি অর্জন করলেই জ্ঞান অর্জন হয় না। শিক্ষা অর্জন হয় না। শিক্ষা মানুষের চেতনা বা অনুধাবনের বিষয়। যার ভেতরে চেতনা আছে, উপলব্ধি আছে। তিনি অবশ্যই শিক্ষা অর্জন করবেন, শিক্ষিত হবেন।

আত্মবোধ, আত্মচেতনা থাকলে সে মানুষের শিক্ষার দরজা আপনা-আপনি উন্মুক্ত হয়ে যায়। সুতরাং শিক্ষা অর্জন করতে চাইলে আগে শিক্ষা গ্রহণে আগ্রহ থাকতে হবে। তাহলে শিক্ষা অর্জন সম্ভব।

শিক্ষার অধিকার প্রতিটি মানুষের রয়েছে। সে শিক্ষা স্ব-আগ্রহে অর্জন করার ইচ্ছা থাকতে হবে। একজনের শিক্ষা আরেকজন অর্জন করতে পারে না। যে বা যিনি শিক্ষা অর্জন করবেন, স্বউদ্যোগে তাকে শিক্ষার প্রতি উদ্বুদ্ধ হয়ে শিক্ষা অর্জনের জন্য প্রচেষ্টা চালাতে হবে। কারণ শিক্ষা অর্জন মানুষের মেধা-মননের ওপর নির্ভর করে। যার মেধা শক্তি যত প্রখর সে তত তাড়াতাড়ি যে-কোনো শিক্ষাকে অর্জন করতে পারে। তবে প্রত্যেকের মেধা শক্তি আছে। সেটি কারও কম, আবার কারও বেশি। যার মেধা শক্তি কম, তাকে একটু বেশি পরিশ্রম করে পড়াশোনা করলে অবশ্যই সে সফল হতে পারে।

শিক্ষা অর্জনের জন্য অধিকাংশ শিক্ষার্থী নামকরা বা ভালো শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান খোঁজে। কিন্তু শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের সাথে শিক্ষার কোনো সম্পর্ক নেই। যে বা যিনি শিক্ষা অর্জন করবেন তার যদি সত্যিকার মেধা-মনন থাকে তাহলে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান দিয়ে কিছু আসে যায় না। যে-কোনো শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে পড়েই দক্ষতার স্বাক্ষর বা উজ্জ্বলতার স্বাক্ষর রাখা যায়। কারণ শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান একজন শিক্ষার্থীর উপলক্ষ মাত্র। ভালো রেজাল্ট বা মেধার স্বাক্ষর রাখার জন্যে একজন শিক্ষার্থীর ভূমিকাই প্রধান, প্রতিষ্ঠান নয়।

শিক্ষার উদ্দেশ্য শুধু চাকরি করতে হবে তা নয়। শিক্ষা থাকলে যে-কোনো পেশায় সঠিকভাবে জীবনের উন্নতি করা যায়। যার শিক্ষা থাকে, তিনি সহজে বোঝেন এ কাজটি কীভাবে করতে হবে। কোনভাবে করলে সফলতা আসবে। কিন্তু যার শিক্ষা নেই তার পক্ষে কোনো বিষয় সহজে বোঝা এবং সমস্যার সমাধান করা কখনো সম্ভব নয়।

শিক্ষার শেষ নেই। বর্তমান আধুনিক সভ্যতার যুগে সর্বক্ষেত্রে শিক্ষার প্রসার ঘটেছে এবং উন্নত শিক্ষা আর প্রযুক্তির কারণে বিশ্ব আজ উন্নতির চরম শিখরে আরোহণ করছে। প্রাচীনকাল, মধ্য যুগ, আধুনিক সভ্যতার যুগ অতিক্রম করে দুনিয়া আজ কম্পিউটার-ইন্টারনেটের যুগে পৌঁছে গেছে। যাকে বলা হচ্ছে– ডিজিটাল যুগ।

বর্তমান যুগ শিক্ষার চরম উন্নতির যুগ। এই যুগে অধুনা বিশ্ব শিক্ষার শক্তিতে এখন অনেক উর্ধ্বে পৌঁছেছে। শিক্ষার বলে মানুষ সভ্যতার এক স্বর্ণ দুয়ার উন্মোচন করতে সক্ষম হয়েছে। যে কারণে পৃথিবী আজ ডিজিটাল পদ্ধতিতে পরিচালিত হচ্ছে। আমরা ডিজিটাল সভ্যতায় এসে উপনীত হয়েছি। এই ডিজিটাল সভ্যতার মূলে রয়েছে মানুষের শিক্ষার সুদূরপ্রসারী মনোভাব। কারণ শিক্ষা সচেতন মানুষ ছাড়া শিক্ষাবিহীন কোনো মানুষ সভ্যতার চরম শীর্ষে অবস্থান করতে পারে না।

সুতরাং এই যুগে এখনও যারা শিক্ষার প্রতি অনগ্রসর, শিক্ষা গ্রহণ করতে অনিচ্ছুক এবং এই যুগে এখনও যারা নিরক্ষতার অভিশাপ নিয়ে দিনাতিপাত করছে– তারা মানুষ হিসেবে বর্তমান পৃথিবীতে বড়োই বেমানান। যারা এই সভ্য যুগে এসেও অশিক্ষার কলঙ্ক বয়ে বেড়াচ্ছে, তাদের সকলের শিক্ষার প্রতি আগ্রহী হতে হবে। নিরক্ষরতার এ কলঙ্ককে মোচন করতে হবে। নিজের সন্তান, পরিবার, পরিজন তথা পারিপার্শ্বিক সবাইকে শিক্ষার প্রতি উদ্বুদ্ধ করতে হবে। সকলকে স্ব-ইচ্ছায় শিক্ষা গ্রহণের জন্য উদ্যোগী হতে হবে। বর্তমান ও ভবিষ্যৎ প্রজন্মকে সুশিক্ষায় শিক্ষিত করে গড়ে তুলতে হবে।

যতদিন পর্যন্ত না মানুষ শিক্ষার প্রতি উদ্বুদ্ধ হবে, শিক্ষাকে নিজের জ্ঞানের আলো হিসেবে গ্রহণ না করবে, ততদিন পর্যন্ত তারা অজ্ঞানতার অন্ধকারে, পৃথিবীর অজানার বাইরে রয়ে যাবে। কারণ আলো জ্বালালে সেখানে অনেক কীটপতঙ্গ, পোকামাকড় এসে উপস্থিত হয়, তেমনি জ্ঞানের আলো জ্বালালে সেই আলোর কাছে যদি মানুষ না আসে, তাহলে সে সকল মানুষের কোনোদিনই অজ্ঞানতার অন্ধকার থেকে মুক্তি লাভ করা সম্ভব নয়।

অসিত কুমার মন্ডল: কবি, প্রাবন্ধিক, গল্পকার, শিক্ষা, সংস্কৃতি ও সংগীত গবেষক, ashitkumondal19@gmail.com

রামগড় স্থলবন্দর: সম্ভাবনার নতুন দুয়ার

মো. বেলায়েত হোসেন

ব্রিটিশ শাসনামলে ১৯০৫ সালের থানা এবং ১৯২০ সালে মহকুমায় উন্নীত ফেনী নদী বিধৌত জনপদ রামগড়। ইতিহাসের পাতায় মহান মুক্তিযুদ্ধের দিনলিপিতে রামগড় উজ্জ্বল ও সমুন্নত। ১৯৭১ সালে মুক্তিযুদ্ধের সময় রামগড় ছিল ১নং সেক্টরে। কালের বিবর্তনে প্রায় সব মহকুমা শহর জেলায় রূপান্তরিত হলেও এ প্রাচীন জনপদ বিভিন্ন প্রেক্ষাপটে স্বীয় মর্যাদা হারিয়ে ১৯৮৪ সালে উপজেলায় রূপান্তরিত হয়; জেলা ঘোষণা করা হয় খাগড়াছড়িকে। ভারতের সাব্রুম থেকে রামগড়কে আলাদা করেছে ফেনী নদী। একটি সীমান্ত দ্বারা দু'পাড়ের একই সংস্কৃতি, ভাষা, মানবতা; একই জনপদ; একই লোকালয়ের মানুষ আক্রান্ত ও বিভক্ত। সীমান্ত মানুষের দেহ আলাদা করতে পারলেও মনকে আলাদা করতে পেরেছে কবে? ১৯৪৭ সালে দেশ ভাগের পরে এপার-ওপার দু'পাড়ের মানুষের সংযোগের নিমিত্তে রামগড়ে পাবলিক ইমিগ্রেশন কার্যক্রম চালু হয়েছিল। পরবর্তীতে ১৯৬৫ সালের পাকিস্তান-ভারত যুদ্ধের প্রেক্ষাপটে বাংলাদেশ-ভারতের এ যোগাযোগ ব্যবস্থাটি বন্ধ হয়ে যায়।

বাংলাদেশের পররাষ্ট্রনীতি 'সবার সাথে বন্ধুত্ব, কারো সাথে বৈরিতা নয়'–এর আলোকে টেকসই অর্থনীতি গড়তে প্রতিবেশী রাষ্ট্রের সাথে যোগাযোগ দৃঢ় করার বিকল্প কোনো পথ নেই। সীমান্ত রেখায় ছেদ পড়লেও দু'পাড়ের মানুষের সামাজিক, সাংস্কৃতিক এবং আত্মিক সম্প্রীতি ও বন্ধন সবসময় ছিল অপরাজেয়। দু'পাড়ের মানুষের শুকনো আঁখিতে আনন্দ অশ্রু ঝরাতে ২০১০ সালে পুনরায় স্থলবন্দর এবং ট্রানজিট কার্যক্রম চালুর উদ্যোগ নেয় সরকার। ভারতের উত্তর প্রদেশ এবং মধ্য প্রদেশ থেকে সেভেন সিস্টার্স (আসাম, ত্রিপুরা, মেঘালয়, মিজোরাম, মনিপুর, নাগাল্যান্ড, অরুনাচল)-এর দূরত্ব প্রায় ২৫০০-৩০০০ কিলোমিটার। দূরত্বের কারণে সেভেন সিস্টার্সে আমদানি-রপ্তানি ব্যাহত হচ্ছে এবং ভারতের মূল ভূখণ্ডের সাথে সহজ ও সাশ্রয়ী কানেক্টিভিটি বাংলাদেশের রয়েছে। ভারতের পক্ষ থেকে ট্রানজিট প্রস্তাব দেওয়া হলে বাংলাদেশ তা গ্রহণ করে, কারণ বাংলাদেশ ভারতের সেভেন সিস্টার্স রুট ব্যবহার করে নেপাল-ভুটানে আমদানি-রপ্তানির সুবিধা পাবে। ফলে পশ্চিমা বিশ্বের উপর একচেটিয়া বাণিজ্য নির্ভরতা হ্রাস পাবে এবং বিমসটেক ও আসিয়ান ট্রেডের সাথে নিবিড় যোগাযোগ স্থাপিত হবে। তারই প্রেক্ষাপটে ২০১৮ সালে ভারত 'এগ্রিমেন্ট অন দ্য ইউজ অব চট্টগ্রাম অ্যান্ড মংলা পোর্ট' ব্যবহারের অনুমতি পায়। এতে ভারতের মূল ভূখণ্ড থেকে পণ্য সামগ্রী নৌপথে চট্টগ্রাম বন্দর ব্যবহার করে চট্টগ্রাম থেকে ১০৯ কিলোমিটার পথ পাড়ি দিয়ে রামগড় স্থলবন্দর ও ট্রানজিট দিয়ে স্বল্প সময়ে, স্বল্প ব্যয়ে সেভেন সিস্টার্সে সহজে প্রবেশ করতে পারবে।

বাংলাদেশে বিদ্যমান অন্যান্য স্থলবন্দরের চেয়ে রামগড় স্থলবন্দর ব্যতিক্রমী। এটিই দেশের একমাত্র এবং প্রথম ট্রানজিট বন্দর। রামগড় স্থলবন্দর এবং ট্রানজিট চালু করতে প্রথম পদক্ষেপ হচ্ছে ফেনী নদী দ্বারা বিভক্ত রামগড় ও সাব্রুমের উপর মৈত্রী সেতু নির্মাণ। যা দু'পাড়ের মানুষের সেতুবন্ধনের একমাত্র মাধ্যম। ভারত সরকারের নিজস্ব অর্থায়নে ১৩৩ কোটি টাকা ব্যয়ে নির্মিত বাংলাদেশ-ভারত মৈত্রী সেতু-১-এর দৈর্ঘ্য ১.৯ কিমি.। দু'দেশের প্রধানমন্ত্রী ২০২১ সালের ৯ই মার্চ ভার্চুয়ালি সেতুটি উদ্বোধন করেন। বাংলাদেশ রিজিওনাল কানেক্টিভিটি প্রজেক্ট-১-এর আওতায় এসব কার্যক্রম শুরু হয়। প্রকল্পটির মোট অনুমোদিত ব্যয় ৭৩২ কোটি টাকা; তার মধ্যে বাংলাদেশ সরকারের অর্থায়ন ১৩৯ কোটি টাকা (প্রকল্প ব্যয়ের ১৯%), বাকি ৫৯৩ কোটি টাকা (প্রকল্প ব্যয়ের ৮১%) বিশ্বব্যাংকের। সরকারের অর্থায়নে ৭৪ কোটি টাকা ব্যয়ে ১০ একর জমি অধিগ্রহণ করা হয়েছে (তথ্যসূত্র: রামগড় স্থলবন্দর কর্তৃপক্ষ)। চট্টগ্রাম সমুদ্রবন্দর থেকে রামগড় স্থলবন্দরের দূরত্ব মাত্র ১০৯ কিমি.; এর মধ্যে বন্দর থেকে বারৈয়ারহাট পর্যন্ত রাস্তা চার লেনে উন্নীত। বারৈয়ারহাট-হেঁয়াকো-রামগড়-এর বাকি ৩৮ কিমি. রাস্তা প্রশস্তকরণ ও আধুনিকরণ কার্যক্রম সম্পন্ন করতে ২০১৭ সালের ৫ই এপ্রিল

ভারতের এলওসি-৩ ও বাংলাদেশ সরকারের উন্নয়ন তহবিলের অর্থায়নে ১ হাজার ১০৭ কোটি ১২ লাখ টাকার প্রাক্কলন ব্যয়ে ভারতের দিল্লিতে সমঝোতা স্মারক হয়। এর মধ্যে ভারতের অর্থায়ন ৫১৩ কোটি ৭ লাখ টাকা এবং ভারতের ঋণ ৫৯৪ কোটি ৫ লাখ টাকা। এটি ২০২৩ সালের ২৪শে মে সড়ক পরিবহণ ও সেতুমন্ত্রী ভার্চুয়ালি উদ্বোধন করেন এবং যার কাজ শেষ হবে ৩১শে ডিসেম্বর ২০২৪ সালে। এটি ১৮ ফুট থেকে ৩৮ ফুটে প্রশস্ত করা হবে। এ রাস্তায় মোট ২৪৯.২০ মিটার দৈর্ঘ্যের ৯টি ব্রিজের কাজ সম্পন্ন, বাকি ২৩ সেতুও নির্মাণ করা হবে।

রামগড় সীমান্তবর্তী এলাকা; তাই স্থলবন্দর হওয়ায় চোরাচালানের পরিবর্তে বৈধপথে পণ্য আমদানি-রপ্তানিতে সরকারের রাজস্ব আয় বাড়বে। বাংলাদেশর ভূমি ব্যবহার করে চট্টগ্রাম থেকে রামগড় স্থলবন্দর হয়ে পণ্য ট্রানজিটে সরকারকে যে নির্দিষ্ট হারে ট্যাক্স দেওয়ার কথা, প্রতিবছর যা ৫ শতাংশ হারে বৃদ্ধি পাবে। কক্সবাজার, চট্টগ্রামে প্রচুর সামুদ্রিক শুঁটকি উৎপাদিত হয়। বাংলাদেশের জামদানি শাড়ি ইউনেস্কো কর্তৃক ঘোষিত বিখ্যাত 'অধরা সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য'। ২০১৭ সালে ইলিশ মাছ বাংলাদেশের ভৌগোলিক নির্দেশক বা জিআই পণ্য হিসেবে স্বীকৃতি পেয়েছে। নোয়াখালী-চট্টগ্রাম অঞ্চলে প্রচুর পান-সুপারি উৎপন্ন হয়। সেভেন সিস্টার্সে এ শুঁটকি, জামদানি শাড়ি, ইলিশ মাছ, পান-সুপারির প্রচুর চাহিদা রয়েছে এবং ভারতীয় ব্যবসায়ীরা আমদানির আগ্রহ প্রকাশ করেছে। এছাড়া ভারতের সেভেন সিস্টার্সে উৎপাদিত বিভিন্ন ফল (আপেল, কমলা, মাল্টা, আঙুর ইত্যাদি) এবং মসলা (এলাচ, দারুচিনি, লং, তেজপাতা ইত্যাদি) রপ্তানির আশাবাদ ব্যক্ত করে (সূত্র: রামগড় স্থলবন্দর কর্তৃপক্ষ)। এতে আমাদের শুঁটকি, জামদানি শিল্প এবং পান-সুপারি উৎপাদন বৃদ্ধি পাবে। শ্রম বাজার বিস্তৃত হবে, বেকার সমস্যা হ্রাস পাবে এবং সরকারের রাজস্ব বৃদ্ধি পাবে। প্রতিবেশী রাষ্ট্র ভারত থেকে ফল এবং মসলা আমদানিতে অস্ট্রেলিয়া, ইরান কিংবা দূরবর্তী অন্যান্য রাষ্ট্র থেকে আমদানি চাপ কমলে পণ্যের দাম হ্রাস পাবে। যা অর্থনীতিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে। স্থলবন্দরে মালামাল সংরক্ষণ, লোডিং-আনলোডিং-এ এবং পরিবহণ ব্যবস্থায় এ অঞ্চলে অনেক লোকের কর্মসংস্থান সৃষ্টি হবে। বিশ্বের সবচেয়ে বড়ো সমুদ্রসৈকত কক্সবাজার এবং পার্বত্য চট্টগ্রাম সৌন্দর্যের আধার হওয়ায় ভারতীয় পর্যটকরা রামগড় স্থলবন্দর হয়ে খুব সহজে আসতে পারবে। এতে বাংলাদেশের পর্যটন খাত বিকশিত হওয়া এবং বিপুল ঘটার সমূহ সম্ভাবনা রয়েছে। এ পরিপ্রেক্ষিতে রামগড় স্থলবন্দর রামগড় মহকুমা শহরের ঐতিহ্য কিছুটা হলেও ফেরাবে বলে স্থানীয়রা আশাবাদ ব্যক্ত করেন। রামগড় স্থলবন্দরের পাবলিক ইমিগ্রেশন প্রধানমন্ত্রীর হাতে উদ্বোধনের অপেক্ষায় প্রস্তুত রয়েছে।

মো. বেলায়েত হোসেন: সহকারী তথ্য অফিসার, তথ্য অফিস রামগড়, খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলা, পিআইডি ফিচার, belayethussain42@gmail.com

কালাজ্বর নির্মূলে বিশ্বের প্রথম দেশ হিসেবে স্বীকৃতি পেল বাংলাদেশ

কালাজ্বর নির্মূলে বিশ্বের প্রথম দেশ হিসেবে স্বীকৃতি পেয়েছে বাংলাদেশ। ৩১শে অক্টোবর ২০২৩ ভারতের দিল্লিতে আয়োজিত ডব্লিউএইচওর ৭৬তম দক্ষিণ এশিয়ার আঞ্চলিক সম্মেলনে বাংলাদেশকে এ স্বীকৃতি দেওয়া হয়। স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণমন্ত্রী জাহিদ মালেকের হাতে সনদপত্র তুলে দেন বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার আঞ্চলিক পরিচালক পুনম খেত্রপাল। এসময় বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার মহাপরিচালক তেদরোস আধানোম গেব্রেয়াসুস উপস্থিত ছিলেন।

স্বাস্থ্যমন্ত্রী বলেন, এর আগে বাংলাদেশ ফাইলেরিয়া ও পোলিও নির্মূল করে সনদ পেয়েছিল। এবার বিশ্বের প্রথম দেশ হিসেবে কালাজ্বর নির্মূলে বিশ্বে প্রথম হওয়ায় এটি একটি জাতিগত প্রশংসিত অর্জন হয়েছে। এ অর্জনে দেশের স্বাস্থ্য খাতসহ আমরা সকলেই গর্বিত। স্বাস্থ্যমন্ত্রী এই অর্জনে বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার বিশেষ পরামর্শ ও নির্দেশনার কথা জানান।

মন্ত্রী আরও বলেন, দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলের মানুষের স্বাস্থ্যসেবায় কমিউনিটি ক্লিনিক এখন ভরসার জায়গা হতে পেরেছে। প্রত্যন্ত গ্রাম অঞ্চলের মানুষের জন্য প্রধানমন্ত্রীর বিশেষ অবদান দেশের ১৪,০০০ কমিউনিটি ক্লিনিকের প্রতিটি থেকে ঐ এলাকার প্রায় ৬,০০০ মানুষ স্বাস্থ্যসেবা নিচ্ছে। ধীরে ধীরে দেশের দুর্গম এলাকাতেও প্রস্তুত করা হচ্ছে কমিউনিটি ক্লিনিক। ক্লিনিকগুলো থেকে ৩০ রকমের ওষুধ দেওয়া হচ্ছে। এর পাশাপাশি গ্রামের মায়েদের নিরাপদ সন্তান প্রসবের ক্ষেত্রেও কমিউনিটি ক্লিনিক কাজে লাগছে। এর সুফল হিসেবে গত কয়েক বছরের জরিপে বাংলাদেশে মাতৃমৃত্যু হার প্রতি লাখে ৩২০ জন থেকে হ্রাস পেয়ে এখন ১৬৩ জন হয়েছে। একইভাবে প্রতি হাজার জীবিত শিশুর মৃত্যুহার ৬৫ জন থেকে হ্রাস পেয়ে ২৮ জনে নেমে এসেছে।

উল্লেখ্য, সম্মেলনে বাংলাদেশ, ভারত, ইন্দোনেশিয়া, মালদ্বীপ, নেপাল, ভুটান, থাইল্যান্ড, শ্রীলঙ্কা, পূর্ব তিমুর, উত্তর কোরিয়াসহ ১১টি দেশের স্বাস্থ্যমন্ত্রী ও উচ্চ পদস্থ কর্মকর্তারা উপস্থিত ছিলেন।

প্রতিবেদন: অমিত কুমার

পিঠা-পুলির উৎসব

সুস্মিতা চৌধুরী

বাঙালির লোক ইতিহাস-ঐতিহ্যে পিঠা-পুলি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে আসছে বহুকাল ধরে। এটি লোকজ ও নান্দনিক সংস্কৃতিরই বহিঃপ্রকাশ।

বাংলাদেশ ছয় ঋতুর দেশ। একেক ঋতু একেক রূপ ও সৌন্দর্য নিয়ে আমাদের মাঝে ধরা দেয়। ঋতু ভেদে খাবারেও আসে পরিবর্তন। এর মধ্যে পিঠা-পুলি আমাদের দৈনন্দিন খাদ্য তালিকায় বিশেষ স্থান দখল করে আছে। বিশেষ করে বিভিন্ন পালা-পার্বণের একান্ত অনুষঙ্গ হয়ে যুগ যুগ ধরে টিকে আছে লোভনীয় এই পিঠা-পুলি। শুধু তাই নয়, গৃহস্থালির গণ্ডি পেরিয়ে বাণিজ্যিক ঘরানায় প্রবেশ করে অনেক মানুষের কর্মসংস্থানেরও সুযোগ সৃষ্টি করেছে।

বৈশাখি মেলা, গায়ে হলুদসহ বিভিন্ন সামাজিক অনুষ্ঠানে আজকাল পিঠা প্রসঙ্গটি চলে আসে। তবে হেমন্ত ও শীতকালে যেন উৎসবে পরিণত হয়। গ্রামে গ্রামে চলে পিঠা-পুলির ধুম, শহরের আটপৌরে জীবনেও এসে যার ছোঁয়া লাগে। ইদানীং পিঠা বিক্রেতাদের কল্যাণে শহরের বিভিন্ন মোড়, অলিগলিতেও পিঠা কিনতে পাওয়া যায়।

নভেম্বর মাস, শীত আসি আসি করছে। ইতোমধ্যেই রসনা-বিলাসীদের মাঝে সাড়া ফেলে দিয়েছে পিঠার বার্তা। ভাপা, চিতই, দুধ চিতই, পাটিসাপটা নানা ধরনের পুলি, তেল বা পাকন, নকশি গোকুল, জামাই, বিবিখানা পিঠা, খেজুর, মাছ, ঝিনুক, ঝাল, মেরা, ফুলঝুরি, গোলাপ, নোনাস, মুগডালের নকশি, ভিজানো নকশি, ফুল পাতা, গড়গড়, লবঙ্গলতিকা এ ধরনের কতশত পিঠার ভারে পরিপূর্ণ আমাদের পিঠার ঝুলি। তাল বড়া, কাঁঠালের পিঠাও রয়েছে এদের মধ্যে। এ সকল পিঠা স্বাদে-গন্ধে এতটাই বৈচিত্র্যময় যে তা সহজেই সবার নজর কাড়ে। পিঠা তৈরিতে বাঙালি রমণীর যে নৈপুণ্য ও যত্নের ছোঁয়া পাওয়া যায় তা যেন সৃষ্টিশীল শিল্পকর্মের অনন্য নমুনা হয়ে ওঠে।

পিঠার স্বাদ গ্রহণ ও জনসমক্ষে একে আরও পরিচিত করে তুলতে দিনব্যাপী অথবা সপ্তাহব্যাপী শহর-নগরে পিঠা উৎসবের আয়োজন করা হয়। ঢাকায় বাংলাদেশ শিশু একাডেমি, বাংলাদেশ মহিলা সমিতি, ঢাকাবাসী প্রমুখ সংস্থা-সংগঠনের উদ্যোগে এ উৎসব আয়োজিত হয়ে থাকে। সেজন্যই পিঠাকে ঘিরে 'পল্লী মায়ের কোল' কবিতায় বাংলাদেশের বিখ্যাত কবি বেগম সুফিয়া কামাল লিখেছেন–

> পৌষ পার্বণে পিঠা খেতে বসি খুশীতে বিষম খেয়ে
> আরও উল্লাস বাড়িয়াছে মনে মায়ের বকুনি পেয়ে।

শুধুমাত্র শীতেই নয়, সারা বছরই পিঠা খাওয়ার সুযোগ রয়েছে। শহুরে ব্যস্ত জীবনে পিঠা তৈরি করা বেশ কষ্টসাধ্য ব্যাপার। তাই, বেশ কিছু জায়গায় গড়ে উঠেছে পিঠাঘর, যেখানে পিঠা বিক্রি করা হয়। সাধারণত পিঠার সংখ্যা পিস হিসেবে বিক্রি হয়। এছাড়াও পিঠা খাওয়ার ব্যবস্থাও রয়েছে খাদ্য রসিকদের জন্য।

ভাপা পিঠা: বাষ্পের ভাপে তৈরি হয় বলেই হয়ত এর নাম ভাপা পিঠা। অনেকে একে ধুপি পিঠাও বলে থাকে। এতে সাধারণত গুড় এবং কোড়ানো নারকেল দেওয়া হয়। শীতে রাতে চুলার পাশে বসে ধোঁয়া ওঠা গরম গরম ভাপা পিঠা খাওয়ার মজাই আলাদা।

চিতই পিঠা: গনগনে চুলার আগুনের তাপে ফোঁড় ওঠা পিঠাটাই চিতই পিঠা। গরম গরম চিতই পিঠা নানারকম ভর্তা, খেজুরের গুড় অথবা লালি (তরল খেজুরের গুড়) দিয়ে খেতে খুবই সুস্বাদু লাগে। অনেক সময় মাটির পাত্রের গায়ে ছোটো ছোটো খোপ থাকে। এতে একসঙ্গে কয়েকটি পিঠা বানানো যায়। একে তখন সাতপুথি পিঠা বলে। চিতই অথবা সাতপুথি পিঠাকে দুধ আর খেজুরের গুড়ে ভিজিয়ে দুধ চিতই তৈরি করা হয়।

পাটিসাপটা পিঠা: পাটির মতো মোড়ানো হয় বলে হয়তবা পিঠাটির নাম পাটিসাপটা। মাঝখানে ক্ষীর দেওয়া এ পিঠাটি খেতে খুবই সুস্বাদু।

নানা ধরনের পুলি: চালের আটা দিয়ে পুর তৈরি করে এতে নারকেল কোড়া, আলু ভাজি বা সিদ্ধ ছোলার ডাল ঢুকিয়ে তেলে ভেজে তৈরি করা যায় নানা ধরনের পুলি পিঠা। নারকেল কোড়ায় তৈরি পুলি পিঠাকে দুধ আর খেজুরের গুড়ে ভিজিয়ে রেখে দুধ পুলি তৈরি করা যায়। এ পিঠারও আছে জনপ্রিয়তা।

তেল পিঠা বা পাকন পিঠা: এ পিঠাটি সারা বছর খাওয়া হয়। ছোটোবড়ো সকলেই এ পিঠাটি খেতে খুবই পছন্দ করে। গুড়ের বদলে ঝাল-লবণ দিয়ে তৈরি তেলে ভাজা ঝাল পিঠাও খুব সুস্বাদু। রংপুর অঞ্চলে চালের আটায় তেল, লবণ, হলুদ, কাঁচা মরিচ দিয়ে খামির তৈরি করে রুটির মতো বেলে গোল করে কাটার পর তেলে ভেজে এ ধরনের পিঠা তৈরি করা হয়। এর নাম নোনাস বা নোনতা পিঠা।

জামাই পিঠা: কিছুটা বড়ো, তেলে ভাজা এই পিঠাটির নাম শুনলে মনে হবে শুধু যেন জামাইদের জন্য এই পিঠাটি তৈরি করা হয়। আবার এরই সাথে মিল রেখে বিবিখানা নামের আরও একটি পিঠার প্রচলন আছে।

গোলাপ পিঠা: গোলাপের পাপড়ি মেলা পিঠাটির নাম গোলাপ পিঠা। চিনির রসে ভিজিয়ে এই দারুণ পিঠা তৈরি করা হয়।

নকশি পিঠা: বিভিন্ন ছাঁচের নকশাদার ছাড়াও খেজুর, ঝিনুক, মাছ, পাতা, ফুল নামের নকশি পিঠাগুলোও নান্দনিকতায় আমাদের মন কেড়ে নেয়।

মেরা পিঠা: আরেকটি জনপ্রিয় পিঠার নাম মেরা পিঠা। চালের গুড়া কড়াইয়ে ভেজে শুকনো ঝরঝরা হয়ে গেলে লবণ ও পানি

দিয়ে খামি বানাতে হয়। বিভিন্ন আকারের পিঠা বানিয়ে বড়ো হাঁড়িতে পানি ফুটে উঠলে এর উপর ঝাঝরি বসিয়ে পিঠা রেখে ১ ঘণ্টা ভাপে সেদ্ধ করে নিতে হয়। গরম গরম মাংসের তরকারির সঙ্গে পরিবেশন করা যায়।

কলার পিঠা: নারকেল কোড়া, খেজুরের রস জ্বাল দিয়ে কলা চটকে নিয়ে লবণ, কাঠবাদাম গুড়া, নারকেল কোড়া, ঘি ও চালের আটা দিয়ে মাখিয়ে একটু ঘন গোলা তৈরি করে ডুবো তেলে ভাজতে হয়। ভাজা কলার পিঠা রসে দিয়ে ১০-১৫ মিনিট পর পরিবেশন করা যায়।

তালের বড়া: তালের ঘন রস, দুধ, খাবার সোডা, লবণ, চিনি ও পানি একসঙ্গে মাখিয়ে আধা ঘণ্টা রেখে গোলা করে ডুবো তেলে বাদামি করে ভেজে নিতে হয়। এই পিঠাটিও খুব জনপ্রিয় একটি পিঠা।

মুড়ির মোয়া: মুড়ি ও খেজুরের গুড় দিয়ে বানানো হয় এটি। মুড়ির মোয়াও সকলের কাছে প্রিয়।

পিঠা-পুলি বাংলাদেশের জীবন ও সংস্কৃতির সাথে অবিচ্ছেদ্য। বর্তমানে প্রধানত শহর এলাকায় কেক, পেস্ট্রি ও বাণিজ্যিকভাবে প্রস্তুতকৃত অন্যান্য খাবার ঐতিহ্যবাহী ঘরে তৈরি পিঠার স্থান দখল করে নিয়েছে। কিন্তু এখনও পিঠার কদর আছে, এমনকি শহরেও তা সমাদৃত। আমাদের হাজারো সমস্যা সত্ত্বেও গ্রামবাংলার এসব পিঠা-পুলির আনন্দ উদ্দীপনা এখনও মুছে যায়নি। পিঠা-পুলির এ আনন্দ ও ঐতিহ্য যুগ যুগ ধরে টিকে থাকুক বাংলার ঘরে ঘরে।

সুস্মিতা চৌধুরী: সাংবাদিক ও প্রাবন্ধিক

প্রবাসে বসেই ডিজিটাল ভূমিসেবা

প্রবাসীরা যাতে প্রবাসে বসেই ই-নামজারি, ই-মিউটেশন, ই-ল্যান্ড ট্যাক্স পরিশোধ করতে পারে সে ব্যবস্থা করছে সরকার। সে ক্ষেত্রে তাদের জন্ম নিবন্ধন বা জাতীয় পরিচয় পত্র দিয়ে প্রাথমিকভাবে আবেদনের সুযোগ দেওয়ার নির্দেশ দেন ভূমিমন্ত্রী সাইফুজ্জামান চৌধুরী। ১৮ই অক্টোবর সচিবালয়ে ভূমি মন্ত্রণালয়ে অনুষ্ঠিত স্মার্ট ভূমি ব্যবস্থাপনার উপকমিটির প্রথম সভায় মন্ত্রী এ নির্দেশনা দেন।

ভূমি মন্ত্রণালয় বেশকিছু ডিজিটাল ও স্মার্ট উদ্যোগ গ্রহণ করেছে যা স্মার্ট বাংলাদেশের অর্থাৎ স্মার্ট সিটিজেন, স্মার্ট গভর্নমেন্ট, স্মার্ট ইকোনমি ও স্মার্ট সোসাইটির সঙ্গে সম্পৃক্ত। যেমন– সব ভূমি অফিস ক্যাশলেস ঘোষণা, ভূমিসেবা উদ্যোক্তামুখীকরণ, সাইবার নিরাপত্তায় বিশেষায়িত ফার্ম নিয়োগ, অ্যাপ থেকেই ভূমিসেবা প্রদান, প্রতিদিন ছয় কোটি টাকার ভূমিসেবা ফি তাৎক্ষণিকভাবে কোষাগারে জমা, ল্যান্ড ক্লাউড সার্ভারের জন্য প্রাথমিক প্রস্তুতি সম্পন্নকরণ, কিউআর কোড স্ক্যান করেই ভূমিসেবা ফি পরিশোধের সুযোগ রয়েছে।

ভূমি মন্ত্রণালয় ইতোমধ্যে প্রবাসীদের বিভিন্ন সেবা দিচ্ছে। এর মধ্যে অন্যতম হচ্ছে বিদেশে ডাকে খতিয়ান প্রেরণ এবং ভূমিসেবা হটলাইন ১৬১২২ নম্বর থেকে ভূমি পরামর্শ সেবা প্রদান। ভেনিজুয়েলা এবং যুক্তরাষ্ট্রে বসবাসকারী প্রবাসীরাও ডাকে সার্টিফাইড খতিয়ান সেবা গ্রহণ করে থাকেন।

প্রতিবেদন : মিনা ইয়াছমিন

নারীর প্রতি সহিংসতা প্রতিরোধঃ সচেতনতা ও দৃষ্টিভঙ্গি পরিবর্তন জরুরি

নীলিমা আক্তার

'নারী' –দুই অক্ষরের একটি শব্দের মধ্যে রয়েছে অপরিসীম ক্ষমতা। একটি উন্নয়নশীল দেশের অর্ধেক কারিগর হিসেবে তারা যখন সমাজের এক শ্রেণির বিকৃতমনা মানুষের হাতে নির্যাতিত বা সহিংসতার শিকার হয়, তখন তা পুরো সমাজের জন্য চিন্তার এবং লজ্জার কারণ। সাধারণভাবে নারীর প্রতি সহিংসতা বলতে পুরুষ কর্তৃক নারীদের কোনো না কোনো প্রকার কষ্ট দেওয়াকে বুঝায়। ব্যাপক অর্থে, নারীর প্রতি সহিংসতা বলতে নারীদের ওপর দৈহিক, মানসিক, সামাজিক ও অর্থনৈতিক যে-কোনো ধরনের নিপীড়ন ও নির্যাতনকে বোঝায়। নারীর যে-কোনো অধিকার খর্ব বা হরণ করা এবং কোনো নারীর ইচ্ছার বিরুদ্ধে কোনো বিষয় চাপিয়ে দেওয়া বা কোনো ব্যক্তি গোষ্ঠীর ইচ্ছানুসারে কাজ করতে বাধ্য করাও নারী নির্যাতন বা সহিংসতার অন্তর্গত। নারীর প্রতি সকল ধরনের সহিংসতা প্রতিরোধে ১৯৮১ সালে লাতিন আমেরিকায় নারীদের এক সম্মেলনে ২৫শে নভেম্বর 'আন্তর্জাতিক নারী নির্যাতন প্রতিরোধ দিবস' পালনের ঘোষণা দেওয়া হয়। ১৯৯৩ সালে ভিয়েনায় বিশ্ব মানবাধিকার সম্মেলন দিবসটিকে স্বীকৃতি দেয়। জাতিসংঘ দিবসটি পালনের আনুষ্ঠানিক স্বীকৃতি দেয় ১৯৯৯ সালের ১৭ই ডিসেম্বর। বাংলাদেশে নারী নির্যাতনের বিরুদ্ধে আন্তর্জাতিক প্রতিবাদ দিবস উদ্‌যাপন কমিটি ১৯৯৭ সাল থেকে এই দিবস ও পক্ষ পালন করছে। মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয় প্রতিবছর ২৫শে নভেম্বর থেকে ১০ই ডিসেম্বর পর্যন্ত নানা কর্মসূচির মাধ্যমে এই প্রতিরোধ পক্ষ উদ্‌যাপন করে।

পুরুষশাসিত এ সমাজে 'নারী নির্যাতন' যেন এক বিশাল ব্যাধি। সামাজিক কুপ্রথা ও দৃষ্টিভঙ্গি, দারিদ্র্যতা, বেকারত্ব, নিরাপত্তার অভাব, বাল্যবিবাহ, যৌতুক, আইন ও আইনগত অধিকার সম্পর্কে নারীদের অসচেতনতা, ধর্মীয় চর্চার অভাব, ধর্মীয় দৃষ্টিকোণের ভুল ব্যাখ্যা প্রভৃতি নারীর প্রতি সহিংসতার অন্যতম প্রধান কারণ। জলবায়ু পরিবর্তন, করোনা মহামারির মতো বিভিন্ন সংকটে নারীদের প্রতি সহিংসতার মাত্রা আরও বৃদ্ধি করেছে।

যুগ যুগ ধরে চলে আসছে নারী-পুরুষের সম-অধিকারের দাবি। কারণ সুপ্রাচীনকাল থেকেই নারী বঞ্চিত হচ্ছেন তার অধিকার থেকে। শুধু বঞ্চিতই নয়, হচ্ছেন নির্যাতনের শিকার। সমাজ ও সভ্যতা এত এগিয়ে যাওয়ার পরও বন্ধ হয়নি এই প্রবণতা। নারী ও কন্যাশিশুর প্রতি সহিংসতা আজকের বিশ্বেও মানবাধিকারের পক্ষে চাপ সৃষ্টিকারী ইস্যু হয়ে রয়ে গেছে। এটি একদিকে যেমন ঘৃণ্য অপরাধ, অন্যদিক জনস্বাস্থ্যের জন্যও হুমকিস্বরূপ। সমাজের যে-কোনো অংশে সহিংসতা আমাদের সবার ওপর প্রভাব বিস্তার করে। এই বিষয়গুলো পরবর্তী প্রজন্মের মনে যেমন দাগ কাটে, একইভাবে সামাজিক বন্ধন দুর্বল করে দেয়। অস্বীকার করার উপায় নেই যে, আমাদের দেশে নারী নির্যাতনের ঘটনা অতীতেও ঘটেছে এবং বর্তমানেও ঘটছে। অতীতে মানুষের মধ্যে এত সচেতনতা ছিল না। তখন নারী নির্যাতন যে একটা অপরাধ– সেটা অনেকেই জানত না। সময় এখন অনেক পাল্টেছে। শিক্ষাসহ সকল ক্ষেত্রেই এগিয়েছে মানুষ। সচেতনতা সৃষ্টি হয়েছে সমাজের সকল ক্ষেত্রেই। তারপরও নারী নির্যাতনের মতো স্পর্শকাতর ঘটনা এখনও ঘটছে। মানুষ যতই সচেতন হচ্ছে ততই যেন নারী নির্যাতনের ক্ষেত্রে তাদের অজ্ঞতা ও উদাসীনতা বৃদ্ধি পাচ্ছে। দেখা যায়, সমাজের শিক্ষিত, সচেতন ও প্রভাবশালী মানুষের দ্বারাই নারী সহিংসতার ঘটনা বেশি ঘটছে।

নারীর প্রতি সংহিসতা রোধে আছে আইন, বিভিন্ন ধরনের আন্তর্জাতিক সনদ ও চুক্তি। তন্মধ্যে রয়েছে– নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইন ২০০০ (সংশোধনী ২০০৩) (সংশোধনী ২০২০), পারিবারিক সহিংসতা (প্রতিরোধ ও সুরক্ষা) আইন ২০১০, পারিবারিক সহিংসতা প্রতিরোধ ও সুরক্ষা বিধিমালা ২০১৩, বাল্যবিবাহ নিরোধ আইন ২০১৭, বাল্যবিবাহ নিরোধ বিধিমালা ২০১৮, ডিএনএ আইন ২০১৪, ডিএনএ বিধিমালা ২০১৮, এসিড নিয়ন্ত্রণ আইন ২০১০, যৌতুক নিরোধ আইন ২০১৮ প্রভৃতি। এছাড়া মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের অধীনে ১১টি মন্ত্রণালয়ের সহায়তায় নারী ও শিশুর প্রতি সহিংসতা প্রতিরোধ ও প্রতিকারে 'নারী নির্যাতন প্রতিরোধকল্পে মাল্টিসেক্টরাল প্রোগ্রাম' শীর্ষক প্রকল্প সমন্বিত সেবা প্রদানের ব্রত নিয়ে দীর্ঘ ২১ বছর যাবৎ কাজ করে যাচ্ছে। ইতোমধ্যে এ প্রকল্পের আওতায় ঢাকা, রাজশাহী, চট্টগ্রাম, খুলনা, সিলেট, বরিশাল, রংপুর, ফরিদপুর, কক্সবাজার, নোয়াখালী, পাবনা, বগুরা এবং কুমিল্লা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নির্যাতনের শিকার নারী ও শিশুদের প্রয়োজনীয় সেবা একস্থান থেকে প্রদানের উদ্দেশ্যে ১৩টি ওয়ান-স্টপ ক্রাইসিস সেন্টার (ওসিসি) স্থাপন করা হয়েছে। স্বাস্থ্য সেবা, পুলিশি ও আইনি সহায়তা, মনোসামাজিক কাউন্সেলিং, ডিএনএ পরীক্ষার সুবিধা ইত্যাদি ওসিসি থেকে প্রদান করা হয়। দেশব্যাপী নির্যাতনের শিকার নারী ও শিশুদের সেবা প্রাপ্তির সুবিধার্থে ৪৭টি জেলা সদর হাসপাতাল এবং ২০টি উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে ৬৭টি ওয়ান-স্টপ ক্রাইসিস সেলের মাধ্যমে নির্যাতনের শিকার নারী ও শিশুকে প্রয়োজনীয় সেবা প্রদান করা হচ্ছে। উক্ত প্রকল্পের আওতায় ২০১২ সালে নারী ও শিশু নির্যাতন প্রতিরোধে ন্যাশনাল হেল্পলাইন সেন্টার প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। ১০৯ টোল ফ্রি নাম্বারে কল করে নির্যাতনের শিকার নারী ও শিশু, তাদের পরিবার এবং সংশ্লিষ্ট সকলে প্রয়োজনীয় তথ্য, পরামর্শসহ দেশে বিরাজমান সেবা এবং সহায়তা পেয়ে থাকেন। জাতিসংঘের নারীর প্রতি সব ধরনের বৈষম্য বিলোপ সনদ বা সিডও সনদে ১৯৮৪ সালের ৬ই নভেম্বর বাংলাদেশ সরকার অনুমোদন করে।

নারীর প্রতি শতকরা ৮০ ভাগ সহিংসতা ঘটে পরিবারের ভেতরে। নারীদেরকে সকল প্রকার সহিংসতা ও নির্যাতনের হাত থেকে রক্ষা করা আমাদের সকলের দায়িত্ব ও কর্তব্য। মায়ের শারীরিক ও মানসিক সুস্থতার ওপর সন্তানের শারীরিক ও মানসিক সুস্থতা নির্ভর করে। এ থেকেই বোঝা যায়, নারীরা আমাদের পরিবার, সমাজ ও দেশের জন্য কতটা গুরুত্বপূর্ণ। বিশেষজ্ঞরা মনে করেন, নারীর প্রতি সহিংসতা প্রতিরোধে সোচ্চার হতে হবে নারীদেরকেই। নিজের কথা বলতে হবে, নিজের অধিকার আদায়ের লক্ষ্যে। নির্যাতনকারী সমাজের যেই হোক না কেন, ভয়ভীতি দূর করে জোরালো কণ্ঠে প্রতিবাদ করতে হবে। পাশাপাশি পরিবর্তন করতে হবে সকলের দৃষ্টিভঙ্গি।

নীলিমা আক্তার: প্রাবন্ধিক

বিশ্ব টেলিভিশন দিবস

প্রশান্ত দে

টেলিভিশন বিশ্বের সবচেয়ে জনপ্রিয় ও শক্তিশালী গণমাধ্যম। প্রতিটি ব্যক্তির জীবনে টেলিভিশনের প্রভাব অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। শুধু তাই নয়, প্রত্যেকটি রাষ্ট্রের জাতীয় পর্যায়ে সঠিক তথ্য-উপাত্ত সরবরাহের মৌলিক মাধ্যম এই টেলিভিশন। এখান থেকে আমরা অনেক কিছু শিখতে পারি, জানতে পারি এবং আমাদের বিনোদন জগতেও টেলিভিশন অতুলনীয়।

প্রতিবছর ২১শে নভেম্বর সারা বিশ্বে বিশ্ব টেলিভিশন দিবস পালন করা হয়। ১৯২৬ সালের ২১শে নভেম্বর প্রথম টেলিভিশন আবিষ্কার করেন ব্রিটিশ বিজ্ঞানী জন লগি বেয়ার্ড। ব্রিটিশ এই বিজ্ঞানীর প্রতি শ্রদ্ধা রেখে ১৯৯৬ সালে জাতিসংঘ আয়োজিত এক ফোরামে ২১শে নভেম্বরকে বিশ্ব টেলিভিশন দিবস হিসেবে পালনের বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। এজন্যই সেই দিনটিকে স্মরণীয় এবং টেলিভিশনের গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তার স্বীকৃতিস্বরূপ প্রতিবছর টেলিভিশন দিবস পালন করা হয়।

টেলিভিশন শব্দটির উৎপত্তি গ্রিক ও লাতিন শব্দের সম্মিলনে। গ্রিক শব্দ 'টেলি' অর্থ 'দূরত্ব' আর লাতিন শব্দ 'ভিশন' অর্থ 'দেখা'– অর্থাৎ বাংলায় টেলিভিশন অর্থ 'দূরদর্শন'। শব্দ ও ছবিকে একত্রে একই প্যাটার্নে সম্প্রচার করার ধারণাই হচ্ছে 'টেলিভিশন'। অনেক প্রযুক্তির এখানে সমন্বয় হয়ে থাকে। মূলত তড়িৎ চৌম্বকীয় সাংকেতিক রূপান্তরটিই বেতার তরঙ্গের মাধ্যমে প্রেরণ করা হয়। টেলিভিশনের মূল অংশটি তা গ্রহণ করার ক্ষমতা অর্জন করে। টেলিভিশন সাধারণত প্রাথমিক আবিষ্কার স্থিরচিত্রের জন্যই কাজ করে থাকে। চলচ্চিত্র, ভিডিও, সিনেমা, নাটক আসলে স্থিরচিত্রেরই সমন্বিত রূপ। অনেকগুলো স্থিরচিত্র খুব দ্রুত গতিতে গ্রহণ করে থাকে ভিডিও ক্যামেরা।

একবিংশ শতাব্দীর শুরুতে মুদ্রণ মাধ্যমকে ছাপিয়ে নতুন হিসেবে নিজেদের জায়গা দখলের প্রতিযোগিতায় নামে সম্প্রচারমাধ্যম। ১৮৬২ সালে তারের মাধ্যমে স্থিরচিত্র পাঠানো সম্ভব হয়েছিল। বলা যায়, টেলিভিশন যাত্রার প্রাথমিক সক্ষমতা ওখানেই। বিজ্ঞানী মে ও স্মিথ ইলেকট্রনিক সিগন্যালের মাধ্যমে প্রথম ছবি পাঠানোর পদ্ধতি খুঁজে পান।

পরবর্তীতে অনেক প্রচেষ্টার পরে ১৯২৬ সালে ব্রিটিশ বিজ্ঞানী জন লগি বেয়ার্ড 'টেলিভিশন' আবিষ্কার করেন। বৈদ্যুতিক সিগন্যালের মাধ্যমে তখন দূরদর্শন করা হতো। ১৯২৭ সালে প্রথম বৈদ্যুতিক টেলিভিশন তৈরি করেন ফিলো টেইলর ফার্নসওয়ার্থ নামের একজন আমেরিকান উদ্ভাবক। তবে তখনও বাণিজ্যিকভাবে টেলিভিশনের ব্যবহার শুরু হয়নি। টেলিভিশন আবিষ্কার হওয়ার ১০ বছর পরে ১৯৩৬ সালে গণমাধ্যম বিবিসি প্রথম সাদা-কালো ছবি দ্বারা টিভি সম্প্রচার শুরু করেছিল। এক্ষেত্রে রুশ বংশোদ্ভূত সম্প্রচার প্রকৌশলী আইজ্যাক শোয়েন বারগোরকে কৃতিত্ব দিতে হয়।

এরপর আস্তে আস্তে টেলিভিশন বাণিজ্যিকভাবে ব্যবহার করা শুরু হয়। ১৯৪০ সালেই বাণিজ্যিক ভিত্তিতে 'টেলিভিশন' সম্প্রচার শুরু হয়। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ টেলিভিশনকে উল্লেখযোগ্য পরিবর্তনের সুযোগ এনে দেয়। টেলিভিশনের গুণগতমান আস্তে আস্তে উন্নত হতে থাকে। সাদা-কালো থেকে রঙিন টেলিভিশনে উন্নীত হয় এবং ধীরে ধীরে ব্যাপক জনপ্রিয় হয়ে ওঠে। প্রথমে শুধুমাত্র বিনোদনের জন্য টেলিভিশনের ব্যবহার শুরু হলেও, পরবর্তীতে শক্তিশালী গণমাধ্যম হিসেবে আত্মপ্রকাশ করে। ৫০-এর দশকে পরিপূর্ণ গণমাধ্যমের ভূমিকায় অবতীর্ণ হয় টেলিভিশন।

বাংলাদেশে টেলিভিশনের যাত্রা শুরু হয় ১৯৬৪ সালে। ঐ বছরের ২৫শে ডিসেম্বর বাংলাদেশ টেলিভিশন সাদা-কালো সম্প্রচার শুরু করে। ১৯৮০ সাল থেকে বাংলাদেশ টেলিভিশনে শুরু হয় রঙিন সম্প্রচার। এর মধ্যে সরকারি সম্প্রচারনীতিও প্রণীত হয়েছে। ঢাকা, চট্টগ্রামে পূর্ণাঙ্গ সম্প্রচার কেন্দ্র ছাড়াও বিটিভি ওয়ার্ল্ড ২০০৪ সাল থেকে সম্প্রচারিত হচ্ছে। রাষ্ট্রীয়ভাবে 'সংসদ বাংলাদেশ টেলিভিশন' নামে পূর্ণাঙ্গ চ্যানেল চালু হয়েছে ২০১১ সালে। এছাড়া দেশে সরকারি সম্প্রচারনীতি অনুসরণ করে বেশ কিছু বেসরকারি টেলিভিশন অনুমোদন দেওয়া হয়েছে সম্প্রচারের জন্য।

জাতীয় জীবনে সর্বত্র টেলিভিশন সৃজনশীল ভূমিকা পালন করছে। এন্টারটেইনমেন্টের পাশাপাশি গত এক শতাব্দী ধরে গণমাধ্যম হিসেবে টেলিভিশন গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখে যাচ্ছে। বিশ্বের অন্যান্য দেশের মতো বাংলাদেশও বিশ্ব টেলিভিশন দিবস উদ্‌যাপন করে। এ দিবস উপলক্ষে বাংলাদেশ টেলিভিশনসহ বিভিন্ন বেসরকারি টিভি চ্যানেলগুলো বিশেষ অনুষ্ঠান ও গোলটেবিল বৈঠক সম্প্রচার আয়োজন করে থাকে।

সারা বিশ্বের খেলাধুলা, পবিত্র হজসহ হাজারো ঘটনা আমরা ঘরে বসেই সরাসরি দেখতে পাচ্ছি। নিজস্ব ঐতিহ্য ও সংস্কৃতির বিকাশে সংগীত, নৃত্য, উপস্থাপনা, বাচনভঙ্গি, নাটক, আবৃত্তি, কৌতুক, টকশো ইত্যাদি ক্ষেত্রে প্রভাব বিস্তার করছে টিভি। সমাজের নানা সমস্যা সমাধানে, শিক্ষামূলক অনুষ্ঠানে, সাধারণ জ্ঞান প্রচারেও অবদান রাখছে এই মাধ্যম। সমাজের নানা অসঙ্গতি, কালোবাজারি, দুর্নীতি, ধূমপান, চোরাচালান, মাদকের মরণনেশা, আইনশৃঙ্খলা, আইন-আদালত, নৈতিক অধঃপতন, দেশপ্রেম, জাতীয়তাবোধ, শিল্পবোধ, স্বাস্থ্য ও নির্মল বিনোদন প্রভৃতি বিষয়ে অনুষ্ঠানের মাধ্যমে জাতিকে সমৃদ্ধ করছে 'টেলিভিশন'। তবে টেলিভিশন ব্যবহারের ক্ষেত্রে আমাদের সতর্ক থাকতে হবে। কারণ টেলিভিশন থেকে নির্গত ক্ষতিকর গামা রশ্মি স্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতিকারক। বিশেষ করে অধিক সময় টেলিভিশন দেখলে গামা রশ্মির কারণে দৃষ্টিশক্তি হ্রাস পেতে পারে। চিকিৎসকেরা এ কারণেই টিভি দেখতে সতর্ক বার্তা দিয়ে থাকেন। নিত্যনতুন প্রযুক্তির এলইডি, এলসিডি, প্লাজমা নামের অত্যাধুনিক প্রযুক্তিনির্ভর টেলিভিশন বাজারজাত হচ্ছে। সম্প্রচারনীতিতেও আনা হয়েছে ব্যাপক সৃজনশীলতা।

টেলিভিশনের মাধ্যমে বিশ্বের যে-কোনো প্রান্তের যে-কোনো ঘটনা মুহূর্তেই আমাদের সামনে চলে আসে। এজন্য টেলিভিশনই প্রথম বিশ্বকে মানুষের ঘরের মধ্যে এনেছিল, যার মাধ্যমেই হয় তথ্য ও বিনোদনের এক বিস্ময় জাগানিয়া অগ্রগতি। প্রযুক্তির অগ্রযাত্রার সঙ্গে তাল মিলিয়ে এগিয়ে যাচ্ছে বর্তমান টেলিভিশন প্রযুক্তি। টেলিভিশন হোক সুস্থ বিনোদনের মাধ্যম– যা থেকে আমরা ও আমাদের আগামী প্রজন্ম বিনোদনের সঙ্গে সঙ্গে তথ্যবহুল শিক্ষা অর্জন করতে পারে।

প্রশান্ত দে: প্রাবন্ধিক

একই সমতলে

আফরোজা পারভীন

ধানমন্ডি থেকে গুলশান হাতিরঝিলই যাবার সহজ রাস্তা। সেই রাস্তাতেই যায় রফিক। হাতিরঝিলের রাস্তা নির্মিত হবার শুরুর দিকে যাতায়াত বেশ আরামদায়ক ছিল। পান্থপথ-সোনারগাঁ সিগন্যাল পার করে ঝিলের রাস্তায় উঠলে একটানে চলে যাওয়া যেত পুলিশ প্লাজা অবধি। তারপর জ্যাম। তবুতো মাঝের বড়ো পথটা ছিল যানজটমুক্ত। এখন সে চিত্র নেই। ঝিলের উপরেও অজগরের মতো গাড়ির জ্যাম লেগে থাকে মাঝে মাঝেই। বড়ো দীর্ঘ সময় ধরে স্থায়ী হয় সেই জ্যাম। তারপরও এই রাস্তাটাই রফিক নেয়।

সে একটা বড়ো বিদেশি কোম্পানিতে কাজ করে। মোটা বেতন। জন্মেছেও ধনী অভিজাত পরিবারে। জীবনযাপন অভিজাত। ব্র্যান্ডের জামা-জুতো-ঘড়ি। অফিস থেকে যে গাড়িটি দিয়েছে সেটা চড়ার সামর্থ্য এদেশের অল্প লোকেরই আছে। রফিকের অবশ্য আছে। তার বাড়ির গ্যারেজে এমন আরও দুটো গাড়ি ঝিমাচ্ছে। চড়ার লোক নেই। দু'সন্তান বিদেশে। স্ত্রীও বেশিরভাগ সময় সেখানে। বাড়িঘর-বারান্দা-বাগান জনশূন্য। মানুষের নাকি থাকার ঘর থাকে না, তার ঘর আছে অনেক, থাকার লোক নেই।

এ নিয়ে তার কোনো আক্ষেপও নেই। এদেশের এই আটপৌরে জীবনকে সে জীবন মনে করে না। বাসযোগ্যও না। তাই সন্তানদের আন্ডার গ্র্যাজুয়েট লেবেলেই বিদেশে পড়তে পাঠিয়েছে। রফিক নিজেও বিদেশে পড়াশুনা করেছে। বুকে সামান্য ব্যথা ছাড়া শরীর এখনও ভালো আছে, চাকরিটাও শানদার। বাড়ি-ঘরদোরের ব্যবস্থা হয়নি এখনও। দু'চারটে বছর পার করে, বাড়িঘর বিক্রি বাট্টা করে সেও চলে যাবে। বিদেশে বাড়ি আগেই কিনেছে সে। বিদেশে গিয়ে বুকের ব্যথার চিকিৎসা করাবে। এদেশের চিকিৎসায় তার আস্থা নেই।

রাস্তায় বের হলেই মেজাজ খারাপ হয় তার। দুপাশে অজস্র হাত বাড়িয়েই থাকে। তার গাড়ির জানালা সবসময় তোলা থাকে। তারপরও সে জানালায় টোকা দেয়, মৃদু ধাক্কা মারে, ডাকে। অসহ্য লাগে রফিকের। এই এক দেশ, মানুষ আর মানুষ! কেউ চায় টাকা-পয়সা, কেউ বিক্রি করতে চায় তোয়ালে, কেউ ফল, কেউ পানির বোতল। রফিকের চেহারা আর ওর গাড়ি দেখে কী ওরা বোঝে না এসব জিনিস কেনার মানুষ ও নয়। ওর স্তর অনেক উঁচুতে। না, ওরা বোঝে না। তাই সমানে গাড়ির জানালায় টুক টুক করে চলে।

প্রচণ্ড গরম। মাঝে মাঝে এসিতেও গাড়ি ঠান্ডা হয় না। কখনও কখনও ঘামতে ঘামতে জানালা খুলতে হয়। এটা বেশি হয় সোনারগাঁ সিগন্যালে। তখনই জানালার কাঁচ নামানো দেখে ছুটে আসে একজন পানি বিক্রেতা।

: পানি নেবেন স্যার পানি, বিশুদ্ধ পানি, খুব ঠান্ডা।

রফিকের মেজাজ খারাপ হয়। বালতিতে চুবিয়ে পানি এনেছে। কোথায় কোন নদীর পানি তুলে এনেছে কে জানে। এদেশে কটা কোম্পানিই বা পানি টেস্ট করে বাজারজাত করে। বিএসটিআই-এর অনুমোদন আছে কজনের! এটা নাকি বিশুদ্ধ পানি!

: স্যার পানি নেন ।

: শোন এসব পানি আমি খাই না। আমি খাই বিদেশি পানি।

: বিদেশি পানি!

: হু, আমার কোম্পানি দূতাবাসের মাধ্যমে আনে।

পানি বিক্রেতা করুণ চোখে তাকিয়ে থাকে। রফিকের মনে হয় খামোখা ওর সাথে কথা বলতে গেল সে। ও একটা পানি বিক্রেতা। রফিকের মতো মানুষ ওর সাথে কথা বলবে কেন!

রফিক প্রচুর পানি খায়। পানিই ওর জীবনীশক্তি। গাড়িতে সবসময় তিন-চার বোতল পানি থাকে। একটু পর পর পানি খেতে থাকেও।

ওই সিগন্যালে গাড়ি যতবার থেমেছে ততবারই ছুটে এসেছে লোকটা। জানালা খোলা পেলে সরাসরি কথা বলেছে। আর না পেলে জানালার ধারে দাঁড়িয়ে অনুনয়-বিনয় করেছে। রফিক মহাবিরক্ত। ওতো জানে রফিক পানি কিনবে না, তারপরও কেন বিরক্ত করে!

এবার বোধহয় গাড়ির কাঁচটা ডার্ক করতেই হবে। ডার্ক রং তার অপছন্দ। কেমন যেন অন্ধকারের জীব মনে হয়। রফিকের নাক উঁচু ঠিকই কিন্তু অন্ধকারে লুকানোর মতো কোনো কাজ সে কখনোই করে না । তাই সাদা কাঁচই তার পছন্দ। কিন্তু এসব লোক বোধহয় কাঁচ সাদা রাখতে দেবে না।

সেদিন সিগন্যালে গাড়ি থামামাত্র লাগাতার জানালায় টোকা দিতে লাগল লোকটা। সিগন্যালও ছাড়ে না গাড়িও এগোয় না। ড্রাইভার তাকে চলে যেতে বলল। রফিকও হাত দিয়ে কয়েকবার চলে যাবার ইঙ্গিত করল। কিন্তু সে টুক টুক করতে থাকল।

একসময় ধৈর্য হারালো রফিক। এক টানে জানালার কাঁচ নামিয়ে দিলো।
: কী, হয়েছে কী। বিরক্ত করছ কেন?
: স্যার এক বোতল পানি নেন, ঠান্ডা বিশুদ্ধ, এই গরমে
: তোমাকে আগেও বলেছি, এই পানি আমি খাই না। শোনো না কেন? রোজ জ্বালাতন করো কেন?
: আজ এক বোতল পানিও বিক্রি হয়নি স্যার
: বিক্রি হয়নি তো আমি কী করব? যারা এসব জঘন্য পানি খায় তাদের কাছে যাও। ওই বাসের জানালায় যাও, টেম্পুর জানালায় যাও, রিকশার কাছে যাও।
: কেউ নেয়নি স্যার, আজকাল সবাই বাসা থেকে বোতলে পানি নিয়ে আসে। আপনি এক বোতল নেন স্যার।
: কী, ওরা যে বোতল নেয় না আমাকে সেই বোতল নিতে বলছ? আমি ওদের মতো? তোমার তো বড্ড সাহস! আর যদি কোনোদিন তোমাকে আমার গাড়ির পাশে দেখি তো খুব বিপদ হবে তোমার।

রফিক চিৎকার করে ওঠে। পানি বিক্রেতা দ্রুত সরে যায়।

রফিক তখনও রাগে কাঁপছে। বিড় বিড় করে, কী এক ব্যাবসা হয়েছে। আগে এদেশে পানি বিক্রি হতো না। বিক্রি শুরুর প্রথমদিকে দামও নিতো না। বলত, যা খুশি দেন। এখন দূষণ আর্সেনিকের অজুহাতে পানি কোম্পানিতে ছয়লাব। বলে বিশুদ্ধ, কতটা বিশুদ্ধ কে জানে!

একসময় জ্যাম ছাড়ে । গাড়ি চলতে থাকে।

দুই

এরপর অনেক দিন পানি বিক্রেতা গাড়ির ধারে কাছে আসেনি । রফিক ওকে দেখেছে। রফিকের গাড়ি দেখে ও দ্রুত অন্যদিকে সরে গেছে। রফিক স্বস্তির নিশ্বাস ফেলেছে! যাক অযথা উৎপাত থেকে বাঁচা গেল!

সেদিন সারা ঢাকাজুড়ে নানান কর্মসূচি। বিরোধীদলের মানববন্ধন, অন্য কীসব সভা-সমাবেশ, উদ্বোধন, ভিআইপি ক্রসিং, একাধিক রাস্তা বন্ধ। অফিস শেষ করে বাসায় ফিরছে রফিক। গাড়ি নড়ছে না। গুলশান থেকে হাতিরঝিলে উঠতেই কয়েক ঘণ্টা পেরিয়ে গেল। ঝিলের উপর বিশাল লম্বা লাইন। গ্যাস ফুরিয়ে গেল। এসি কাজ করছে না প্রচণ্ড গরমে। পিঁপড়েরও একটা গতি থাকে, গাড়ির তাও নেই। জানালা খুলে দিয়েছে আগেই। কিন্তু বাইরে থেকে যেন ছুটে আসছে লু হাওয়া। কী করবে সে এখন! সে একটু পর পর পানি খাচ্ছে । একটু পর পর গলা শুকিয়ে যাচ্ছে। এই জ্যাম থেকে যে বেরিয়ে অন্য রাস্তা ধরবে সে পথও নেই। অসুস্থ বোধ করছে রফিক। খবরের কাগজ দিয়ে বাতাস নিচ্ছে। পানি খাচ্ছে। একসময় বোতল হাতে নিয়ে দেখল পানি নেই। এখন উপায়। পানি ছাড়া যে সে বাঁচবে না!

ধুঁকতে ধুঁকতে এক সময় সোনারগাঁ সিগন্যালে এলো গাড়ি। রফিকের বুক ব্যথা করছে, শ্বাস নিতে পারছে না, গলা শুকিয়ে যাচ্ছে। ড্রাইভার বার বার পেছন ফিরে দেখছে, কী করবে বুঝতে পারছে না। ইতোমধ্যে সে কয়েকটা ফোনও করে ফেলেছে। ফোনে জবাব এসেছে, 'সরাসরি স্কয়ারে নিয়ে যাও। আমরা আসছি'। কিন্তু সেই স্কয়ার পর্যন্ত যেতে হবে তো, কীভাবে?

রফিক গোঙড়াচ্ছে।

: ড্রাইভার পানি দাও, পানি, পানি খেলে আমি ঠিক হয়ে যাবো।

ড্রাইভার এদিক-ওদিক তাকায়। তার নিজের পানিও ফুরিয়ে গেছে। এখানে প্রতিদিন কত পানি বিক্রেতা থাকে। আজ কাউকেই তার চোখে পড়ে না। ওরা গেল কোথায়! তাছাড়া এই পানি পেলেও স্যার কী খাবেন? যদি কিছু হয় তাকে দুষবেন না তো!

এক সময় জানালার পাশ দিয়ে যেতে যেতে ভেতরে তাকিয়ে থমকে দাঁড়ায় সেই পানি বিক্রেতা। রাগি মানুষটা ভেতরে ছটফট করছে!
: স্যারের শরীর খারাপ?
: হ্যাঁ, খুব। তাছাড়া পানি শেষ হয়ে গেছে।

লোকটা তার বালতি থেকে বের করে একটা বোতল। একটানে মুখ খুলে এগিয়ে দেয়। ড্রাইভার ভয়ে ভয়ে বোতলটা রফিকের মুখে ধরে। চোঁ চোঁ করে রফিক টেনে নেয় পুরো বোতল। তারপর লম্বা একটা শ্বাস ছাড়ে। বলে,
: বাঁচলাম!
আস্তে পকেটে হাত দিয়ে এক হাজার টাকার একটা নোট বাড়িয়ে দেয়।
: আমার কাছে অত বড়ো নোটের ভাঙতি নেই স্যার। বিশ টাকা দেন।
: পুরোটা তোমাকে দিলাম। তুমি আমার জীবন বাঁচিয়েছ।
: আমি পানি বিক্রি করেছি স্যার। যার দাম বিশ টাকা। এর বেশি নেব না স্যার।
অবাক রফিক বিশ টাকা এগিয়ে দেয়।
পানি বিক্রেতা সালাম দিয়ে ছুটতে থাকে বাসের জানালার দিকে।
: পানি নেবেন পানি, বিশুদ্ধ পানি, জীবনদায়ী পানি!

———○———

বিস্মৃত বর্তমান

প্রণব মজুমদার

– এসকিউজ মি ? হাউ মাচ দিস ওয়ান ?
– ফাইভ রিঙ্গিত অনলি!

খাওয়ার আগে জিজ্ঞেসা করে নেয়াই উত্তম! বিদেশ বলে কথা! বিপদে পড়লে অচেনা স্থানে কে এসে সমাধান দিবে? অনীকের বৈশিষ্ট্যও তাই। ক্রয়ের আগে পণ্যের মূল্য জিজ্ঞাসা করে নেওয়া। তাতে শঙ্কা আর থাকে না! দাম জেনে সিদ্ধান্ত নেওয়া যায়। অনীকের কাছে আছে তিরিশ রিঙ্গিত! সদ্য মালয়েশিয়া ফেরত বান্ধবী ইয়াসমিন রীমা। যাত্রার দুইদিন আগে ওর কাছ থেকে সে রিঙ্গিত নিয়ে এসেছে। বিমানে ওঠার নির্গমন পথের পাশেই সুসজ্জিত হালকা খাবারের দোকান। দোকানের কিশোরকে সে অর্থ পরিশোধ করল! তারপর ওভেনে গরম করা ভেজিটেবল নুডলস ও পানীয় বোতলটা নিয়ে খাবার চেয়ারে বসল। টেবিলে রাখা সস খাবারে মিলিয়ে নিলো অনীক। খুব খিদে পেয়েছে! ফ্লাইট অবতরণের পরপর ক্ষীণকায় গৌরবর্ণের তরুণী ক্রু রুটি, সবজি, সিদ্ধ ডিম ও আপেল জুস যা দিয়েছে তা পরিমাণে কমই ছিল। নির্ঘুম রাতে অনীকের খিদে পায় বেশি। পুরুষদের রিফ্রেশমেন্ট রুম থেকে বেরিয়ে সারিবদ্ধ মনোরম প্যাসেঞ্জার্স লাউঞ্জের আসনে এসে বসল সে। মাঝখানের আসনটি ফাঁকা। সে আসনে আরাম করে বসা মধ্য বয়সি এক থাই নারী বই পড়ছিলেন! অনীকের এটাচিটা হযরত শাহজালাল বিমানবন্দরে বোর্ডিংয়ের সময় লাগেজ বেল্টে দেওয়া হয়েছে! তাই ভারী বোঝা বহনের ঝামেলা নেই। কাঁধে ঝোলানো ব্যাগ থেকে ল্যাপটপটা বের করল সে। তারপর বিভিন্ন ফোল্ডারে রাখা গুরুত্বপূর্ণ কাগজপত্র দেখতে লাগল!

আর ভালো লাগছে না একা একা! আরও দীর্ঘ সময় অপেক্ষা! ঢাকা থেকে সিঙ্গাপুর। অফিসের প্রতিনিধি হিসেবে কস্ট ম্যানেজমেন্টের ওপর এক ওয়ার্কশপে চার্টার্ড অ্যাকাউন্ট্যান্ট অনীকের একা সফর। কুয়ালালামপুর ট্রানজিট। মালয়েশিয়ান এয়ারলাইন্সেই সিংগাপুর যেতে হবে।

– ক্যায়া মে আপকে পাছ বেট সাকতা হু ? সন্ন্যাসিনীর মতো তুষার ধবল পোশাকে মধ্য বয়সি একজন নারী অনীককে প্রশ্ন করল! ল্যাপটপটার পাওয়ার বন্ধ করতে করতে তাকালো সে। বলল,

– শিউর ম্যাম!

হিন্দি কথা শুনে মনে হলো ভদ্রমহিলা ভারতীয়! কিন্তু তার চাউনি নিশ্চল! অপলক! বিস্ময়ের ঢেউ ঝাপটা মারে অনীকের চোখমুখে! লজ্জাও পেল সে।

কী মেয়েরে বাবা! অনীক লক্ষ করল সন্ন্যাসিনীর চোখ ভারি সুন্দর! মনে হলো কী জানি ভাবছেন তাকে নিয়ে! না হলে চোখের মায়াজাল তৈরি করবেন কেন ? অতি উৎসাহী হয়ে তিনি বললেন,

– আপনি কি বাংলাদেশি স্যার ? কোথায় যাচ্ছেন ? মেয়েটির প্রশ্ন শুনে বেশ উৎসাহী হয়ে উঠে অনীক ! মেয়েটি বাংলা বলছেন স্পষ্ট করে। তাহলে ওনার দেশও কি বাংলাদেশ ?

– ঠিক ধরেছেন ! যাচ্ছি সিংগাপুর।

মেয়েটির বলার ভঙ্গি ও কণ্ঠটা চেনা চেনা মনে হলো অনীকের! সাহস হলো না তা বলার! বরং অনীককে হতবাক করে দিয়ে সন্ন্যাসিনী বললেন,
– বাংলাদেশে আপনার বাড়ি কি কুমিল্লায় ?
এবার আরও আগ্রহী হয়ে ওঠে অনীক!
অনীকের মুখোমুখি মেয়েটি। তর্জনী তাক করে বললেন,
– আপনার নাম পালা ? কান্দিরপাড় রামঘাট বাড়ি ? অনীক আসন ছেড়ে উঠে দাঁড়ায়।
– আপনার নাম কী নন্দা ?
মেয়েটি অনীকের হাত স্পর্শ করে বলল,
– আমায় চিনতে পারলে না পালা ? হাত ধরল অনীকও!
– আপনি কী আসলেন না যাচ্ছেন ?
– আপনি আপনি করছ কেন ? অনীকের জড়তা ভাঙ্গে এবার। অনুরোধের সুরে বলল,
– গন্তব্য কোথায় তোমার ?
– মুম্বাই! আসলাম ব্যাংকক থেকে! হোমসের কাজে গিয়েছিলাম।
– চলো ওই কফি শপটায় গিয়ে বসি ! নন্দাকে পালার অনুরোধ।

এয়ার এশিয়ার ফ্লাইট করে নন্দা থাইল্যান্ড থেকে ভারত যাচ্ছে! ওরও কুয়ালালামপুর ট্রানজিট। মালয়েশিয়ার কুয়ালালামপুর আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে আড়াই ঘণ্টার যাত্রা বিরতি তার। নন্দিতা রায়ের এয়ার এশিয়ার একে ১৭৭৮ ফ্লাইটে ওঠার নির্গমন গেট জি-১০। বিমান ছাড়বে মালয়েশিয়ার সময় রাত ২টা ১০ মিনিট। অনীক মুখার্জী মালয়েশিয়া এয়ারলাইন্সের এম এইচ-৫৭৮ ফ্লাইটে সিংগাপুর যাত্রা করবে রাত সাড়ে ৩ টায়! অনীক লক্ষ করল এখন বাজছে রাত একটা ৫ মিনিট। সামনেই কফি শপ। পালা নন্দাকে নিয়ে ঢুকল সেখানে। দুজনে মুখোমুখি বসে একটি টেবিলে! পেমেন্ট দিয়ে ড্রাই কেক ও কফির অর্ডার দিলো নন্দা। ভ্রূ কুঁচকে বিস্ময়ের সঙ্গে পালা বলল,

– তা কত বছর পর দেখা হলো ?
– ৩০ বছরতো হবেই!
– স্বামী সন্তান ঘর সংসার ? জীবন সুখ ইত্যাদি ?

দীর্ঘশ্বাস ছাড়ে নন্দা! কফি মগের প্রান্তে সে ভারী ঠোঁট স্পর্শ করে। নিশ্চল চোখের পাতা! সরাসরি নিবিড়ভাবে তাকায় পালার চোখে। ভেতরটা ঝড়ে তছনছ হয়ে যাচ্ছে নন্দিতার! আড়াই যুগের এ মন বেদনা। তিরিশ বছর ধরে পালার জন্য অনেক প্রশ্ন জমা ছিল নন্দার! ভাবেনি পালার সঙ্গে দেখা হবে কোনোদিন। সে কষ্ট তার ভেতরেই ছিল। আজ এ মুহূর্তে ওর কাঠগড়ায় অনীক! অভিযোগের সুরে অনীকের উদ্দেশে নানা প্রশ্ন।

– সুখ কাকে বলে ? জীবনের সংজ্ঞা তুমি জানো ? সুখ মানে কি ভালোবাসায় আকুল কাউকে এড়িয়ে যাওয়া ? সারাক্ষণ বইমুখী হয়ে থাকা! সুখ মানে কি শুধুই বিদ্যার ভারবাহী প্রাণী! তুমিতো সুখ বুঝোনি! জীবনের মানে তুমি বুঝতে চেষ্টাও করোনি! একটি মনের অতলে আরেকটা মন থাকে! সেটা হোক মেয়ে কিংবা ছেলে। মন কী চায় সেটাও জানা প্রয়োজন! তোমার ভালোবাসার মন কখনোই ছিল না।

বাম গালে হাত রেখে অনীক ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে থাকে। কফির পেয়ালা থেকে মুখ সরিয়ে নেয় সে। তারপর নন্দিতার উদ্দেশে সে ধীরে ক্ষুদ্র একটি বাক্য নিক্ষেপ করে।

– তুমি কি সত্যি আমায় পছন্দ করতে ?

– বীরচন্দ্র গণপাঠাগার ও নগর মিলনায়তনের সেই সময়গুলো কি মিথ্যে? রবীন্দ্র, নজরুল ও সুকান্ত জন্মজয়ন্তীতে আমার নৃত্যনাট্যের অনুষ্ঠান? মনে পড়ে তোমাকে দেখার অজুহাতে আমার বান্ধবী অর্থাৎ তোমার ছোটো বোন অনিন্দিতার কাছে কত্তো গিয়েছি! রামঘাটের পাড়েই আমাদের বাসা। পাশেই লাগোয়া। তোমাদেরও ছিল টিনের ঘর।

অনীকের এখন সব মনে পড়ছে! গান-বাজনায় বেশ পারদর্শী ছিল নন্দিতা। ওর প্রায় অনুষ্ঠানেই ছোটো বোন অনুর সঙ্গে সে টাউন হলে যেত।

তখন ছিল গ্রীষ্মকাল। বৈশাখি ঝড়! এর আগে বিকেলে বসে অঙ্ক করছিল পালা! সামনে মেট্রিক পরীক্ষা। আরেক ঘরে সবাই। একটা কাগজের ওপর লাল রং আঁকা গোলাপ ফুল ও গাছ! ফুলের পাশে ইংরেজি বর্ণমালা 'এন' আর গাছের সঙ্গে 'পি'! আঁকা সে টুকরো কাগজটা কে যেন জানালা দিয়ে ছুঁড়ে পালালো। ওটা এসে পড়ল পালার কোলের ওপর। বৃষ্টি থামার পর হারিকেনের আলোতে মোড়ানো কাগজটা খুলে পালা বুঝতে পারেনি এটা কার কাণ্ড! অনু মানে অনিন্দিতাকে পালা জিজ্ঞাসাও করেছিল। অনু পালাকে বলেছিল, তুই কিছু বুঝিসনি ছোটদা ? নন্দা অনুর কাছে প্রায়ই আসত। ছোটো বোনের সঙ্গে প্রায় সব বিষয়েই কথা বলত পালা। পড়াশোনা, টিউশনি ছাড়া অন্য কিছু ভাবতো না সে। অনু প্রায়ই নন্দার নানা গল্প করত ছোটদার কাছে। পালাদের টিনের পাঁচিলে বিভিন্ন স্থানে খড়িমাটির সাদা চকে লেখা 'এন' যোগ 'পি'! তা দেখিয়ে অনু বলত ছোটদা এর অর্থ জানিস ? বোকার মতো পালার উত্তর –'নারে।' অনু রেগে পালাকে বলেছিল, 'তুই আসলেই একটা হাঁদারাম।'

পরে অনুকে সঙ্গে নিয়ে নন্দা একদিন দুপুরে পালার কাছে আসে! পালার থেকে দুই বছরের ছোটো। অনু ও নন্দা সহপাঠী! পড়ামগ্ন পালাকে বলে তোমার সঙ্গে কথা আছে ? পাশে দাঁড়ানো অনু তখন মিটিমিটি হাসছিল।

পালার অনাগ্রহ বুঝতে পেরে নন্দা ওদের বাসা থেকে বের হয়ে যায়। অনু পরে জানিয়েছিল ওকে লেখা নন্দার চিঠিটির কথা। কিন্তু বিষয়টি তখন গায়েই মাখেনি পালা। জেলা স্কুল থেকে এসএসসিতে ভালো রেজাল্ট করে ঢাকা কলেজে এসে ভর্তি হয় পালা। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অ্যাকাউন্টিংয়ে অনার্সে ভর্তি হয়ে বাড়িতে যায় অনীক। অনুর কাছে জানতে পারে নন্দিতাদের পুরো পরিবার চলে গেছে নেপাল! ওর বাবার কর্মস্থল কাঠমান্ডু।

পালার মগের মধ্যে কফির অবশিষ্ট ঠান্ডা হয়ে গেছে! ওর কেকের বাকি অংশটুকু নন্দার সামনে ঠেলে দেয় সে।

– নষ্ট করো না, নাও! তোমার প্রস্তাব আমাকে সরাসরি বলতে ?

– অনেকবার চেষ্টা করেছি তা বলার! তুমি আমলই দাওনি। চিঠিও দিয়েছি একাধিকবার। তোমাকে লেখা আমার সর্বশেষ চিরকুটটা তুমি দেখনি বলে অনু আমাকে তা ফেরত দিয়েছিল! আজও সেই স্মৃতিচিহ্ন রেখে দিয়েছি! প্রমাণগুলো বয়ে যাচ্ছি অনন্তকালের গন্তব্যে! জানি এর কোনো সুখ ঠিকানা নেই! চোখ ছলছল নন্দিতা রায় ওর পার্সটা টেনে নেয় ওর তুফান বিধ্বস্ত বুকে! কম্পিত হাত! তা ঢুকিয়ে বের করে আনে পালার একটি রঙিন ছবি আর একটি চিঠি!

– এই দেখ! সুদর্শন এই তরুণকে চিনো ?

হতচকিত হয়ে যায় পালা! ছবিটা হাতে নিয়ে উচ্ছ্বসিত হয়ে ওঠে সে!

– আরে এইটাতো আমার মেট্রিক পরীক্ষায় ফরম ফিলাপের আগে তোলা ছবি! তুমি পেলে কোথায় ?

– মনোহরপুর আজহার স্টুডিও থেকে সংগ্রহ করেছিলাম। তোমার ছবিটি দীর্ঘদিন সেই দোতলার স্টুডিওতে বাঁধাই করা কাঁচের ফ্রেমে টাঙানো ছিল। আমি ছবিটা ওয়াশ করে নিয়েছিলাম। এই ধরো বাকি কথাকাব্য।

বুক পকেট থেকে চশমাটা বের করে চোখে তা পরে নিলো অনীক। চিঠির সাদা রঙটি ধূসর হয়ে গেছে! হালকা হলুদ রঙের দিকে যাচ্ছে স্মৃতিবাহী লিপিটা। কালিতে আঙুলের স্পর্শে লেখা শব্দগুলো মলিন। অস্পষ্ট হয়ে পড়েছে। হৃদয় ঘাতকের আঘাতে নন্দিতা রায়ের বিক্ষত মৃত মনের মতো এ চিরকুটটা একদিন নষ্ট হয়ে যাবে। এসব ভাবতে লাগল অনীক। হাত দিয়ে চোখ মুছতে লাগল সে। দেখল কাগজের মাঝখানে মাত্র দুইটি বাক্য লেখা। চিঠির পুরো সম্বোধন নেই! শুধু 'পি' বলে আহ্বান, সমাপ্ত 'এন' দিয়ে। তোমাকে নিয়ে সুন্দর একটি নীড় গড়ার স্বপ্নে বিভোর আমি। অপেক্ষায় থাকব শেষ নিশ্বাস অবধি। প্যান্টের পকেট থেকে রুমাল বের করে অনীক। চশমা খুলে রুমাল দিয়ে চোখ মুছে সে আবার! চিঠিটা অনীকের কাছ থেকে নিয়ে নন্দিতা তা পার্সে রাখে। অপরাধীর মতো নতমুখে অনীক বলে,

– আমায় ক্ষমা করে দিও নন্দিতা! জীবন সংসারে এক ব্যর্থ পুরুষ আমি।

নন্দিতা কৌতূহল মন নিয়ে অনীকের মুখের দিকে তাকায়।

– তোমার কয় ছেলেমেয়ে? গিন্নি?

– দুই ছেলে এক মেয়ে। ওরা একজন অস্ট্রেলিয়া ও দুজন কানাডায় বৃত্তি নিয়ে উচ্চতর পড়াশোনা করছে। স্ত্রী চলে গেছে আমাকে ছেড়ে। তোমার তো কিছুই জানা হলো না?

– আমার ছেলেমেয়ে অনেক! সহস্রাধিক। ওরা এখন মুম্বাইয়ের পুনেতে মাহের অনাথ হোমসে আছে।

ওদের সঙ্গে থাকি আমি দু' যুগ ধরে।

– বাট ইয়োর হাসব্যান্ড? হয়ার ইজ?

– হিজ নেম ইজ- পি! লিভস ইন দ্য হেভেন ডার্ক। মাই লেটার্স রিসিপ্যান্ট! হুইচ লেটার আই হ্যাভ বিন ক্যারিং অল দ্য টাইম স্যার!

নন্দিতা রায় উঠে দাঁড়ালো। আস্তে আস্তে হেঁটে যায় ১০ নম্বর ডেপার্টচার প্যাসেজের সামনে! পেছনে অনীক। পাশের যাত্রীর লাউঞ্জের আসনে বসে ওরা। মুম্বাইয়ে ফ্লাইটের জন্য কিছুক্ষণের মধ্যেই অপেক্ষমান যাত্রীদের চেকিং শুরু হবে। অনীক নন্দিতার কাছ থেকে ওর যোগাযোগ নম্বর ও ঠিকানা চেয়ে নেয়! আর ওর অফিসের নেম কার্ড ওর হাতে গুঁজে দেয়। তারপর ক্লোজ হয়ে অনীক ওর আইফোন সেটে কয়েকটা সেলফি তুলে রাখে।

– আসি তাহলে! এসো আমাদের মাহের আশ্রমে।

– তোমার আর কিছুই বলার নেই নন্দা ?

বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয় থেকে রবীন্দ্র সংগীতের ওপর স্নাতক পাস করা নন্দিতা রায় বলে ওঠে,

– বড্ড দেরি হয়ে গেছে! সূর্য অস্তাচলে। সুললিত কণ্ঠে আবৃত্তির ঢঙে বলে,

– প্রহর শেষে আলোয় রাঙা, সেদিন চৈত্র মাস, তোমার চোখে দেখেছিলুম আমার সর্বনাশ!

নন্দিতার নরম হাতটা আবারও স্পর্শ করল অনীক!

– গুডবাই! চশমা খুলে চোখের জল মুছে সে। পেছন দিকে তাকাচ্ছিল নন্দিতা। দূর থেকে লক্ষ করল ওর পদযাত্রার গতিটা! নন্দিতা রায়ের ছায়াটাও যাত্রীদের ভিড়ে এক সময় মিলিয়ে যায়।

ধূমপান স্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতিকর।
পাবলিক প্লেসে ধূমপান দণ্ডনীয় অপরাধ।

বানের গল্প

ইজামুল হক

ভেজানো দরজা ঠেলে ঘরে ঢুকে মজিদ। ভরা পূর্ণিমার রাত। রুপালি জোছনায় ভেসে যাচ্ছে চরাচর। জানালা গলিয়ে যে আলোটুকু ঢুকেছে ঘরের ভেতর সে আলোর নীচে কেমন ঝলমল করছে জরিনার মুখখানি। মজিদের মনে দুষ্টুমি খেলা করে।

না, জরিনার ঘুম ভাঙানো উচিত হবে না। সারা দিন হাড়ভাঙা খাটুনি, তার উপর মায়ের বকাঝকা আর পাড়াপড়শির কথার খোঁচাতো আছেই। নিজের উপর রাগ হয় মজিদের। কেন যে চা দোকানের আড্ডাটা ছাড়তে পারছে না সে। একবার কিছুদিন বন্ধ রেখেছিল। বন্ধুরা বউপাগলা বলে ক্ষ্যাপাতে শুরু করলে আবার তা চালু হয়। মজিদের আর কোনো বদ অভ্যেস নেই। চা দোকানের আড্ডা আর মাছ ধরার নেশাটাই কেবল ছাড়তে পারছে না।

জরিনার দিকে আরেকবার তাকায় মজিদ। ভেতরটা কেমন তোলপাড় করে ওঠে। কত চাওয়ার পর সে জরিনাকে পেয়েছে। এক এক করে সব মনে পড়ে।

মজিদদের বাড়ির পুব দিকের চার-পাঁচটি বাড়ির পর রাস্তাটি যেখানে এসে খানিকটা সরু হয়ে এসেছে তার পরের বাড়িটিই জরিনাদের। সরু রাস্তার দুপাশে বড়ো বড়ো কয়েকটি গাছ গা-ঘেঁষাঘেঁষি করে এমনভাবে দাঁড়িয়ে আছে যে সব সময় জায়গাটা জমাট বাঁধা অন্ধকারে ঢাকা থাকে।

গা ছমছম করা এ রাস্তাটিতে কোনো লোক চলাচল করে না তেমন। সেদিন কী এক প্রয়োজনে মজিদকে ভূতুরে অন্ধকারেঢাকা সে রাস্তাটি পার হয়েই সামনের দিকে যেতে হবে। মজিদ দোয়া পড়ে বুকে দু'তিন বার ফুঁ-দিয়ে এক দৌড়ে পার হয়ে হাঁপাতে থাকে। চোখ মেলতেই দেখতে পায় করমচা গাছের ছায়ায় দাঁড়িয়ে একটি মেয়ে কী যেন করছে। মেয়েটির বয়স ষোলো ছুঁই ছুঁই। গায়ের রং উজ্জ্বল ফর্সা। ঘন কালো কোঁকড়ানো চুল। মায়া জড়ানো বড়ো বড়ো চোখ। মজিদ আর কোনো মেয়ের দিকে এমন করে তাকিয়ে থাকেনি। ঘোর কাটতেই সে চিনতে পারে। মেয়েটি রফিকের বোন জরিনা।

মজিদের মন থেকে কিছুতেই সরাতে পারে না জরিনার মুখখানি। ওকে এতটাই ভালো লেগেছে যে ওকে বউ করার স্বপ্ন দেখতে শুরু করেছে মজিদ। এতদিন মা-বাবা বিয়ের কথা পাড়লেও

মজিদ কোনো হু-হা করেনি। এবার সে নিজেই মায়ের কাছে তার ইচ্ছের কথা জানায়।

মজিদের মা এক বিকেলে হাজির হয় জরিনাদের বাড়ি। পান খাওয়ার এক ফাঁকে সব কিছু খুলে বলে। প্রস্তাব শুনে জরিনার মা সরাসরি কিছু না বলে কথায় কথায় যা বোঝাতে চাইল তার অর্থ এই– জরিনা তার একমাত্র মেয়ে। চার ভাইয়ের আদরের বোন। না চাইতেই সে সবকিছু পেয়ে যায়। সংসারের কোনো কাজেই তার হাত লাগাতে হয় না। অন্যদিকে মজিদের আয়-উপার্জন কম। ঘাড়ের উপর তিন-চারটে সেয়ানা বোন। ওখানে গিয়ে জরিনা কখনোই সুখী হতে পারবে না।

মায়ের মুখে সব শুনে মজিদের মন খারাপ হয়। কিছুতেই ঘুম আসতে চায় না। ঘুরে ফিরে জরিনার মুখখানি ভেসে ওঠে মনের ভেতর। মজিদ নিজেকে শক্ত করতে চায়। না, হাল ছাড়লে হবে না। কিছু একটা করতে হবে। কিন্তু কী করতে হবে তা সে বুঝে উঠতে পারে না। হঠাৎ একজনের কথা মনে পড়তেই কেমন চনমনে হয়ে ওঠে। মানুষটির নাম আব্দুর রউফ। এ নাম শুধু কাগজে-কলমে। সবার কাছে সে রফ মিয়া নামেই পরিচিত। কারও কাছে রফ কাকা, কারও রফ মামা, কারও আবার রফ দাদা।

রফ মিয়া ছোটোখাটো হালকা-পাতলা গড়নের একজন মানুষ। গায়ের রং উজ্জ্বল শ্যামলা। পঞ্চাশ পেরিয়েছেন মাত্র। একজন রুচিবান মানুষ। গ্রামেও ইস্ত্রি করা প্যান্ট-শার্ট পরে এ-বাড়ি ও-বাড়ি যান। বুক পকেটে থাকে দামি কলম। পড়ালেখা বেশি দূর না থাকলেও অনেক শিক্ষিত লোক তার বন্ধু। ঢাকার একটি ব্যাবসা প্রতিষ্ঠানের ম্যানেজার। বাড়িতে আসলে এক দণ্ড বসে থাকে না। হাটবাজার, এ-বাড়ি ও-বাড়ি করেই তার আনন্দ। গ্রামের সব মানুষের সাথেই তার মধুর সম্পর্ক। যে-কোনো বাড়ির রান্নাঘর পর্যন্ত তার অবাধ যাতায়াত। যে কদিন বাড়িতে থাকে গল্পগুজব আর হাসিঠাট্টায় মাতিয়ে রাখে। তার ঠাট্টা-তামাশায় কেউ কিছু মনে করে না। সবাই ভালো করেই জানে– 'বুইড়ার মুখটা খারাপ হইলেও মনডা ভালো' এবং সকলেই তাকে মান্য করে। রফ মিয়ার সাথে মজিদের দাদা-নাতির সম্পর্ক। মজিদ ঠিক করে এই রফ মিয়াকে দিয়েই সে জরিনার মাকে রাজি করাবে।

একদিন সন্ধ্যে বেলায় রফ মিয়ার বাড়ি গিয়ে হাজির হয় মজিদ। চেয়ার পেতে উঠোনেই বসা ছিল রফ মিয়া। পাশে কয়েকটি খালি চেয়ার। মনে হয় কেউ এসেছিল, চলে গেছে। কীরে মজিদ, কী মনে কইরা আইলি; কোনো প্রয়োজন ছাড়া যে তরা এদিকে আইবি না তা ভালো কইরাই জানি। আমার বুড়ির দিকেতো আবার নজর-টজর দেস নাই। অতিথির আগমন টের পেয়ে কুলসুম এখানে এসেই দাঁড়িয়ে ছিল।

– তোমার মুখে কি কিছুই আটকায় না? এক পাওতো কবরে গিয়া রইছে তা-ও আকতা-কুকতা গেল না। ছেমড়া কী মনে কইরা আইছে হেই আলাপ করব তা-না। শুরু করছো পাঁচালি।

জোঁকের মুখে চুন পড়ার মতো চুপসে যায় রফ মিয়া। – ক মজিদ তর কথা শুনি।

মজিদ সব কিছু খুলে বলে। কিছুক্ষণ চুপ থেকে রফ মিয়া গম্ভীর গলায় বলে, কেস তো কঠিন। ফি লাগবো বেশি। এই রসিকতার মানে বুঝে উঠতে পারে না মজিদ। করুণ দৃষ্টিতে শুধু তাকিয়ে থাকল কিছুক্ষণ। এবার রফ মিয়া কণ্ঠ ভারি করার চেষ্টা করে বলে, কাজটা কইরা দিতে পারি – যদি আমারে মাইনকার দোকানের গরম গরম সেকা রুটি আর পেট ভর্তি মিষ্টি খাওয়াইতে পারস।

মজিদের বুক থেকে যেন একটা ভারী পাথর সরে গেল।

– খাইবা, দেহুমনে কত মিষ্টি খাইতে পার তুমি। আগে কাম কইরা দেও।

কয়েকদিন পর এক বিকেলে জরিনাদের বাড়ি গিয়ে হাজির হন রফ মিয়া। কইগো জরিনার মা, বাড়িতে আছ নাকি?

– কে, রফ কাকায় নাকি। আহেন, আহেন। একটা চেয়ার টেনে বসতে দেয় জরিনার মা।

কোনো ভনিতা না করে যা বলতে এসেছিল সব খুলে বলে রফ মিয়া।

– না চাচা, এ প্রস্তাবে আমরা রাজি না। আপনে তো জানেন জরিনা আমার কত আদরের। ভাইগো চোখের মণি। কোনোকিছু চাইতে দেরি পাইতে দেরি অয় নাই। ঐদিকে মজিদের বাপ নাই। ছোটো ছোটো কয়েকটা বইন। আপনেই কন, এ সংসারে যাইয়া আমার মাইয়া কি সুখী অইতে পারব? আমার মাইয়ারে আমি অনেক বড়ো জায়গায় বিয়া দিমু। এইতো কয়দিন আগে ভাগ্যকুল থিকা একটা সম্বন্ধ আইছে। ছেলে দেখতে-শুনতে ভালো। বিদেশ করছে অনেক বছর। বাড়িতে পাকা ঘর। কোনো কিছুর অভাব নাই।

হেরে যাবার পাত্র নয় রফ মিয়া। দেহো জরিনার মা, তুমি এতক্ষতু যা বললা সবই ঠিক। তবে কথা হইছে কী, ছেলে বিদেশ আছিল চৌদ্দ-পনেরো বছর। এর মধ্যে কয়ডা বিয়া করছে কে জানে। তাছাড়া ছেলের বয়সওতো অনেক বেশি। এত দূরের ভীন গ্রামের ছেলে, চাল-চরিত্র কিছুই জানো না। মজিদ আমাগো হাতের উপর মানুষ অইছে। অর সব কিছু জানি। কোনো বদ অভ্যাস নাই। বাপ-মায়ের একমাত্র পোলা। বইন কয়ডা বিয়া দিতে পারলে সহায়-সম্পত্তি সবইতো মজিদের। এই কথাটাও একটু ভাইবা দেখতে অইব। তাছাড়া অত দূরের গ্রামে মাইয়া বিয়া দিলে কি যহন-তহন দেখতে পাইবা? মজিদের লগে বিয়া অইলে মেয়ে তোমার চোখের সামনেই থাকল। মন চাইলেই মেয়ে তোমারে দেখতে আইব। তুমিও যাইতে পারবা যখন খুশি।

কথার জালে আটকে যায় জরিনার মা। সুর নরম করে বলে, ঠিক আছে, ভাইবা দেখি। তাছাড়া আমিতো মেয়ের একমাত্র গার্জিয়ান না। ওর বাপ আছে, ভাইয়েরা আছে, তাগো লগে আলাপ কইরা আপনেরে জানামু।

কয়েকদিনের মধ্যেই রফ মিয়ার ডাক পরে। জরিনার ভাই রফিক এসে বলে, দাদা, বাবায় আপনেরে সময় কইরা দেখা করতে কইছে।

রফ মিয়া জানে, মাটি নরম থাকতেই খুটা গাড়তে হয়। তাই দেরি না করে সে রফিকের সাথেই চলে যায় জরিনাদের বাড়ি। জরিনার বাবা জানিয়ে দেয় এই প্রস্তাবে তারা রাজি। তবে একটা কথা আছে ...।

– কী কথা বইলা ফ্যালান।

মজিদের মায়রে কইবেন– বউয়ের জন্য কাপড়-লতা, সুনু-পাউডার যা কিছু কিনবো হেই হগল য্যান ঢাকার থিকা কিনে।

বুঝেনইতো বিয়ার দিন কত মানুষ থাকব। এই হগল দেখব। আমাগো মুখ য্যান ছোটো না অয়।

–ঠিক আছে, ঠিক আছে। এইসব নিয়ে তোমাকে ভাবতে হইব না। আমি দেখব।

এরপর একদিন উভয় পক্ষের মুরুব্বিদের নিয়ে আসছে বৈশাখের পঁচিশ তারিখে বিয়ের দিন ধার্য করা হয়। দিন-তারিখ ঠিক হবার পর উভয় পক্ষেই তোড়জোড় পড়ে যায়। কাজতো কম না। দূর-দূরান্ত থেকে নায়রি আসবে। তাদের থাকা-খাওয়ার ব্যবস্থা। বর-কনের পোশাক-প্রসাধনী কেনা, বাড়ি বাড়ি গিয়ে দাওয়াত পৌঁছানো, কেউ একজন বাদ পড়লে পাড়াশুদ্ধ কেউ আসবে না। বড়ো কর্তার বাড়ি থেকে ডেক-ডেকচির ব্যবস্থা করা আরও কত কী!

বিয়ের মাত্র কয়েকদিন বাকি। বড়ো ধরনের তেমন কোনো কাজ বাকি নেই। তাই প্রতিদিন সন্ধ্যায় পাড়ার বয়স্ক নারীরা আসে, হাতে কাটা সেমাই বানায়, পান খায় আর বিয়ের গীত গায়।

উঠানে অপেক্ষা করছে পালকি আর বেহারাগণ। পাশেই সারি সারি মিষ্টির হাঁড়ি। মজিদও তৈরি। এমন সময় জানা গেল বোন জামাই আজগর আলী গোসা করছে। কারণ জানা গেল না। বিয়েশাদির সময় জামাইরা তাদের ওজন মাপার চেষ্টা করে– একথাও বলছে কেউ কেউ। ঘটনা যাই হোক জামাই ছাড়াতো বরযাত্রা শুরু করা যায় না। তাই অনেক বলে-কয়ে তার মান ভাঙানো হলো। দ্বিগুণ উৎসাহে আজগর আলী তখন একাই সব কাজ করতে শুরু করল। ঘর থেকে মজিদকে পালকিতে এনে বসালো। কয়েকটা ছেলে-ছোকরাকে ডেকে মিষ্টির হাঁড়িগুলো ধরিয়ে দিলো।

হ্যাজাকের আলোয় যাত্রা শুরু হলো বরের। বেহারাগণ গান গাইছে আর হেলে-দুলে হাঁটছে। পেছনে হাঁটছে জনা পঞ্চাশেক মানুষ। ছেলে-বুড়োদের জন্য আধা ঘণ্টার পথ পাড়ি দিতে সময় লেগে গেল প্রায় ঘণ্টা খানেক।

বাড়ির কাছে আসতেই থমকে দাঁড়াতে হলো বরযাত্রীদের। রঙিন কাগজ দিয়ে সাজানো কলাগাছের গেট। প্রবেশদ্বার সুতো দিয়ে বাঁধা। ছেলেমেয়েরা বরের কাছ থেকে ন্যায্য পাওনা পেলে তবেই ঢুকতে দেবে। বেশ কিছুক্ষণ দরকষাকষির পর মুরুব্বিদের মধ্যস্থতায় গেট খুলে দেওয়া হলো। আসেন, আসেন বলে বরযাত্রীদের নিয়ে বসানো হলো শামিয়ানা টাঙানো আর দস্তরখানা বিছানো বাংলা ঘরের মেঝেতে।

বর ভেতরে নিয়ে যাবার পর গল্পগুজবে মেতে ওঠে বাকিরা। তোমরা যে যাই কও কফিলদ্দির পোলা রশিদের বৌভাতে ভেড়ার মাংসের যে কোরমা খাইছিলাম আইজও তার স্বাদ মুখে লাইগ্যা রইছে। ফজলু বেপারীর কথার সাথে মোসলেমও একমত। ঠিকঐ কইছেন– কত বড়ো বড়ো জায়গায় দাওয়াত খাইলাম কিন্তু ঐরকম স্বাদ আর কিছুতেই পাইলাম না। এবার অবনী সাহা বলে ওঠে– আমিও একখান বিয়ার কথা এখনো ভুলতে পারি না। ভজন ঘোষের বড়ো পোলা মাধবের বিয়ায় ভৈরব গেছিলাম। দুই জন মানুষ গেছি। কত কী যে খাওয়াইছিল। হাওরের বড়ো বড়ো মাছ, দই-মিষ্টি যে যা পারে। আমিতো এক পাতিল দই খাইছিলাম। এসব নানান গল্পে আসর বেশ জমে উঠছিল। রতনের বইনের বিয়ের সময় গেট ধরা লইয়া কী মারামারিটাই না লাইগ্যা গেল– মন্টু সাহার কথা শেষ না হতেই দশ-বারো বছরের একটি ছেলে ঘরে ঢুকে সকলের উদ্দেশে বলে, মোনাজাত ধরেন। মোনাজাত অইতাছে। কথা বন্ধ করে সকলেই মোনাজাত ধরলেন এবং কিছুক্ষণ পর পর আমিন আমিন করতে লাগলেন।

মোনাজাত শেষ হতেই একজন এক হাতে চিলঞ্চি অন্য হাতে পানির জগ নিয়ে ঘরে ঢুকে একে একে সকলের হাত ধুয়ে গেল। এরপরই আসলো আরও দুজন। দুজনের হাতেই একটি করে বড়ো গামলা। একজন সেমাই দিয়ে যাচ্ছে অন্য জন্য বালুসা। বরযাত্রীদের একজন জিজ্ঞেস করলেন– খাওন দিতে এত দেরি অইলো ক্যান। উত্তরে জানানো হলো– দেনমোহরের দরাদরিতে দেরি অইয়া গেল। তা-তো বুঝলাম। এদিকে পোলাপান বেবাক গেছে ঘুমাইয়া।

খাবার মুখে দিতেই অপেক্ষার কষ্টটা অনেকখানি কমে গেল। খাবার খুব স্বাদ হয়েছে। কোনোকিছুর কমতি নেই। যে যা পারো খাও। তৃপ্তির সাথেই খাবার শেষ করল সবাই।

গভীর রাত। পাড়াপড়শিরা খাওয়া-দাওয়া সেরে যে যার মতো বাড়ি চলে গেছে। এতক্ষণে রফ মিয়ার কণ্ঠ শোনা গেল– কইগো জরিনার মা, রাততো শেষ হইয়া আইলো। এইবার মাইয়া বিদায় দাও। জরিনার কান্না দ্বিগুণ বেড়ে গেল। চার ভাইকে জড়িয়ে কান্নাকাটিতে আরও কিছুটা সময় পার হয়ে গেল। এবার মেয়ের খালা একরকম জোর করেই জরিনাকে এনে পালকিতে বসিয়ে দিলেন।

বেহারাগুলো এতক্ষণ বসে বসে ঝিমুচ্ছিল। এবার উঠে দাঁড়িয়ে কাঁধের উপর পালকি বসিয়ে গান শুরু করে দিলো– সখি চল যাই চল যাই বন্ধুরও দেশে। সকলে মোটামুটি প্রস্তুত ছিল। এবার তারা হাঁটা দিলো পালকির পেছন পেছন।

এভাবে মহাধুমধাম আর আনন্দ-ফুর্তির মধ্য দিয়েই এ বাড়ির বউ হয়ে এসেছিল জরিনা। আদর-যত্নের কমতি ছিল না। কিন্তু গত পাঁচ বছরেও তার কোলে কোনো সন্তান না আসায় পরিস্থিতি আর আগের মতো থাকল না। মা এখন সুযোগ পেলেই কথার খোঁচায় জরিনাকে আঘাত করে। জরিনা মুখ বুজে সব সহ্য করে। মজিদকে সে কিছুই জানায় না।

মজিদের মা ছেলেকে বুঝায়– বাবা মজিদ, তুই আবার বিয়া কর। অহনও তর বিয়ার বয়স পার অয় নাই। তুই রাজি থাকলে আমরা মাইয়া দেহি। মজিদও মাকে বুঝাবার চেষ্টা করে– মা, পোলাপান অইল আল্লার দান। আল্লায় না দিলে জোর কইরা পাওন যায় না। তাছাড়া এই যে, আমাগো পুলাপান অয় না এইডার জন্য কি খালি জরিনাই দায়ী? আমারওতো দোষ থাকতে পারে। চেষ্টাতো কম করতাছি না।

আমিওতো ঐ কতাই কই। চেষ্টাতো কম করলি না। যে যা কইলো তাই করলি। যে যেইখানে যাইতে কইলো হেইখানেই গেলি। কোনো কাম অইলো। তর বউ অইলো বাঞ্জা মাইয়া। ডাক্তার-কবিরাজ বাইট্টা খাওয়াইলেও কাম অইবো না।

মজিদ আগেই মাকে জানাতে চাইছিল না। কিন্তু মাকে শান্ত করতে সে বলল, আমি একজন ভালো কবিরাজের খোঁজ পাইছি। মানিকগঞ্জের হরিরামপুরে। কোনো টাকা-পয়সা লাগে না। অনেকেই ফল পাইছে।

এবার তেলে-বেগুনে জ্বলে উঠল মজিদের মা– তর যা ইচ্ছা তাই কর। আমারে আর জিগাইতে আহিস না। আমার কথা যদি মানতি তাইলেতো আমার বইনের মাইয়া শেফালিরেই ঘরে আনতি। কত নিয়ারা করল, তুই কিছুতেই রাজি অইলি না। এক রূপ দেইখ্যাই সব ভুইলা গেলি। যা, অহন রূপ ধুইয়া পানি খা।

মা যাই বলুক শেষ চেষ্টা সে করবেই। মজিদ দিনক্ষণ ঠিক করে যাবার সব ব্যবস্থা সেরে ফেলে। প্রথমে নৌকা করে শ্রীনগর লঞ্চ ঘাট। লঞ্চে করে নবাবগঞ্জ। নবাবগঞ্জ থেকে আবার নৌকা করে হরিরামপুর– কবিরাজ বাড়ি।

কবিরাজের কথামতোই চলছিল মজিদ জরিনার দিন। নিয়মকানুন যা যা বলে দিয়েছিল তার কিছুই বাদ পরেনি এই দেড় মাসে। পঞ্জিকা দেখে খাওয়া, পঞ্জিকা দেখে গোসল –এভাবেই চলছিল ওদের জীবন।

আজকাল জরিনার মধ্যে কিছু পরিবর্তন লক্ষ করছে মজিদ। আগের মতো সেই কর্মচাঞ্চল্য নেই, হাঁটাচলার গতিও নেই আগের মতো। খাওয়া-দাওয়ার প্রতি আগ্রহও কমে গেছে খানিকটা।

জরিনা, তোমার কি শরীল খারাপ করছে? মজিদ জানতে চায়।

– না, আমিতো ভালোই আছি। তয় শরীলডা একটু ভারী ভারী লাগে।

এতদিন মা-চাচিদের আলাপ-আলোচনা শুনে শুনে মজিদের মধ্যে যে অভিজ্ঞতার জন্ম হয়েছে তাতে সে বুঝতে পারে কবিরাজের ঔষধ কাজে লেগেছে। দেরি না করে মাকে সব খুলে বলে মজিদ। চার সন্তান জন্ম দেওয়া প্রৌঢ়া মুহূর্তেই সব বুঝে নিলো। উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে বলে উঠলো– আল্লাহ এইবার আমাগো দিকে মুখ তুইল্যা তাকাইছে! তুই বাপ হবি। আরেকটু নিশ্চিত হবার জন্য সে বলে, তাড়াতাড়ি সাহেলার মায়রে ডাইকা নিয়া আয়।

সাহেলার মা এ অঞ্চলের নাম করা ধাত্রী। ষাট ছুঁই ছুঁই বয়স। এ কাজে তার কোনো ট্রেনিং না থাকলেও হাত যশ খুবই ভালো। তাই পোয়াতিরা পাস দেওয়া ডাক্তারের চেয়েও সাহেলার মাকেই ভরসা করে বেশি।

সাহেলার মা এসে সব কিছু দেখে-শুনে মজিদের মায়ের উদ্দেশে বলে উঠলো– মিষ্টি খাওয়া মজিদের মা, মিষ্টি খাওয়া। তর বউতো পোয়াতি অইছে। তুই দাদি হবি।

খুশিতে খইয়ের মতো ফুটছে যেন মজিদের মা। ছেলের দিকে তাকিয়ে বলে, ভোন্দার মতন খাড়ায় রইছস ক্যান। তাড়াতাড়ি বাজারে যা, মিষ্টি লইয়া আয়।

মিষ্টি খাইয়ে সাহেলার মাকে বিদায় দিতে দিতে মজিদের মা বলে দিলো– মাসে মাসে আইসা কিন্তু দেইখা যাইবা।

একবার করে সাহেলার মা প্রতি মাসে দেখে যায় জরিনাকে। পান খায়, গল্প করে আর যাবার সময় হাতে করে নিয়ে যায় পাঁচ টাকার একটি নোট। এ কাজে তার কোনো চাওয়া নেই। খুশি হয়ে যে যা দেয় তাতেই সে খুশি।

ছড়ি ঘরের বিছানার চাদর খামচে ধরে কাতরাচ্ছে জরিনা। দু'জন বয়স্ক নারী তাকে সাহস দেওয়ার চেষ্টা করে যাচ্ছে– আল্লারে ডাক, সব ঠিক অইয়া যাইব। কৌতুহলী ছেলেপুলেদের ভিড় ঠেলে হন্তদন্ত হয়ে ঘরে ঢুকে সাহেলার মা। কই দেখি, আমারে দেখতে দেও। বেশিক্ষণ দেখতে হলো না। নবজাতকের চিৎকারে সকলের উৎকণ্ঠা কেটে গেল। ঘরের ভেতর থেকে উঠোনের দিকে মুখ করে কেউ একজন বলে উঠলো– পোলা অইছে গো পোলা, একেবারে চান্দের নাহাল পোলা।

চান্দের নাহাল পোলার নাম রাখা হয়েছে চান। এবার দশ মাসে পড়েছে। হামাগুড়ি দেয়, কিছু একটা ধরে দাঁড়াতেও পারে। ছেলেকে বুকের উপর দাঁড় করিয়ে খেলা করছিল মজিদ। এ সময় গলা খাঁকারি দিয়ে ঘরে ঢুকে ফজর আলী।

ফজর আলীকে দেখে উঠে বসে মজিদ। একটি জলচৌকি এগিয়ে দিয়ে বলে– বহ চাচা। ফজর আলী বসতে বসতে বলে, তরে একটা কথা কইতে আইলাম।

–কও, কী কইবা।

ফজর আলী কপালে চিন্তার ভাঁজ ফেলে বলতে থাকে– পানির ভাবগতি খেল করছস। কেমুন কইরা বাইড়া চলছে। আইজ যেই জায়গা দেহি হুগনা, কাইল সকালে দেহি পানির তলে। আমার মনে অয় এইবার বন্যা অইব। একটু দম নিয়ে আবার বলতে থাকে– এক কাম কর। ঘরের ভেতর একটা মাচা বানাইয়া ফালা। ঘরের ভেতর পানি ঢুকলে বউ আর বাচ্চাডারে মাচার উপরে দিয়া তুই থাকবি এই চৌকির উপর। দেরি করিস না। পানি কিন্তু পিড়া ছুঁই ছুঁই করছে।

ফজর আলী অভিজ্ঞ মানুষ। দেশভাগ, দাঙ্গা-দুর্ভিক্ষ, ক্ষরা-বন্যা এসব দেখতে দেখতে বিরাশি বছর পার করে দিয়েছে। তার অনুমান খুব একটা হেরফের হয় না। তাই সময় নষ্ট না করে মাচার কাজে হাত লাগায় মজিদ।

সচিত্র বাংলাদেশ এখন
ফেসবুকে

ভিজিট করুন
www.facebook.com/sachitrabangladesh/

হেমন্ত

অদ্বৈত মারুত

হেমন্তে দুধকুয়াশা গাঢ় সবুজ অথবা নীল
অথৈ নির্জন অন্ধকার সুদীর্ঘ গভীর সুবিল
অথবা আরও সুউচ্চ পাহাড়ের প্রবল ঢেউ
হেমন্ত আসলে আমি বা আমার জন্য কেউ।

আসলেই ঘাসবুকে এই চুপ হয়ে কাছে থাকা
ডেকে নিয়ে বুকে জড়িয়ে কাছেই ধরে রাখা
সরল সংসারে শান্তিপূর্ণ ভোগ বলকে আসে
আহা, হৃদয়ে ঢুকেই শক্ত হয়ে রয় বামপাশে।

ডানার ভেতরে আগুন জ্বেলে পোহায় শরীর
শুয়ে থেকে ঘোর অধর উষ্ণতায় কী অস্থির
বীজ বুনে জলে আঁকে স্মৃতিময় মুহূর্তের সুখ
ঘাস দুলতে থাকে– নদীজলে ঢেউ তুলে মুখ।

এতটুকু হিম কাঁপন ছড়িয়ে দেহে প্রবল অসীম
না থামা উত্তরের ঘোর হৃদয়ে ঢুকিয়ে আফিম।
আমাদের এমন সরল যাপন শীত সংসারে আসে
আমাদের জীবনে সুখটুকু শিশির হয়ে ভাসে।

সবুজে-শ্যামলে মাখা মায়াবী এ দুর্গ

কামাল হোসাইন

সোনাধান মাঠে মাঠে দোল খায় আয়েশে
তদারকি করে যায় শালিকের মা এসে।
ঝরে যদি শীষ থেকে, মজা হবে খুব তো
কুয়াশায় চারিধার সুনসান চুপ তো!

চাষিদের মুখে হাসি, ধান নিয়ে ব্যস্ত
নিকোতে উঠোন তাই চাষিবউ ন্যস্ত।
নুয়ে পড়া গোলাটাকে বেঁধেছেদে নিচ্ছে
শুরু হবে ধান এলে জারি-সারি কিচ্ছে।

পিঠাপুলি-পায়েসের মউ মউ গন্ধে–
কেটে যাবে কিছুদিন অবিরাম ছন্দে।
পাখিদের আনাগোনা, কী দারুণ সুর গো
সবুজে-শ্যামলে মাখা মায়াবী এ দুর্গ!

শিশুদের কোলাহল বেড়ে যায় নিত্য
সোনাধানে শান্ত যে সকলের চিত্ত।
হেমন্তে ভরপুর এ রকম দৃশ্যে–
এমন মধুর ছবি দেখি আর বিশ্বে?

হেমন্তে মাঠ উঠলো হেসে

মিলন সব্যসাচী

হেমন্তে মাঠ উঠলো হেসে পাকা ধানের ঘ্রাণে
কিষান বধূর মধুর হাসি পুলক জাগায় প্রাণে
কাস্তে হাতে ছুটছে কিষান দূরের ধু-ধু মাঠে
ভোরবিহানেই মুগ্ধ মুখর হেমন্তের এই পাঠে।

আজকে এ কোন খুশির তুফান উঠলো সারা গাঁয়ে
রুম ঝুমা ঝুম খেলনা নূপুর খুকুর রাঙা পা'য়ে
ঘাসফুলের তার নাকের নোলক হাওয়ায় ওঠে দুলে
চড়ুইভাতি খেলায় বিভোর আজ আনন্দ স্কুলে।

নবান্নে আজ ধুম পড়েছে পিঠা-পুলির মেলা
গুল্মলতার ঘর সাজিয়ে পল্লি-বালার খেলা
আমি গাঁয়ের শান্ত বালক কালের কিশোর কবি
গান-কবিতার নতুন ছন্দে আঁকতে পারি ছবি।

ভালোবাসার রংতুলিতে মায়ের ছবি আঁকি
মা মানে তো সুখের স্বর্গ মাকেই কাছে ডাকি
মুক্ত-মাঠের বাউল বাতাস লালন গানের সুরে
হাতছানিতে আমায় ডাকে স্বপ্নের সিসিমপুরে।

কোথায় কখন পাখির মেলা আমার আছে জানা
আজকে হবো বাঁধনহারা শুনবো না আর মানা
মেঠোপথে আমি না হয় পথ হারাবো শেষে
অমন করে কেউ কী হারায় ধানশালিকের দেশে?

তবুও যদি যাই হারিয়ে কুমার নদের তীরে
খড়ের গম্বুজ খুঁজে পেলেই নিজকে পাবো ফিরে
ধানের দেশে গানের দেশে রাখাল রাজা আমি
পাতার বাঁশি থেমে গেলেই পথটি চলা থামি।

কুমার নদের সরু পাড়েই আমার ছোট্ট বাড়ি
ডুব-সাঁতারে নীরব নদী নিত্য জমাই পাড়ি
যদি গো মা পথটি হারাই হাজার নদীর বাঁকে
আমায় তুমি খুঁজে পাবে বুনো পাখির ঝাঁকে।

আকাঙ্ক্ষার জলশয্যা

রনি অধিকারী

অবিনাশী কিংবদন্তি নিদ্রা মাখা চোখে
গেঁথে আছে ক্রমাগত অবহেলা শোকে।
চোখের সে পাতাজুড়ে জল জমে থাকে
অন্ধকার বৃষ্টিময় জীবনের বাঁকে।

শেষাবধি জলমগ্ন শিথিলতা প্রায়
আকাঙ্ক্ষার জলশয্যা একান্ত সহায়।

অনাবিল সেই সব দিনগুলো কাঁদে
অহর্নিশ জেগে থাকি এক স্বপ্নস্বাদে।

একদিন তার চোখে

কামাল বারি

হেমন্ত-শিশির জমে আছে– তার চোখের বিস্ময়!
চোখে ঠান্ডা রোদ মেখে দূর থেকে শুধু দেখে গেছে–
কথা হয়নি কোনও– ঐ বয়ে যায় অন্য নদী;
নবান্ন শস্যের ঘ্রাণ তার কাছেই শিখেছি আমি।

তার ঐ অপরূপ হাসিমুখ মগ্ন করে যায়
অদ্ভুত নিবিষ্টতার অশেষ রেখে যায় ঋতুতে
অপার মোহময়তা– সুরেলা রোদ কপালে তার।
অনিবার মুগ্ধতার অবকাশ দিয়েছে আমার।

মত্ত পৃথিবীর এই আলো এই গুচ্ছ চারুলতা
নীলে, অয়ি নক্ষত্রেরা যত আনন্দবিভায় জ্বলে।
তারচে অধিক লীলা এই গ্রহের বিস্ময়কর
আয়োজন! জেগে থাকে রক্তে মাংসে সমুদ্র লাবণ্য।

উপকূলে শতরূপা আলোর খেলায় মাতোয়ারা–
প্রাণীর শরীর শস্যে শিষে উপচে থাকে মাটিতে–
জীবনের ঘ্রাণে বুঁদ– চোখ মুদে থাকে কেউ কেউ;
সুগভীর প্রেরণার সুধারস শস্যে ঘাসে জমে;
রং নিয়ে মাটিতে জমে উদ্‌গত জীবনের সংগীত–
একদিন তার চোখে হেমন্ত শস্য রং ছড়িয়েছে।

পাকা ধানের মিষ্টি ঘ্রাণ

মো. তাইফুর রহমান

পাগল আমি নতুন ধানের
মিষ্টি মধুর ঘ্রাণে
কৃষক ভাইয়ের হাসি দেখে
দোলা লাগে প্রাণে।
নতুন ধানের পিঠা-পুলি
চলে ঘরে ঘরে
খোকা-খুকু মহাখুশি
খুব আনন্দ করে।
কৃষানিও ব্যস্ত কাজে
স্বপ্ন ভরা বুকে
সোনার ধানের ছোঁয়া পেয়ে
মন ভরে যায় সুখে।
পাকা ধানের মিষ্টি ঘ্রাণ
চারদিকে ভাসে
নতুন ধানের আয়োজনটা
সবাই ভালোবাসে।
ধানের বোঝা উঠোনেতে
দারুণ উৎসব চলে
কৃষক ভাইয়ের বাড়ি যেন
শান্তির আলো জ্বলে।

বিবাগী অগ্রহায়ণ

প্রজীৎ ঘোষ

বিবাগী অগ্রহায়ণ!
শুভ্র ধোঁয়াশার মায়াজালে জড়ানো
বিস্তীর্ণ সবুজ শ্যামল মেঠো পথ।
প্রভাত ও অপরাহ্ণে মায়াবী চোখে
ধূসর স্বপ্নজাল বোনে মায়াচাঁদ।
পঞ্চমী তিথির উষ্ণ আকাশে
জোছনার কার্নিশ গলিয়ে দীপ্তিময় উচ্ছলতায়
সোনারং ধানে ভরে যায় চাষির স্বপ্নের গোলা ।

প্রিয়ার হলুদ শাড়ির মতন
অশ্বত্থ বৃক্ষের একাধিক পত্রপল্লব
জীর্ণতা ধুয়ে দিতে চায় হৈমন্তি শিশির!
এ যেন নিয়তির মায়াকাজল পরা
হিম শীতল প্রকৃতির আড়ষ্ট চোখে।

ভাপা আর চিতইয়ের গন্ধ ভেসে আসে
প্রিয়ার যতনে গড়ানো পোড়া মাটির ছাঁচ থেকে
শুভ্র ধোঁয়ার আলিঙ্গনে ব্যস্ত উৎসুক জনতা
হৈমন্তি, প্রিয়ার হাসি মুখের জানালা খোলে
যখন ভাপা আর চিতই হাত বদল হয়ে
রূপান্তর হয় স্বপ্ন নামক কড়িতে।

শীত

আবুল কালাম আজাদ

ঘন কুয়াশার চাদর
টুপটাপ পাতা ঝরার গান
স্তব্ধ পুকুরের জল
শিরিশের পত্রহীন ডালে বিষণ্ন পাখি
প্রকৃতি নির্জীব
রাতে শিশিরপাতের শব্দই
একমাত্র সংগীত
সকালে পাতায় পাতায়, ঘাসের ডগায়
মুক্তোদানা রোদে ঝিকমিক।
কিন্তু প্রকৃতি প্রকৃতই কি নির্জীব?
ভেতরে তার তুমুল সজীবতা
নিজেকে সাজাবার সংগোপন প্রয়াস নিরবধি
বসন্ত আসবেই
ফুল ফুটবেই
পাখি গাইবেই
প্রেমিক-প্রেমিকারা আনন্দ হিল্লোলে মাতবেই।

একটি ঋতু শীত

মুহাম্মদ ইসমাঈল

বারো মাসে ছয়টি ঋতু
একটি ঋতু শীত
একেক ঋতু একেক ঢঙ্গে
গাইতো নানান গীত।

কেউবা গাইতো বর্ষা নিয়ে
বর্ষার নানান রূপ
কারও কাছে বর্ষা
হয় যে অপরূপ।

কেউবা গাইতো শরৎ নিয়ে
শরৎ রানি সাদা
রোদ-বৃষ্টির লুকোচুরিতে
কখনো হয় না কাদা।

হেমন্তকে নিয়ে আমার
ভাবার কিছু নেই
নানারকম পিঠা-পুলি
আগের মতো নেই।

বসন্তকে কী বলবো
সে তো ঋতুর রাজা
কী করে দোষ ধরবো
আমরা তারই প্রজা।

শীত যে আমার
অতি প্রিয়
অতি প্রিয় আজ
শীতের মাঝে
ভালো লাগে
নানান রকম সাজ।

অবগত সুখ

এস এম তিতুমীর

কবেকার সেই দূর অন্ধকার,ছিলাম না কেউ
অনুক্রমের পরিখা খোঁড়া কালো কালো খাঁজে
সুদূরের অনাবিল চোখ এসে দিয়ে গেল দ্যাখা
নিঃসরণের গূঢ়তায় যেন ফুটে উঠে আলোর মুকুল
জঠরের জড়তা আকাশ নিচে নেমে আসে
প্রাণের ভিতর প্রাণ কে যেন বিলাই। কে যেন
বাসা বাঁধে স্বপ্নের মতো কচি হাত-পায়ে

তুমি সুখ ভালোবাসো, তাই শালিক জোড়া
আমাদের দিকেই তাকাই। অবনত চোখ
চোখের ভেতর চোখ রেখে চোখের পাতারা দাঁড়ায়
আসমুদ্র বিষণ্ন বিকেলের কোলে ঝিনুক দোলে
মুক্তোর মতো এক টুকরো সুখ, অখণ্ড তুমি

নিদেনকালের ঘাসফুল সে কতটা দামি
তা কেবল জানি, তুমি আর আমি।

দুটি কবিতা

সুফি মোশারফ

পাথর দিনরাত

অবাধে বুক চষে বেড়াচ্ছে বুলডোজার,
দেবদাসীরা এসে ভিড় জমায়;
তবুও নির্ঘুম; কাটে না প্রহর আমার!
ক্লান্তির সাথে কতক্ষণ আর পারা যায়?
তাই ব্যান্ড সংগীতের গোলাবারুদ গড়েছি সখি;
অথচ তোমরা ঘুমাচ্ছ নিস্তল,
শ্রাবস্তীর নির্জন পথে রথারোহিণী হয়ে
দেবতাদের কামকেলীর উপাচার বিলাও।
ভাসে না চোখে বোনের বিক্ষত যৌনাঙ্গ
রণাঙ্গনের সাবলীল সূত্র খুন আর খুন
বনে-বাদাড়ে শকুনীদের আড্ডার মাঝে
ছড়িয়ে থাকা নিতম্ব, শাড়ির আঁচল!
ভুলে আছো! ভুলে গেছো! কী করে পারো?
চোখ খোলো: খুঁজে দেখি
পেলেও পেতে পারি–
আধুলির পাগলিনী ফুলমতির মাথার খুলি।

জীবন এখন

কন্দ গঞ্জনায় দুষ্ট হয়ে
আজও বেঁচে আছি–
সাদা গাংচিল
আর চোখে পড়ে না,
সুতানুকা নিরুদ্দেশ,
লুণ্ঠিত হয়ে গেছে
কোটি বর্ষের ইমারত
দু'যুগ প্রায়;
সীমাহীন কালোরাত
অসীমের গান গায়
দিনরাত,
তবুও বেঁচে আছি অনির্বাদ।
চৌচির ভাঙা কাচ
আবছায়া কালোহাত
কুড়ে খায়,
এখনও বেঁচে আছি
বুকের কাছে
ঢিপঢিপ শব্দ নিয়ে
বিজন দ্বীপে
ধর্মে লালিত
কুখ্যাত দুর্গের মাঝে।

রাষ্ট্রপতি মোঃ সাহাবুদ্দিন ৫ই অক্টোবর ২০২৩ ঢাকায় ওসমানী স্মৃতি মিলনায়তনে 'বিশ্ব শিক্ষক দিবস ২০২৩' উদ্‌যাপন অনুষ্ঠানে ভাষণ দেন– পিআইডি

রমরমা কোচিং বাণিজ্য বন্ধের নির্দেশ

শিক্ষকদের কোচিং বাণিজ্য বন্ধের আহ্বান জানিয়েছেন রাষ্ট্রপতি মোঃ সাহাবুদ্দিন। তিনি বলেন, শিক্ষকদের মধ্যে কেউ কেউ কোচিংয়ের রমরমা ব্যাবসা করে যাচ্ছেন। যেটা শিক্ষার্থীদের নৈতিকতার শিক্ষা থেকে কিছুটা দূরে সরিয়ে দিচ্ছে। আপনাদের এ কোচিং ব্যাবসা পরিহার করতে হবে। ৫ই অক্টোবর বিশ্ব শিক্ষক দিবস উপলক্ষে আয়োজিত আলোচনাসভায় প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি এসব কথা বলেন। রাজধানীর ওসমানী স্মৃতি মিলনায়তনে শিক্ষা মন্ত্রণালয় এ অনুষ্ঠানের আয়োজন করে।

অভিভাবকদেরও সন্তানকে কোচিংয়ে দেওয়ার আগ্রহ কমাতে হবে উল্লেখ করে রাষ্ট্রপতি বলেন, শুধু জিপিএ-৫ পাওয়ার জন্য অভিভাবকরা তাড়াহুড়ো করে সন্তানকে একটা ভালো কোচিংয়ে দেন। তারা মনে করেন যে, এ কোচিংয়ের মাধ্যমে তাদের সন্তানকে গুণগত বা ভালো শিক্ষা দিতে পারব। কিন্তু ঘটছে উল্টো। এ মানসিকতা থেকে সরে আসতে হবে। তিনি বলেন, আমাদের যে অভিভাবকরা জিপিএ-৫ পেলে খুশিতে আত্মহারা হয়ে যান, আপনারা যদি মনে করেন সন্তানকে নৈতিক শিক্ষায় শিক্ষিত করতে হবে, বাস্তব শিক্ষায় শিক্ষিত করতে হবে, তাহলে এ ধরনের কোচিংয়ে পড়ানোর অবস্থান থেকে নিজেদের সরিয়ে নেওয়ার চেষ্টা করবেন। শিক্ষকদের কাছেও আমার আহ্বান থাকল কোচিং ব্যাবসা পরিহার করুন।

সমাজের ভিত্তি নির্মাণে শিক্ষকরাই মূল প্রকৌশলী উল্লেখ করে মোঃ সাহাবুদ্দিন বলেন, পৃথিবীর যত উল্লেখযোগ্য অর্জন, গুরুত্বপূর্ণ আবিষ্কার, আধুনিক সভ্যতা গঠন সবকিছুর পেছনে কোনো কোনো শিক্ষক প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ ভূমিকা রেখে চলেছেন। শিক্ষকরা শুধু শিক্ষার্থীদের একাডেমিক দিকটাই দেখেন না, মানবিক মূল্যবোধ, সততা, দেশপ্রেমবোধ সৃষ্টিতে ভূমিকা রাখেন। সমাজ গঠন ও সমাজের ভিত্তি নির্মাণে শিক্ষকরাই মূল প্রকৌশলী। শিক্ষার্থীকে সত্য-মিথ্যার পার্থক্য শেখাতে শিক্ষকদের প্রতি আহ্বান জানিয়ে রাষ্ট্রপ্রধান বলেন, আপনারা কোমলমতি শিক্ষার্থীদের ন্যায়-অন্যায়, সত্য-মিথ্যার পার্থক্য বোঝাবেন। মানবসেবা, দেশপ্রেম ও পিতা-মাতার প্রতি যত্নশীল হওয়ার শিক্ষা দেবেন। শিক্ষার্থীদের সঙ্গে পিতা-মাতাতুল্য আচরণ করবেন। শাসনও করবেন। কিন্তু যেটা শাস্তির পর্যায়ে পড়ে, সেটা পরিহার করবেন।

শিক্ষকদের মর্যাদার কথা উল্লেখ করে তিনি বলেন, শিক্ষা জাতির মেরুদণ্ড। শিক্ষকরা হলেন শিক্ষিতসমাজের বিবেক। জাতি গঠনের এ কারিগররা অক্লান্ত পরিশ্রম ও পরম যত্নে জ্ঞান বিতরণের মাধ্যমে বুদ্ধিবৃত্তিক ও নৈতিক সমাজ গঠনে কাজ করে যাচ্ছেন। আমাদের সমাজব্যবস্থায় শিক্ষকতা এখনও অন্য যে-কোনো পেশার তুলনায় অনেক উর্ধ্বে। তারপরও আজকাল সামাজিক যে অবক্ষয় ঘটেছে, তাতে শিক্ষকদের অমর্যাদা ও অসম্মানিত হতে হচ্ছে। যেটা অত্যন্ত কষ্টের, দুঃখের।

রাষ্ট্রপতি আরও বলেন, একটা সময় ছিল যখন রাস্তায় যদি আমরা শিক্ষককে দেখতাম, মূল রাস্তা থেকে ছোটো গলির রাস্তায় দৌড়ে পালানোর চেষ্টা করতাম। শ্রদ্ধা করে এটা করতাম। আজকাল যেটা দেখি– শিক্ষক সামনে আসছেন, তার সামনেই শিক্ষার্থী সিগারেট টানতে টানতে চলে যাচ্ছে। কোনোরকম সম্মান বোধটাও থাকছে না।

শিক্ষকদের মর্যাদা ফেরাতে সামাজিক আন্দোলন গড়ে তোলার আহ্বান জানিয়ে রাষ্ট্রপতি বলেন, অভিভাবক, সমাজের নেতৃস্থানীয়

ব্যক্তিসহ সবাই মিলে যদি এ অবস্থা থেকে উত্তরণের জন্য কাজ করেন, তাহলে আমাদের শিক্ষকদের সেই মান-মর্যাদা ফিরে আসবে। তারা আর দুঃখবোধ করবেন না। মনে মনে ভাববেন না যে, এমন ছাত্রছাত্রীকে পড়ালাম, মানুষ করার চেষ্টা করলাম, তাদের দ্বারা অসম্মানিত হচ্ছি। শিক্ষকদের এ দুঃখদুর্দশা নজরে নিয়ে সবাইকে এ অবস্থা থেকে উত্তরণের চেষ্টা করতে হবে।

শিক্ষামন্ত্রী ডা. দীপু মনির সভাপতিত্বে আলোচনাসভায় বিশেষ অতিথি ছিলেন প্রাথমিক ও গণশিক্ষা প্রতিমন্ত্রী মো. জাকির হোসেন এবং শিক্ষা উপমন্ত্রী মহিবুল হাসান চৌধুরী নওফেল। অনুষ্ঠানে শিক্ষাসংশ্লিষ্ট বিভিন্ন দপ্তরের প্রধান ও উর্ধ্বতন কর্মকর্তা এবং শিক্ষকরা অংশ নেন।

ঐক্য সৃষ্টিতে ভূমিকা পালন করে দুর্গাপূজা

রাষ্ট্রপতি মোঃ সাহাবুদ্দিন বলেন, ধর্মীয় উৎসবের পাশাপাশি দুর্গাপূজা দেশের জনগণের মাঝে পারস্পরিক সহমর্মিতা ও ঐক্য সৃষ্টিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। ২০শে অক্টোবর থেকে পাঁচ দিনব্যাপী শারদীয় দুর্গাপূজা উপলক্ষে দেওয়া এক বাণীতে এ কথা বলেন তিনি।

রাষ্ট্রপতি বলেন, হিন্দু সম্প্রদায়ের প্রধান ধর্মীয় উৎসব দুর্গাপূজা। দুর্গাপূজার সঙ্গে মিশে আছে চিরায়ত বাংলার ঐতিহ্য ও সংস্কৃতি। আবহমানকাল ধরে এদেশের হিন্দু সম্প্রদায় বিপুল উৎসাহ-উদ্দীপনা ও উৎসবমুখর পরিবেশে দুর্গাপূজা উদ্‌যাপন করে আসছে। দুর্গাপূজা ধর্মীয় উৎসবের পাশাপাশি সামাজিক উৎসবও। এ উপলক্ষে সমাজের সব স্তরের মানুষ, আত্মীয়স্বজন, বন্ধুবান্ধব, পরিবার-পরিজন, পাড়াপ্রতিবেশী নিয়ে একত্র হন, মিলিত হন আনন্দ-উৎসবে। তাই এ উৎসব সর্বজনীন। এ সর্বজনীনতা প্রমাণ করে ধর্ম যার যার, উৎসব সবার।

ধর্ম মানুষকে ন্যায় ও কল্যাণের পথে আহ্বান করে উল্লেখ করে রাষ্ট্রপ্রধান বলেন, মানবতা সব ধর্মের শাশ্বত বাণী। ধর্মীয় অনুশাসন মেনে চলার পাশাপাশি আমাদের মানবতার কল্যাণে এগিয়ে আসতে হবে। করোনা মহামারি ও রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধসহ বিভিন্ন সংকটের কারণে বিশ্ব অর্থনীতিতে নেতিবাচক প্রভাব পড়েছে। বিশ্বব্যাপী দেখা দিয়েছে মূল্যস্ফীতি। ফলে নিম্ন আয়ের অনেক মানুষ নানা সীমাবদ্ধতার মাঝে দিনাতিপাত করছে। আমি সমাজের দুস্থ ও অসহায় মানুষের পাশে দাঁড়ানোর জন্য ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে সবার প্রতি আহ্বান জানাচ্ছি। তিনি বলেন, সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি বাঙালির চিরকালীন ঐতিহ্য। সম্মিলিতভাবে এ ঐতিহ্যকে এগিয়ে নিতে হবে আমাদের সামগ্রিক অগ্রযাত্রায়। আবহমান বাঙালি সংস্কৃতিতে ঋদ্ধ অসাম্প্রদায়িক চেতনা, পারস্পরিক ঐক্য, সৌহার্দ্য ও সম্প্রীতি বঙ্গবন্ধুর স্বপ্নের 'সোনার বাংলা' ও প্রধানমন্ত্রী ঘোষিত 'স্মার্ট বাংলাদেশ' গঠনে কার্যকর অবদান রাখবে বলে আমার বিশ্বাস। বিশ্বে মানুষ ও মানবতার জয় হোক– এ প্রত্যাশা করি। এসময় রাষ্ট্রপতি আরও বলেন, শারদীয় দুর্গোৎসব সত্য-সুন্দরের আলোকে ভাস্বর হয়ে উঠুক। ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে সবার মধ্যে সম্প্রীতি ও সৌহার্দ্যের বন্ধন আরও সুসংহত হোক– এ কামনা করি।

সড়ক দুর্ঘটনারোধে আইন ও বিধিনিষেধ মেনে চলতে হবে

সড়ককে নিরাপদ রাখতে সকলের সচেতনতা বৃদ্ধি, আইনের যথাযথ প্রয়োগ, সরকার ও সংশ্লিষ্ট সকলের প্রচেষ্টা অব্যাহত থাকবে বলে আশাবাদ ব্যক্ত করেন রাষ্ট্রপতি মোঃ সাহাবুদ্দিন। তিনি বলেন, সড়কে দুর্ঘটনারোধে সরকারের গৃহীত নানামুখী পদক্ষেপের পাশাপাশি মালিক, শ্রমিক, যাত্রী, পথচারী ও সংশ্লিষ্ট সকলের আইন ও বিধিনিষেধ জানা ও সেগুলো মেনে চলতে হবে। ২২শে অক্টোবর জাতীয় নিরাপদ সড়ক দিবস উপলক্ষে দেওয়া এক বাণীতে তিনি এ আশাবাদ ব্যক্ত করেন। নিরাপদ সড়ক দিবসের এবারের প্রতিপাদ্য হলো– 'আইন মেনে সড়কে চলি, স্মার্ট বাংলাদেশ গড়ে তুলি।'

রাষ্ট্রপতি বলেন, টেকসই উন্নয়ন ও স্মার্ট বাংলাদেশ বিনির্মাণে উন্নত পরিবহণ ব্যবস্থার বিকল্প নেই। তাই উন্নত ও দক্ষ যোগাযোগ ব্যবস্থা গড়ে তুলতে সরকারের গৃহীত নানামুখী উদ্যোগ পরিবহণ খাতে এক নতুন দিগন্ত উন্মোচন করেছে। দেশব্যাপী গড়ে তোলা হয়েছে বিস্তৃত যোগাযোগ নেটওয়ার্ক। 'প্রেক্ষিত পরিকল্পনা– ২০৪১' অনুযায়ী ২০৩০ সালের মধ্যে দেশের সব মহাসড়ক ছয় লেন এবং ২০৪১ সালের মধ্যে আট লেনে উন্নীতকরণের পরিকল্পনা হাতে নেওয়া হয়েছে। বাংলাদেশে সম্প্রতি মেট্রোরেল ও এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়ে চালু হয়েছে। কর্ণফুলীর বুক চিরে তৈরি করা হয়েছে বঙ্গবন্ধু টানেল। পদ্মা সেতু চালুর মাধ্যমে পরিবর্তন ঘটেছে দক্ষিণাঞ্চলের আর্থসামাজিক অবস্থার।

প্রতিবেদন: মিতা খান

প্রধানমন্ত্রী : বিশেষ প্রতিবেদন

দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার বৃহত্তম সার কারখানা উদ্বোধন

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ১২ই নভেম্বর নরসিংদীতে নবনির্মিত ঘোড়াশাল-পলাশ ইউরিয়া সার কারখানা (জিপিইউএফএফ) উদ্বোধন করেন। এটি দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় এ ধরনের বৃহত্তম কারখানা। এটি সার আমদানি উল্লেখযোগ্যভাবে হ্রাস করতে সহায়তা করবে। তিনি পলাশ উপজেলায় জিপিইউএফএফ প্রাঙ্গণে এক অনুষ্ঠানে উদ্বোধনী ফলক উন্মোচনের মাধ্যমে বার্ষিক ৯ লাখ ২৪ হাজার মেট্রিক টন সার উৎপাদনের ক্ষমতা সম্পন্ন পরিবেশবান্ধব, জ্বালানি সাশ্রয়ী ও আধুনিক প্রযুক্তিভিত্তিক এই কারখানার উদ্বোধন করেন।

তিন দশকের পুরানো কারখানাটি সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার জন্য নতুন করে অত্যাধুনিক প্রযুক্তি স্থাপন এবং প্রকল্পের শুরু থেকেই বিদেশি বিশেষজ্ঞদের দ্বারা যথাযথ প্রশিক্ষণের মাধ্যমে দক্ষ জনবল প্রস্তুত করা হয়েছে। পরিবহণ সুবিধার লক্ষ্যে ঘোড়াশাল রেলওয়ে স্টেশনের সাথে কারখানার সংযোগের জন্য একটি রেললাইন নির্মাণের কাজ চলছে। উদ্বোধনের পর প্রধানমন্ত্রী সার কারখানা পরিদর্শন করেন। এসময় প্রধানমন্ত্রী স্মারক ডাকটিকিট, উদ্বোধনী খাম এবং জিপিইউএফএফ উদ্বোধনের দিনটিকে চিহ্নিত করে একটি বিশেষ সিলমোহরও প্রকাশ করেন।

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ১২ই নভেম্বর ২০২৩ নরসিংদীতে ঘোড়াশাল-পলাশ ইউরিয়া সার কারখানা উদ্বোধন করেন– পিআইডি

মাতারবাড়ি গভীর সমুদ্রবন্দর উদ্বোধন

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা মাতারবাড়ি গভীর সমুদ্রবন্দরের ১৪.৩ কিলোমিটার দীর্ঘ কৃত্রিম নৌ চলাচল চ্যানেলের উদ্বোধন করেন। ১১ই নভেম্বর মাতারবাড়ি গভীর সমুদ্রবন্দর এলাকায় আয়োজিত এক অনুষ্ঠানে উদ্বোধনী ফলক উন্মোচনের পর বন্দরের প্রথম টার্মিনাল নির্মাণের জন্য আনুষ্ঠানিকভাবে চ্যানেলটির উদ্বোধন ও ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেন প্রধানমন্ত্রী। এই বন্দর দেশের অর্থনীতিতে ২ থেকে ৩ বিলিয়ন ডলার অবদান রেখে অর্থনীতির প্রাণকেন্দ্র হয়ে উঠবে বলে আশা করা হচ্ছে।

প্রধানমন্ত্রী বলেন, ভৌগোলিক অবস্থানের কারণে মাতারবাড়ির গভীর সমুদ্রবন্দরটি দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে ব্যাপক অবদান রাখবে। গভীর সমুদ্রবন্দর চালু হলে বড়ো জাহাজ সরাসরি বিদেশি সমুদ্রবন্দরে যেতে পারবে এবং পণ্য লোড-আনলোড করা আরও সহজ ও সস্তা হবে এবং সময় সাশ্রয় হবে।

প্রস্তাবিত টার্মিনাল থেকে সমুদ্র পর্যন্ত প্রসারিত চ্যানেলটি জেলার মহেশখালী উপজেলার মাতারবাড়িতে ২০২৬ সালে টার্মিনালটি চালু করার লক্ষ্যমাত্রা রয়েছে। এসময় তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রী ড. হাছান মাহ্মুদসহ বেশ কয়েকজন মন্ত্রী, আওয়ামী লীগের সিনিয়র নেতৃবৃন্দ এবং অন্যান্য গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ উপস্থিত ছিলেন।

দেশের প্রথম ও একমাত্র গভীর সমুদ্রবন্দর স্থাপনের জন্য ১৭ হাজার ৭৭৭ কোটি ২০ লাখ টাকার বেশি ব্যয়ে মাতারবাড়ি বন্দর উন্নয়ন প্রকল্প হাতে নেওয়া হয়েছে। এর মধ্যে সমুদ্রবন্দর নির্মাণে ব্যয় হবে ৮ হাজার ৯৫৫ কোটি ৮২ লাখ টাকা। এই উন্নয়ন কাজ শেষ হলে ৮- ১০ হাজার কন্টেইনারবাহী জাহাজ সরাসরি জেটিতে প্রবেশ করতে সক্ষম করবে।

'মৃত্যুঞ্জয়ী প্রাঙ্গণ' আমাদের দেশকে জানার ইতিহাস

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ভাস্কর্য ঘিরে 'মৃত্যুঞ্জয়ী প্রাঙ্গণ' উদ্বোধন করে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বলেন, বঙ্গবন্ধুর এই ভাস্কর্যটি নিছক একটি ভাস্কর্য নয়। এটি দেশকে জানার একটি ইতিহাস। ১০ই নভেম্বর নগরীর বিজয় সরণিতে উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে তিনি এসব কথা বলেন।

বাংলাদেশ সেনাবাহিনী কর্তৃক নির্মিত এই চত্বরের সাতটি দেয়ালে ভাষা আন্দোলন থেকে শুরু করে অন্যান্য আন্দোলন ও বাঙালির মুক্তিযুদ্ধ ও স্বাধীনতা সংগ্রামে জাতির পিতার নেতৃত্ব ও অবদান চিত্রিত করা হয়েছে। উদ্বোধনের পর প্রধানমন্ত্রী 'মৃত্যুঞ্জয়ী প্রাঙ্গণ' পরিদর্শন করেন এবং পরে সেখানে উপস্থিত ছাত্রছাত্রী এবং সামরিক ও বেসামরিক কর্মকর্তাদের সঙ্গে ছবি তোলেন।

বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের অবদান ও আত্মত্যাগের কথা তুলে ধরে প্রধানমন্ত্রী বলেন, তাঁর সংগ্রাম ছিল বাঙালি জাতির আর্থসামাজিক মুক্তির জন্য। বঙ্গবন্ধু এদেশের মানুষের জন্য নিজের জীবন উৎসর্গ করেছেন।

সেখানে উপস্থিত শিশুদের উদ্দেশে প্রধানমন্ত্রী বলেন, আজকের শিশুরাই আগামী দিনের স্মার্ট বাংলাদেশ গড়ার সৈনিক। আমাদের শিশুরাই স্মার্ট বাংলাদেশকে নেতৃত্ব দেবে, বাংলাদেশ পরিচালনা করবে। এভাবেই তোমরা নিজেদের গড়ে তুলবে।

একদিনে দেড়শো সেতু উদ্বোধন

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা দেশের আটটি বিভাগের ৩৯টি জেলায় একদিনে দেড়শো সেতু উদ্বোধন করেন, যা দেশের সড়ক যোগাযোগ ব্যবস্থাকে আরও জোরদার করবে। প্রধানমন্ত্রী ১৯শে অক্টোবর রাজধানীর তেজগাঁওয়ের সড়ক ভবনে উদ্বোধনী ফলক উন্মোচনের মাধ্যমে নবনির্মিত সেতুগুলোর উদ্বোধন করেন। এসময় প্রধানমন্ত্রী জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের একটি ম্যুরাল উন্মোচন এবং সড়ক পরিবহণ চত্বরে একটি গাছের চারা রোপণ করেন।

সেতুগুলোর মধ্যে ময়মনসিংহ বিভাগে ৪০টি, ঢাকায় ৩২টি, চট্টগ্রামে ২৭টি, রাজশাহীতে ২২টি, খুলনায় ১২টি, বরিশাল ও রংপুরে আটটি করে এবং সিলেটে একটি সেতু রয়েছে। এর আগে গত বছরের ৭ই নভেম্বর ও ২১শে ডিসেম্বর প্রধানমন্ত্রী সারা দেশে ১০০টি সেতু ও ১০০টি সড়ক-মহাসড়ক উদ্বোধন করেন। একই অনুষ্ঠানে তিনি মহাসড়কের ১৪টি ওভারপাসও উদ্বোধন করেন। এছাড়া তিনি ময়মনসিংহের ব্রহ্মপুত্র নদের ওপর দুটি বড়ো সেতু, কেওয়াটখালী সেতু এবং রহমতপুর সেতুর ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেন।

বঙ্গবন্ধু টানেল স্মার্ট বাংলাদেশের যাত্রা পথে আরও একধাপ এগিয়ে দিয়েছে

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বলেন, 'বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান টানেল' এ অঞ্চলে নতুন মাত্রার উন্নত প্রযুক্তিসম্পন্ন সড়ক যোগাযোগ ব্যবস্থার সূচনা করে স্মার্ট বাংলাদেশের যাত্রা পথে আমাদের আরও একধাপ এগিয়ে দিয়েছে। ২৮শে অক্টোবর 'বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান টানেল' উদ্বোধন উপলক্ষে দেওয়া এক বাণীতে তিনি এসব কথা বলেন।

প্রধানমন্ত্রী বলেন, চট্টগ্রামবাসীর বহুল প্রতীক্ষিত 'বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান টানেল' নির্মাণের ফলে বন্দর নগরী চট্টগ্রাম 'ওয়ান সিটি টু টাউনস' মডেলে দৃশ্যমান হবে। এই টানেল দেশের দক্ষিণ-পূর্বাঞ্চলের যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়ন, এশিয়ান হাইওয়ে নেটওয়ার্কে সংযুক্তি, চট্টগ্রাম শহরের যানজট হ্রাস, আনোয়ারা প্রান্তে বিদ্যমান ও গড়ে ওঠা শিল্পাঞ্চল এবং পর্যটন শিল্পের বিকাশসহ চট্টগ্রাম বন্দর ও প্রস্তাবিত মাতারবাড়ি গভীর সমুদ্রবন্দরে পণ্য পরিবহণে যুগান্তকারী ভূমিকা পালন করবে। টানেলটি চালু হলে বাংলাদেশের জিডিপি প্রায় ০.১৬৬ শতাংশ বৃদ্ধি পাবে।

তিনি আরও বলেন, 'বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান টানেল' বাংলাদেশ তথা দক্ষিণ এশিয়ায় নদীর নীচে প্রথম সড়ক টানেল। দেশপ্রেমিক জনগণের আস্থা ও অকুণ্ঠ সমর্থনের ফলেই আজকে উন্নয়নের এ নতুন অধ্যায় উন্মোচিত হয়েছে। আগামী দিনেও গণমানুষের আশা-আকাঙ্ক্ষা ও স্বপ্ন পূরণে আমরা আন্তরিকভাবে কাজ করে যাব।

প্রতিবেদন: প্রসেনজিৎ কুমার দে

তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয়: বিশেষ প্রতিবেদন

সাংবাদিকদের জন্য সহায়তা নজিরবিহীন

তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রী ড. হাছান মাহ্মুদ বলেন, সাংবাদিকবান্ধব প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা সাংবাদিকদের কল্যাণে ও গণমাধ্যমের বিকাশে যে ভূমিকা রেখেছেন তা নজিরবিহীন। তিনি বলেন, আমরা মনে করি সমালোচনা পথচলাকে শানিত করে, কাজের জন্য সহায়ক এবং বাংলাদেশে গণমাধ্যমের যে স্বাধীনতা আছে সেটি উন্নয়নশীল বিশ্বের জন্য একটি দৃষ্টান্ত। ২রা নভেম্বর জাতীয় প্রেসক্লাবে বিএফইউজে-বাংলাদেশ ফেডারেল সাংবাদিক ইউনিয়নের সম্মেলনে প্রধান অতিথি প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার বক্তৃতার পূর্বে বিশেষ অতিথির বক্তৃতায় তিনি এসব কথা বলেন।

তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রী বলেন, গত পনেরো বছরে দেশে পত্রিকার সংখ্যা সাড়ে ৪০০ থেকে ১ হাজার ২৬০টিতে উন্নীত হয়েছে। বেসরকারি টেলিভিশন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার হাত দিয়ে শুরু হয়েছিল। আজকে ৩৫টি টিভি চ্যানেল সম্প্রচারে আছে, আরও কমপক্ষে ৫টি খুব সহসা সম্প্রচারে আসবে। অনলাইন গণমাধ্যম কত হাজার সেটি একটি পরীক্ষা-নিরীক্ষার বিষয়। এগুলোই প্রমাণ করে যে, শেখ হাসিনা এবং তাঁর সরকার কতটুকু গণমাধ্যমবান্ধব।

তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রী বলেন, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান জীবনের একটি সময় সাংবাদিকতা করেছেন, আজকের এই চত্বরের জায়গা বঙ্গবন্ধুই জাতীয় প্রেসক্লাবকে দিয়েছিলেন। প্রধানমন্ত্রী বঙ্গবন্ধুকন্যা এখানে দাঁড়িয়েই ২০১৪ সালে সাংবাদিকদের কল্যাণে একটি স্থায়ী তহবিলের কথা উল্লেখ করে বলেছিলেন, 'আমি কতদিন বাঁচবো জানি না কিন্তু সাংবাদিকদের জন্য একটি স্থায়ী ব্যবস্থা করে দিতে চাই'। তাঁরই চিন্তাপ্রসূত, তাঁরই উদ্যোগে 'সাংবাদিক কল্যাণ ট্রাস্ট' প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, এটি দেশের সমস্ত সাংবাদিক স্বীকার করে এবং বলে এই ট্রাস্ট তাদের একটি ভরসার স্থল হিসেবে দাঁড়িয়েছে।

তিনি আরও বলেন, একজন সাংবাদিক মারা গেলে কল্যাণ ট্রাস্ট থেকে তার পরিবার ৩ লাখ টাকা অনুদান পায়, অসুস্থ সাংবাদিকরা অনুদান পান। আমরা ট্রাস্টের বিধিমালা সংশোধন করেছি, এখন থেকে অসচ্ছল সাংবাদিকদের মেধাবী শিক্ষার্থী সন্তানেরাও অনুদান পাবেন। সবাইকে অবাক করে করোনাকালে আমরা ট্রাস্ট থেকে সাংবাদিকদের এককালীন সহায়তা দিয়েছি। দেশব্যাপী ৭ হাজারের বেশি সাংবাদিক অনুদান পেয়েছে। ভারত, পাকিস্তান, শ্রীলংকা, নেপালসহ উপমহাদেশের কোনো দেশে এটি হয়নি। এমনকি ইউরোপের কোনো দেশেও সাংবাদিকদের জন্য আলাদা কোনো বরাদ্দ ছিল না।

বাংলাদেশ সবচেয়ে বিনিয়োগবান্ধব এবং সম্ভাবনার দেশ

তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রী ড. হাছান মাহ্মুদ সবচেয়ে বিনিয়োগবান্ধব এবং সম্ভাবনার দেশ হিসেবে বাংলাদেশে বিনিয়োগের জন্য বিশ্বের বিনিয়োগকারীদের প্রতি আহ্বান জানিয়েছেন। ফ্রান্সের রাজধানী প্যারিসের ইন্টারকন্টিনেন্টাল হোটেলের ওপেরা বলরুমে ২৩ থেকে ২৫শে অক্টোবর 'বাংলাদেশ-ফ্রান্স ট্রেড অ্যান্ড ইনভেস্টমেন্ট সামিট'-এর উদ্বোধন অনুষ্ঠানে বক্তৃতায় মন্ত্রী ২৪শে অক্টোবর এ আহ্বান জানান। তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রী বলেন, প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে গত ১৫ বছরে বাংলাদেশ সকল ক্ষেত্রে অভাবনীয় প্রবৃদ্ধি অর্জন করেছে। অবকাঠামোগত সুবিধা, সমুদ্রবন্দর, নদীবন্দর, আন্তঃদেশীয় রেল ও সড়ক যোগাযোগসহ নানা কারণে বাংলাদেশ আজ সবচেয়ে বিনিয়োগবান্ধব এবং সম্ভাবনার দেশ। তিনি বলেন, মাথাপিছু আয় বৃদ্ধির সাথে যেহেতু মানুষের ক্রয়ক্ষমতা বাড়ে, সেখানে আমাদের মাথাপিছু আয় শুধু দ্রুত বৃদ্ধিই পাচ্ছে না, প্রায় ৫০ মিলিয়ন বা ৫ কোটি মানুষের মাথাপিছু আয় এখন ৫ হাজার ডলার। আগামী এক দশকে এই সংখ্যা ৭ কোটি ছাড়িয়ে যাবে। পাশাপাশি আমাদের ভৌগোলিক অবস্থান এমন যে বাংলাদেশে বিনিয়োগ করা পণ্যের বাজার ভারত, মিয়ানমার, নেপাল এমনকি চীন পর্যন্ত বিস্তার করা সহজতর বর্ণনা করেন তিনি।

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ২রা নভেম্বর ২০২৩ ঢাকায় জাতীয় প্রেসক্লাবে বাংলাদেশ ফেডারেল সাংবাদিক ইউনিয়নের প্রতিনিধি সম্মেলনে ফেডারেল সাংবাদিক ইউনিয়নের সাবেক মহাসচিব আবদুল জলিল ভুঁইয়ার হাতে সম্মাননা স্মারক তুলে দেন। এসময় তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রী ড. হাছান মাহ্‌মুদ উপস্থিত ছিলেন– পিআইডি

শেখ রাসেল বেঁচে থাকলে জাতীয় জীবনে অনেক কিছু দিতে পারতেন

তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রী ড. হাছান মাহ্‌মুদ ১৭ই অক্টোবর জাতীয় প্রেসক্লাবে বঙ্গবন্ধুর কনিষ্ঠ পুত্র শহিদ শেখ রাসেলের ৬০তম জন্মদিবস উপলক্ষে বঙ্গবন্ধু সাংস্কৃতিক জোট আয়োজিত আলোচনাসভায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন। শহিদ শেখ রাসেলের স্মৃতির প্রতি গভীর শ্রদ্ধা জানিয়ে তিনি বলেন, আমি পরম স্রষ্টার কাছে শহিদ শেখ রাসেলের আত্মার মাগফেরাত কামনা করি। ১৯৭৫ সালের ১৫ই আগস্ট জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান, বঙ্গমাতা শেখ ফজিলাতুন নেছা মুজিবের সাথে সবশেষে ১০ বছরের শিশু শেখ রাসেলকে হত্যা করা হয়। তখন ১৩-১৪ বছরের রমা, যিনি আজও বেঁচে আছেন, তাকে নিয়ে সিঁড়ির নীচে লুকিয়েছিল। সেখান থেকে টেনে-হিঁচড়ে বঙ্গমাতার লাশের কাছে নিয়ে গিয়ে শেখ রাসেলকে গুলি করে হত্যা করা হয়। অর্থাৎ খুনিরা বঙ্গবন্ধুর ছায়াকেও ভয় পেত।

শেখ রাসেল যদি বেঁচে থাকতেন আজকে জাতীয় জীবনে অনেক কিছু দিতে পারতেন, বঙ্গবন্ধুর স্বপ্ন বাস্তবায়নে বঙ্গবন্ধুকন্যার সহযাত্রী হতে পারতেন, কিন্তু খুনিরা তাকেও রেহাই দেয়নি উল্লেখ করে তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রী বলেন, কারবালার প্রান্তরে যখন ইমাম হোসেনকে জবাই করে হত্যা করা হয় তখন নারী ও শিশুদের সেই হত্যাকাণ্ড থেকে রেহাই দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু ১৯৭৫ সালের ১৫ই আগস্ট নারী ও শিশু নির্বিচারে এমনকি অন্তঃসত্ত্বা মাকেও হত্যা করা হয়েছিল। এটি মানব ইতিহাসে একটি জঘন্যতম হত্যাকাণ্ড। এই হত্যাকাণ্ডের বিচার হয়েছে। শুধু হত্যাকারীদের বিচার যথেষ্ট নয়। এই হত্যাকাণ্ডের পেছনে কুশীলবদের মুখোশ উন্মোচিত হওয়া প্রয়োজন।

প্রতিবেদন: শারমিন সুলতানা শান্তা

উন্নয়ন : বিশেষ প্রতিবেদন

বাংলাদেশের ট্রেন আগরতলায়

আখাউড়া-আগরতলা ডুয়েলগেজ রেলপথ দিয়ে প্রথমবারের মতো ভারতের আগরতলার উদ্দেশে ছেড়ে গেছে বাংলাদেশের ট্রেন। ৩০শে অক্টোবর বাংলাদেশ রেলওয়ের ছয়জন স্টাফ নিয়ে ব্রাহ্মণবাড়িয়ার গঙ্গাসাগরে নবনির্মিত রেলওয়ে স্টেশন থেকে পাঁচটি বগি নিয়ে পরীক্ষামূলকভাবে আগরতলার নিশ্চিন্তপুর রেলওয়ে স্টেশনের উদ্দেশে ছেড়ে যায় ট্রেনটি। এর আগে চলতি বছরের সেপ্টেম্বরের ১৪ তারিখে প্রথম ট্রায়াল রান হয় আখাউড়া-আগরতলা ডুয়েলগেজ রেলপথ। ২০১৮ সালের জুলাইয়ে শুরু হওয়া এই ১২ দশমিক ২৪ কিলোমিটার দৈর্ঘ্যের রেলপথের বাংলাদেশ অংশ ৬ দশমিক ৭৮ কিলোমিটার। করোনা মহামারিসহ নানা সংকটে দেড় বছর মেয়াদি এই প্রকল্পের কাজ শেষ করতে সময় লেগেছে পাঁচ বছরেরও বেশি। প্রথমদিকে পণ্যবাহী ট্রেন এবং পরবর্তীতে যাত্রীবাহী ট্রেনও চালানো হবে এই রুটে। এই রেলপথে ৭৯ কিলোমিটার গতিতে ট্রেন চালানো যাবে।

বর্জ্য থেকে বিদ্যুতের উৎপাদনের যাত্রা

প্রতিদিন আসছে প্রায় সাত হাজার টন বর্জ্য। তাই বর্জ্য ব্যবস্থাপনার উন্নয়নে বর্জ্য পুড়িয়ে বিদ্যুৎ উৎপাদন করা গেলে সফল ব্যবস্থাপনা হতে পারে– এমন চিন্তা দীর্ঘদিনের। অবশেষে সেই চিন্তার সফল বাস্তবায়ন হলো দেশে। এই যাত্রার শুরুটা হলো কক্সবাজারের উখিয়া ক্যাম্পে।

বিশ্বের তৃতীয় অমনি প্রসেসর প্লান্টটি ১১ই নভেম্বর উদ্বোধন করেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। 'অমনি প্রসেসর' হচ্ছে যে প্রক্রিয়াতে বর্জ্য থেকে বিদ্যুৎ, ডিস্ট্রিল্ড ওয়াটার এবং অ্যাশ উৎপাদন করা হয়। সেনেগাল, ভারতের পর তৃতীয় কোনো রাষ্ট্রে এই প্রকল্পটি পরীক্ষামূলক চালু হয়েছে। প্রায় ৬০ কোটি টাকার এই প্রকল্পটির উপকারভোগী আনুমানিক ১ লাখ মানুষ।

২০২১ সালের অক্টোবর মাসে প্রকল্পের কাজ শেষ হয় ২০২৩ সালের জুন মাসে। পরীক্ষামূলক চালু হওয়া প্রকল্পে প্রতিদিন ৩০ কিউবিট মিটার বা ৬ টন শুকনো পয়ঃবর্জ্য, ৫ টন জৈব বর্জ্য, ৫ শত কেজি প্লাস্টিক বর্জ্য নিয়ে মোট ১১.৫ টন বর্জ্য যা প্লান্ট পরিচালনার জন্য ব্যবহৃত হয়। প্লান্ট থেকে প্রতিদিন গড়ে ৬০-৭০ কিলোওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদন হয়। প্রকল্পের বর্জ্য পরিশোধনের পর প্রতিদিন গড়ে ১ হাজার থেকে ১২ শত লিটার ডিস্ট্রিল্ড ওয়াটার (পানি) উৎপাদন হয়। যে পানিতে কোনে আয়ন বা সলিড কোন সল্ট থাকে না, শুধু হাইড্রোজেন আর অক্সিজেন আয়ন থাকে। ব্যাটারিতে এই পানি আয়নাইজ হয়ে হাইড্রোজেন আর অক্সিজেন আয়ন হয়ে ইলেকট্রিসিটি তৈরি করে এবং হাইড্রোজেন গ্যাস হয়ে থাকে। এটি বাজারজাত করা যাবে। একইসঙ্গে প্রকল্প থেকে প্রতিদিন গড়ে উৎপাদিত হচ্ছে ১২শত থেকে ১৫শত কেজি অ্যাশ, যা সিমেন্টসহ নানা কাজে ব্যবহার করা হয়। উৎপাদিত অ্যাশ বাণিজ্যিকভাবে ব্যবহৃত হবে এবং এটি দ্বারা মাটি ভরাট বা পরোক্ষ জ্বালানি হিসেবে ব্যবহার করা যাবে। আগামীর বাংলাদেশ বিনির্মাণে এবং স্মার্ট বাংলাদেশ গড়ে তুলতে বর্জ্য যথাযথভাবে কাজে লাগাতে হবে, যা বাস্তবে রূপ দেওয়া সম্ভব।

প্রতিবেদন: শাহানা আফরোজ

ডিজিটাল বাংলাদেশ

স্মার্ট নাগরিকরাই স্মার্ট বাংলাদেশ গড়ে তুলবে

ডাক ও টেলিযোগাযোগ মন্ত্রী মোস্তাফা জব্বার বলেন, ডিজিটাল দক্ষতাসম্পন্ন মানবসম্পদই হবে স্মার্ট বাংলাদেশ বিনির্মাণের হাতিয়ার। স্মার্ট নাগরিকরাই স্মার্ট বাংলাদেশ গড়ে তুলবে। এজন্য প্রচলিত শিক্ষার সাথে ডিজিটাল দক্ষতা অর্জন করার উপযোগী স্মার্ট শিক্ষাব্যবস্থা গড়ে তোলা অপরিহার্য। ২রা নভেম্বর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ব্যবসায় শিক্ষা অনুষদের প্রফেসর হাবিবুল্লাহ হলে অ্যাকসনিস্ট ফাউন্ডেশন আয়োজিত 'স্মার্ট বাংলাদেশের জন্য নেতৃত্বের দক্ষতা' শীর্ষক এক সেমিনারে প্রধান অতিথির বক্তৃতায় মন্ত্রী এসব কথা বলেন।

ডাক ও টেলিযোগাযোগ মন্ত্রী নতুন প্রজন্মকে অত্যন্ত মেধাবি আখ্যায়িত করে বলেন, আমাদের সম্পদের নাম হচ্ছে মানুষ। আমরা তাদেরকে সম্পদে পরিণত করে চতুর্থ শিল্পবিপ্লব বা যান্ত্রিক শিল্পবিপ্লব নয়, আমরা একটি মানবিক শিল্পবিপ্লব বা পঞ্চম শিল্পবিপ্লব বাস্তবায়নে কাজ করছি। প্রথম ও দ্বিতীয় শিল্পবিপ্লব মিস করে প্রযুক্তিতে ৩২৪ বছরের পশ্চাৎপদতা অতিক্রম করে মানুষ এবং যন্ত্রের মিশেলে এই মানবিক শিল্প গড়ে তোলা আমাদের লক্ষ্য।

তিনি বলেন, প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে ১৯৯৬ সাল থেকে ২০০১ সাল পর্যন্ত ডিজিটাল বাংলাদেশের অভিযাত্রা শুরু হয়। এসময় কম্পিউটার প্রযুক্তি সাধারণের ক্রয় ক্ষমতায় পৌঁছে দিতে ভ্যাট-ট্যাক্স প্রত্যাহারসহ যুগান্তকারী বিভিন্ন কর্মসূচি গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করা হয়। এরই ধারাবাহিকতায় ২০০৮ সালে ঘোষিত ডিজিটাল বাংলাদেশ কর্মসূচির ফলে বাংলাদেশ বিশ্বে অনুকরণীয় দৃষ্টান্ত স্থাপন করে।

মন্ত্রী আরও বলেন, ডিজিটাল সংযুক্তি হচ্ছে ডিজিটাল বাংলাদেশের মেরুদণ্ড। ২০২১ সালে ডিজিটাল বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠা লাভের ধারাবাহিকতায় ডিজিটাল সংযুক্তির শক্তিশালী ভিত্তির ওপর দাঁড়িয়ে স্মার্ট বাংলাদেশ বিনির্মাণে কাজ করছে সরকার। নতুন প্রজন্মকে ডিজিটাল মানবসম্পদ হিসেবে গড়ে তোলা আমাদের সবচেয়ে বড়ো চ্যালেঞ্জ –এ কথা উল্লেখ করে তিনি বলেন, স্মার্ট নাগরিক কিংবা স্মার্ট সমাজ দক্ষ মানবসম্পদের ওপর নির্ভরশীল।

ডিজিটাল বৈষম্যহীন বিশ্ব গড়তে ডিপিআই-এআই আন্তর্জাতিক সম্মেলন

ডিজিটাল পাবলিক ইনফ্রাস্ট্রাকচার (ডিপিআই) ও কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার (এআই) সর্বোত্তম ব্যবহারের মাধ্যমে অন্তর্ভুক্তিমূলক ও ডিজিটাল বৈষম্যহীন বিশ্ব গড়ার প্রত্যয়ে অনুষ্ঠিত হলো 'ডিপিআই অ্যান্ড এআই ফর জিরো ডিজিটাল ডিভাইড' শীর্ষক আন্তর্জাতিক সম্মেলন। ৩০শে অক্টোবর সম্মেলন উদ্বোধন করেন পরিকল্পনা মন্ত্রী এম এ মান্নান। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানের সভাপতিত্ব করেন আইসিটি প্রতিমন্ত্রী জুনাইদ আহমেদ পলক। সরকারের তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি (আইসিটি) বিভাগের সহযোগিতায় এবং এসপায়ার টু ইনোভেটের (এটুআই) উদ্যোগে রাজধানীর একটি হোটেলে দুই দিনব্যাপী এ সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়।

পরিকল্পনা মন্ত্রী বলেন, ডিজিটাল বাংলাদেশ

বাস্তবায়নের পর স্মার্ট বাংলাদেশ বিনির্মাণের পথে এগিয়ে যাচ্ছে দেশ। ২০৪১ সালের মধ্যে দেশের টেকসই উন্নয়ন নিশ্চিত করতে ডিজিটাল বিভাজন কমিয়ে আনা প্রয়োজন। প্রান্তিক জনগোষ্ঠীসহ পুরো দেশের মানুষকে আর্থিক অন্তর্ভুক্তিকরণে একটি ওপেন প্ল্যাটফর্ম অবকাঠামো নির্মাণের প্রয়োজনীয়তা তৈরি হয়েছে। এই অবকাঠামোর নাম ডিজিটাল পাবলিক ইনফ্রাস্ট্রাকচার (ডিপিআই)। দেশের প্রেক্ষাপটে ডিপিআই কোনোও স্বপ্ন নয়, বরং একে বাস্তবে রূপ দেওয়ার সমূহ সম্ভাবনা রয়েছে। এর মাধ্যমে দেশের কৃষি, শিক্ষা, স্বাস্থ্য, জুডিশিয়ারিসহ সব খাতে আর্থিক অন্তর্ভুক্তিকরণে সহজ, পরিমাপযোগ্য এবং টেকসই সমাধান দুর্বল ও প্রান্তিকদের উন্নয়নের গল্পে নেতৃত্ব দিতে সক্ষম করে তুলবে।

দেশের সমৃদ্ধ ও টেকসই উন্নয়নের ক্ষেত্রে ডিপিআই ও এআইয়ের সর্বোত্তম ব্যবহারের প্রয়োজনীয়তার বিষয় উল্লেখ করেন আইসিটি প্রতিমন্ত্রী জুনাইদ আহমেদ পলক। তিনি বলেন, 'প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সুযোগ্য নেতৃত্বে গত ১৫ বছরে আমরা প্রান্তিক জনগণের কাছে ডিজিটাল সেবা পৌঁছে দিয়েছি। প্রায় ৯ হাজার ডিজিটাল সেন্টারের মাধ্যমে গ্রামে গ্রামে নাগরিক সেবা পৌঁছে দেওয়া হয়েছে। এই সেন্টারগুলোর উদ্যোক্তাদের বড়ো অংশ নারীরা।

প্রতিমন্ত্রী আরও বলেন, ইতোমধ্যে ডিপিআইয়ের তিন স্তর নিয়ে কাজ করছে বাংলাদেশ। এগুলো হলো– ডিজিটাল পরিচয়পত্র, ডিজিটাল পেমেন্ট ও ডাটা বিনিময়। দেশের ৯৫ শতাংশ প্রাপ্তবয়স্ক জনসংখ্যাকে আওতাভুক্ত করেছে আমাদের জাতীয় পরিচয়পত্র ব্যবস্থা। জন্মনিবন্ধন আইডির মতো ব্যবস্থার মাধ্যমে ব্যক্তিগত স্বীকৃতির পাশাপাশি যাবতীয় সেবা গ্রহণের সুযোগ তৈরি হয়েছে। আমরা এসডিজির লক্ষ্যমাত্রা পূরণের পথে এগিয়ে চলেছি।

স্মার্ট বাংলাদেশের জন্য ডিজিটাল দক্ষতাসম্পন্ন যুবসমাজ অপরিহার্য

ডাক ও টেলিযোগাযোগ মন্ত্রী মোস্তাফা জব্বার বলেন, স্মার্ট বাংলাদেশের জন্য ডিজিটাল দক্ষতাসম্পন্ন যুবসমাজ এবং ডিজিটাল সংযুক্তি অপরিহার্য। প্রচলিত শিক্ষা চতুর্থ কিংবা পঞ্চম শিল্পবিপ্লবের উপযোগী না হওয়ায় নতুন প্রজন্মের জন্য ডিজিটাল দক্ষতা অর্জনের বড়ো অন্তরায়। ১৭ই অক্টোবর টেলিযোগাযোগ মন্ত্রী ঢাকায় অফিসার্স ক্লাবে বৃহত্তর ময়মনসিংহ সমন্বয় পরিষদের ২৩তম প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী উদ্‌যাপন উপলক্ষে স্মার্ট বাংলাদেশ বিনির্মাণে যুবসমাজ শীর্ষক সেমিনারে প্রধান অতিথির বক্তৃতায় এসব কথা বলেন।

মন্ত্রী বলেন, নিজেদের স্মার্ট বাংলাদেশের উপযোগী শক্তি হিসেবে তৈরি করাই যুবসমাজের বড়ো চ্যালেঞ্জ। তিনি স্মার্ট মানবসম্পদ তৈরিতে সরকারের পাশাপাশি বেসরকারি সংস্থা ও সামাজিক-সাংস্কৃতিক সংগঠনসমূহকে এগিয়ে আসার আহ্বান জানান।

ডাক ও টেলিযোগাযোগ মন্ত্রী বলেন, পৃথিবীর উন্নত দেশগুলোতে কাগজের বইয়ে লেখাপড়া হয় না। কাগজের বই ডিজিটাল রূপান্তর করে ছেলেমেয়েদের লেখাপড়া করানো হচ্ছে। তিনি শিক্ষায় ডিজিটাল রূপান্তরে সরকারের বিভিন্ন কর্মসূচি তুলে ধরে বলেন, বিটিআরসির এসওএফ তহবিলের অর্থায়নে ইতোমধ্যে ডাক ও টেলিযোগাযোগ বিভাগের উদ্যোগে দেশের সুবিধাবঞ্চিত এলাকায় ৬৫০টি প্রাথমিক বিদ্যালয় এবং পার্বত্য অঞ্চলের ২৮টি পাড়া কেন্দ্রে ডিজিটাল যন্ত্রে ডিজিটাল পাঠ দিয়ে শিশুদেরকে ডিজিটাল যুগের শিক্ষা কার্যক্রম শুরু হয়েছে। তিনি ডিজিটাল মানবসম্পদ এবং ডিজিটাল সংযুক্তি স্মার্ট বাংলাদেশ বিনির্মাণের জন্য অত্যাবশ্যক উল্লেখ করে বলেন, ইতোমধ্যে দেশের শতকরা ৯৮ ভাগ এলাকা মোবাইলের ফোরজি ইন্টারনেটের আওতায় আনা হয়েছে। ফোরজিকে ফাইভজিতে রূপান্তরের প্রক্রিয়া গ্রহণ করা হয়েছে। দেশের প্রতিটি ইউনিয়নে উচ্চগতির ব্রডব্যান্ড ইন্টারনেট সংযোগ পৌঁছে গেছে।

প্রতিবেদন: সাদিয়া ইফ্‌ফাত আঁখি

শিক্ষা : বিশেষ প্রতিবেদন

নতুন শিক্ষাক্রমের ব্যাখ্যা দিলেন শিক্ষামন্ত্রী

আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউট (আমাই) আয়োজিত এক সংবাদ সম্মেলনে ৩০শে অক্টোবর নতুন শিক্ষাক্রম নিয়ে ছড়ানো ১৫টি বিভ্রান্তিকর তথ্য ও তার সঠিক তথ্য বিস্তারিতভাবে জানান শিক্ষামন্ত্রী ডা. দীপু মনি। তিনি বলেন, নতুন শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক নিয়ে একটি সাম্প্রদায়িক গোষ্ঠী ও কোচিং, নোটগাইড ব্যবসায়ীদের কেউ কেউ উসকানি দিচ্ছে। শিক্ষামন্ত্রী জানান, নতুন শিক্ষাক্রমে পড়াশোনা নেই, পরীক্ষা নেই, শিক্ষার্থীরা কিছু শিখছে না বলে বিভ্রান্তি ছড়ানো হচ্ছে। তবে সঠিক ব্যাখ্যা হচ্ছে, শিক্ষার্থীরা আগের চেয়ে অনেক বেশি পড়বে, নিজেরা সক্রিয়ভাবে পড়বে, শিখবে। দলগত কাজ করে আবার তা মূল্যায়ন হবে প্রতিটি কাজের। আবার ষাণ্মাসিক মূল্যায়ন ও বার্ষিক মূল্যায়নও হবে। কাজেই পরীক্ষা ঠিকই থাকছে, কিন্তু পরীক্ষার ভীতি থাকছে না। পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়া এবং না হওয়া আছে। শুধু তাই নয়, সাতটি স্কেলে শিক্ষার্থীদের রিপোর্ট কার্ডও হবে।

শিক্ষামন্ত্রী বলেন, আগে নবম ও দশম শ্রেণিতে মোট ৪০০ নম্বরের বিজ্ঞান থাকলেও নতুন শিক্ষাক্রমে তা কমিয়ে ১০০ নম্বরের করা হয়েছে বলে বিভ্রান্তি ছড়ানো হচ্ছে। সঠিক ব্যাখ্যা হচ্ছে, নতুন শিক্ষাক্রমে কোনো বিষয়ে নির্দিষ্ট নম্বর বরাদ্দ নেই। আছে শিক্ষার্থীর পারদর্শিতার পর্যায়। কাজেই এ বক্তব্যের কোনো ভিত্তি নেই। তিনি জানান, নতুন শিক্ষাক্রমে বিজ্ঞানের বিষয় কমিয়ে দেওয়া হয়েছে বলে অপপ্রচার চলছে। তবে, সঠিক তথ্য হলো নতুন শিক্ষাক্রমে

ষষ্ঠ থেকে দশম শ্রেণি পর্যন্ত সব শ্রেণিতে বিজ্ঞান বিষয়ের জন্য অপেক্ষাকৃত বেশি সময় রাখা হয়েছে। সার্বিক দিক দিয়ে আগের চেয়ে বিজ্ঞানের গুরুত্ব বেড়েছে, বিষয়বস্তুর পরিধিও বেড়েছে।

শিক্ষামন্ত্রী আরও বলেন, বিভ্রান্তি ছড়িয়ে বলা হচ্ছে, ব্রিটেনের কারিকুলামে নবম শ্রেণিতে বিষয় বাছাইয়ের সুযোগ আছে, কিন্তু নতুন শিক্ষাক্রমে বাংলা মাধ্যমে তা রাখা হয়নি। তবে সঠিক ব্যাখ্যা হচ্ছে, প্রচলিত ইংরেজি মাধ্যমের শিক্ষাক্রম ও ইংল্যান্ডের জাতীয় শিক্ষাক্রম এক না। ইংল্যান্ডসহ পৃথিবীর বেশিরভাগ দেশের শিক্ষাক্রমেই নবম ও দশম শ্রেণি পর্যন্ত বিষয় নির্বাচনের সুযোগ থাকে না। তিনি বলেন, অপপ্রচারকারীরা বলছেন বিজ্ঞান শিক্ষাকে খাটো করতে বিভাগ বিভাজন তুলে দেওয়া হয়েছে। তবে সঠিক ব্যাখ্যাটি হলো, নবম শ্রেণিতে পৃথিবীর প্রায় কোনো দেশেই বিভাগ বিভাজন করা হয় না। দশম বা একাদশ শ্রেণিতে গিয়ে সাধারণত বিষয় নির্বাচনের স্বাধীনতা দেওয়া হয়।

উপকরণ কিনতে হয় তাই শিক্ষা ব্যয় বেড়েছে বলে দাবি করা হচ্ছে জানিয়ে শিক্ষামন্ত্রী বলেন, সঠিক ব্যাখ্যাটি হচ্ছে, উপকরণের দাম বা চাকচিক্য বা সৌন্দর্য বিবেচ্য না। স্থানীয় সহজলভ্য ও পুনঃব্যবহারযোগ্য কাগজ বা উপকরণ ব্যবহারের নির্দেশনা বার বার দেওয়া হচ্ছে। ফলে ব্যয় বাড়ার কোনো কারণ নেই। আর নতুন শিক্ষাক্রমে কোচিং বা নোট বইয়ের খরচতো লাগছেই না। গ্রামের দরিদ্র জনগোষ্ঠী উপকরণ কিনতে পারছে না বলে বৈষম্য বাড়ছে দাবি করে বিভ্রান্তি ছড়ানো হচ্ছে। সঠিক ব্যাখ্যা দিয়ে শিক্ষামন্ত্রী বলেন, সহজলভ্যতা নিশ্চিত করেই উপকরণ, শিখন-শেখানো পদ্ধতি নির্বাচন করা হয়েছে। প্রতিটি ক্ষেত্রেই বিকল্প উপায় রাখা হয়েছে। ফলে বৈষম্য তো নয়ই বরং গ্রামের স্কুলগুলো ভালো করছে। কোচিং ও গাইড বইয়ের খরচ লাগছে না। ফলে বৈষম্য কমেছে। অসচ্ছল পরিবার থেকে উঠে আসা শিক্ষার্থীরা নতুন শিক্ষাক্রমে ভালো করছে।

গণিত অনুশীলনের সুযোগ নেই দাবি করে বিভ্রান্ত ছড়ানো হচ্ছে জানিয়ে শিক্ষামন্ত্রী বলেন, প্রতিটি গণিতের ধারণা এখন প্রায়োগিক ক্ষেত্রে বাস্তব পরীক্ষা ও ব্যাপক অনুশীলনের মাধ্যমে শিক্ষার্থীরা করছে। ধর্ম শিক্ষায় লিখিত পরীক্ষা রাখা হয়নি বলে মিথ্যাচার করা হচ্ছে জানিয়ে শিক্ষামন্ত্রী বলেন, সব বিষয়ের জন্য একই পদ্ধতিতে মূল্যায়ন ব্যবস্থা রয়েছে, যেখানে লিখিত মূল্যায়নও অন্তর্ভুক্ত আছে।

শিক্ষাকে দক্ষতাভিত্তিক করতে গিয়ে বুদ্ধিবৃত্তিক শিক্ষার সুযোগ কমে গিয়েছে দাবি করা হচ্ছে জানিয়ে তিনি বলেন, বুদ্ধিবৃত্তিক শিক্ষার ভিত্তি হচ্ছে জেনে, বুঝে, উপলব্ধি ও অনুবাধন করে তা প্রয়োগ করার মাধ্যমে সমস্যা সমাধানের চেষ্টায় নতুন ধারণা অনুসন্ধান করা। মুখস্ত নির্ভরতা বুদ্ধিবৃত্তিক বিকাশ ঘটায় না।

অনেকে বিভ্রান্তি ছড়িয়ে বলছেন, তাদের সন্তানরা ভর্তি পরীক্ষা দিতে পারবে না। শিক্ষামন্ত্রী বলেন, সঠিক ব্যাখ্যা হচ্ছে এ শিক্ষাক্রমের শিক্ষার্থীরা যখন উচ্চমাধ্যমিক পাস করবে তখন বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে ভর্তি প্রক্রিয়াতেও পরিবর্তন হবে। সেসব কার্যক্রম ইতোমধ্যে শুরু হয়েছে।

চাকরির ক্ষেত্রে নতুন শিক্ষাক্রমের ফল কাজে আসবে না বলে অভিভাবকদের বিভ্রান্ত করা হচ্ছে জানিয়ে শিক্ষামন্ত্রী বলেন, চাকরি ক্ষেত্রেও পারদর্শিতার মূল্যায়নের ভিত্তিতে নিয়োগ হবে। সেসব কার্যক্রম ইতোমধ্যে শুরু হয়েছে।

প্রতিবেদন: সাবিনা ইয়াসমিন

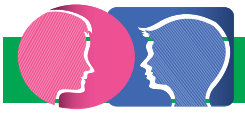

নারী : বিশেষ প্রতিবেদন

বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার আঞ্চলিক পরিচালক নির্বাচিত হলেন সায়মা ওয়াজেদ

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার কন্যা সায়মা ওয়াজেদ পুতুল বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার (ডব্লিউএইচও) দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া অঞ্চলের পরিচালক নির্বাচিত হয়েছেন। ১লা নভেম্বর ভারতের নয়াদিল্লিতে অনুষ্ঠিত ডব্লিউএইচওর আঞ্চলিক সম্মেলনে এ নির্বাচন হয়। সায়মা ওয়াজেদ ৮-২ ভোটে নির্বাচিত হয়েছেন। তিনি আগামী পাঁচ বছরের জন্য দায়িত্ব পালন করবেন। পররাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী মো. শাহরিয়ার আলম এ তথ্য নিশ্চিত করেন।

বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়েছে, আগামী বছরের অর্থাৎ ২০২৪ সালের ১লা ফেব্রুয়ারি সায়মা ওয়াজেদ তার দায়িত্ব গ্রহণ করবেন।

সায়মা ওয়াজেদ তার নির্বাচিত হওয়া প্রসঙ্গে বলেন, আঞ্চলিক পরিচালক হিসেবে নির্বাচিত করায় আমি ডব্লিউএইচওর দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া অঞ্চলের সদস্যরাষ্ট্রগুলোকে ধন্যবাদ জানাই। আমাদের অঞ্চলের জনস্বাস্থ্যে অবদানের জন্য আমি বিদায়ি পরিচালক ড. পুনম ক্ষেত্রপাল সিংয়ের প্রতি কৃতজ্ঞতা জানাই।

এর আগে বাংলাদেশ সরকার বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া অঞ্চলের আঞ্চলিক পরিচালক পদে সায়মা ওয়াজেদকে মনোনীত করেছিল। ডব্লিউএইচও দক্ষিণ-পূর্ব অঞ্চল বিষয়ক কার্যালয় ওই সংস্থার ছয়টি আঞ্চলিক অফিসের মধ্যে একটি।

উল্লেখ্য, সায়মা ওয়াজেদ ১৯৯৭ সালে যুক্তরাষ্ট্রের ব্যারি বিশ্ববিদ্যালয় থেকে মনোবিজ্ঞানে স্নাতক এবং ২০০২ সালে ক্লিনিক্যাল মনস্তত্ত্বে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি অর্জন করেন।

দেশে প্রথমবারের মতো ফায়ার ফাইটার পদে ১৫ নারী

ফায়ার সার্ভিসে প্রথমবারের মতো নারী 'ফায়ার ফাইটার' পদে যোগ দিয়েছেন ১৫ জন নারী সদস্য। ১৯শে নভেম্বর তারা নারায়ণগঞ্জের পূর্বাচলে অবস্থিত ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স মাল্টিপারপাস ট্রেনিং কমপ্লেক্সে আনুষ্ঠানিকভাবে যোগদান করেন। যোগদানের পর তাদের মিরপুর ট্রেনিং কমপ্লেক্সে স্থানান্তর করা

হয়। সদর দপ্তরের মিডিয়া সেলের ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা মোহাম্মদ শাহজাহান শিকদার এ তথ্য নিশ্চিত করেন।

২০শে জুন ফায়ার ফাইটার নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করা হয়। নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি অনুযায়ী ফায়ার ফাইটার (নারী) পদে দুই হাজার ৭০৭ জন আবেদনকারীর মধ্যে প্রাথমিক যাচাই-বাছাই, শারীরিক যোগ্যতা ও মেডিকেল টেস্ট, লিখিত পরীক্ষা ও মৌখিক পরীক্ষার মাধ্যমে এই ১৫ জনকে চূড়ান্ত নিয়োগ দেওয়া হয়।

এর আগে ফায়ার সার্ভিসে অফিসার পদে নারী কর্মকর্তা যোগদান করলেও ফায়ার ফাইটার পদে কখনো কোনো নারীর নিয়োগ সম্পন্ন হয়নি এবং নিয়োগের কোনো সুযোগও ছিল না।

লিঙ্গ বৈষম্য দূর করার লক্ষ্যে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নির্দেশ অনুযায়ী সম্প্রতি 'ফায়ারম্যান' পদের নাম পরিবর্তন করে 'ফায়ার ফাইটার' নামকরণ করা হয়। ফলে এই পদে নারী-পুরুষ উভয়ের প্রার্থী হওয়ার সুযোগ তৈরি হয়।

প্রতিবেদন : জান্নাতে রোজী

৮ অর্থনীতি : বিশেষ প্রতিবেদন

দেশে জাহাজ পুনঃপ্রক্রিয়াকরণে বছরে আয় ৮০ কোটি ডলার

দেশে জাহাজ পুনঃপ্রক্রিয়াকরণ শিল্প থেকে বছরে আয় হয় ৮০০ মিলিয়ন বা ৮০ কোটি ডলারের বেশি। সেখানে সরকারের রাজস্ব আয় হয় প্রায় ১০ থেকে ১২ কোটি ডলার। একইসঙ্গে এ শিল্পের সঙ্গে প্রত্যক্ষভাবে ৩০ থেকে ৫০ হাজার মানুষ জড়িত। আর পরোক্ষভাবে প্রায় এক লাখ ৫০ হাজার মানুষ এর ওপর নির্ভরশীল। ৮ই নভেম্বর রাজধানীর সোনারগাঁও প্যান প্যাসিফিক হোটেলে এক কর্মশালায় শিল্প মন্ত্রণালয়ের সিনিয়র সচিব জাকিয়া সুলতানা এসব তথ্য তুলে ধরেন। শিল্প মন্ত্রণালয় ও আন্তর্জাতিক সামুদ্রিক সংস্থা (আইএমও) যৌথভাবে অনুষ্ঠানের আয়োজন করে। এতে প্রধান অতিথির বক্তব্যে জাকিয়া সুলতানা বলেন, জাহাজ পুনঃপ্রক্রিয়াকরণ বাংলাদেশের জন্য একটি সম্ভাবনাময় খাত। বাংলাদেশ বিশ্বের মধ্যে অন্যতম প্রধান জাহাজ পুনঃপ্রক্রিয়াকারী দেশ।

বাংলাদেশে ১০৮টি জাহাজ পুনঃপ্রক্রিয়াকরণ ইয়ার্ড রয়েছে, যা চট্টগ্রামের সীতাকুণ্ড উপজেলায় অবস্থিত। এই ইয়ার্ডগুলোর মধ্যে কার্যরত রয়েছে ৫০টি। এদের বার্ষিক জাহাজ পুনঃপ্রক্রিয়াকরণ সক্ষমতা এক কোটি মেট্রিক টনের বেশি। বাংলাদেশের বার্ষিক জাহাজ পুনঃপ্রক্রিয়াজাতকরণ শিল্পের গড় প্রবৃদ্ধি প্রায় ১৪ শতাংশ।

৭৩টি প্রতিষ্ঠান পেল রপ্তানি ট্রফি

শুধু গার্মেন্টস শিল্পের ওপর নির্ভর না করে রপ্তানির জন্য পণ্যের বহুমুখী করতে হবে। এটি করা সম্ভব হলে বিলিয়ন বিলিয়ন ডলার আয় করা যাবে বলে মন্তব্য করেছেন বাণিজ্যমন্ত্রী টিপু মুনশি। ৯ই নভেম্বর রাজধানীর ওসমানী স্মৃতি মিলনায়তনে বাণিজ্য মন্ত্রণালয় ও রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরোর যৌথ উদ্যোগে আয়োজিত জাতীয় রপ্তানি ট্রফি ২০২০-২০২১ প্রদান অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি এসব কথা বলেন।

২০২০-২০২১ অর্থবছরের সর্বোচ্চ রপ্তানি আয়ের ভিত্তিতে সেরা রপ্তানিকারক প্রতিষ্ঠানসহ ২৮টি পণ্য ক্যাটাগরিতে ৭৩টি প্রতিষ্ঠানকে জাতীয় রপ্তানি ট্রফি প্রদান করা হয়। সর্বোচ্চ রপ্তানিকারক প্রতিষ্ঠানকে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব রপ্তানি ট্রফি প্রদান করা হয়। রপ্তানিতে ২০২০-২০২১ অর্থবছরে সর্বাধিক বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনকারী প্রতিষ্ঠান হিসেবে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব রপ্তানি ট্রফি ও সনদ পেল হা-মীম গ্রুপের প্রতিষ্ঠান রিফাত গার্মেন্টস লিমিটেড।

রপ্তানি ট্রফি পাওয়া অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের মধ্যে তৈরি পোশাকের ওভেন ক্যাটাগরিতে স্বর্ণপদক পেয়েছে স্লোটেক্স আউটওয়্যার। এ ক্যাটাগরিতে এ কে এম নিটওয়্যার রৌপ্য এবং তারাশিমা অ্যাপারেলস ব্রোঞ্জপদক পেয়েছে। নিটওয়্যার ক্যাটাগরিতে ফ্লামিংগো ফ্যাশন স্বর্ণ, জিএমএস কম্পোজিট নিটিং ইন্ডাস্ট্রিজ রৌপ্য এবং লিবার্টি নিটওয়্যার ব্রোঞ্জপদক পেয়েছে। সব ধরনের সুতা ক্যাটাগরিতে স্বর্ণপদক পেয়েছে বাদশা টেক্সটাইলস। এছাড়া স্কয়ার টেক্সটাইল রৌপ্য ও এনজেড টেক্সটাইল ব্রোঞ্জপদক পেয়েছে। টেক্সটাইল ফ্যাব্রিকসে স্বর্ণপদক পেয়েছে হা-মীম ডেনিম লিমিটেড। এনভয় টেক্সটাইলস রৌপ্য ও আকিজ টেক্সটাইল মিলস ব্রোঞ্জ পদক লাভ করেছে। হোম ও স্পেশালাইজড টেক্সটাইল খাতে স্বর্ণপদক পেয়েছে জাবের অ্যান্ড জোবায়ের ফ্যাব্রিকস ও মমটেক্স এক্সপো রৌপ্যপদক পেয়েছে। আর টেরিটাওয়েলে স্বর্ণপদক পেয়েছে নোমান টেরিটাওয়েল মিলস।

কাঁচা পাট খাতে ইন্টারন্যাশনাল জুট ট্রেডার্স স্বর্ণ ও মেসার্স সারতাজ ট্রেড ইন্টারন্যাশনাল রৌপ্যপদক পেয়েছে। পাটজাত দ্রব্যে আকিজ জুট মিলস স্বর্ণ, জনতা জুট মিলস রৌপ্য এবং জোবাইদা করিম জুট স্পিনার্স ব্রোঞ্জপদক পেয়েছে। চামড়াজাত পণ্যে পিকার্ড বাংলাদেশ স্বর্ণ এবং এবিসি ফুটওয়্যার ইন্ডাস্ট্রিজ রৌপ্যপদক পেয়েছে। এছাড়া ফুটওয়্যার খাতে বে-ফুটওয়্যার স্বর্ণ ও সনিভার্স ফুটওয়্যার রৌপ্যপদক লাভ করেছে। এ খাতে ব্রোঞ্জপদক পেয়েছে অ্যালায়েন্স লেদার গুডস অ্যান্ড ফুটওয়্যার। কৃষিজ পণ্যে (তামাক ব্যতীত) স্বর্ণপদক পেয়েছে ইনডিগো করপোরেশন। মনসুর জেনারেল ট্রেডিং রৌপ্য ও ব্রোঞ্জপদক পেয়েছে হেরিটেজ এন্টারপ্রাইজ। কৃষি প্রক্রিয়াজাত পণ্যে (তামাকজাত পণ্য ব্যতীত) প্রাণ ডেইরি স্বর্ণ, হবিগঞ্জ অ্যাগ্রো রৌপ্য এবং এলিন ফুড প্রডাক্টস ব্রোঞ্জপদক পেয়েছে।

ফুল-ফলিয়েজ ক্যাটাগরিতে রাজধানী এন্টারপ্রাইজ স্বর্ণ ও রৌপ্যপদক পেয়েছে এলিন ফুডস ট্রেড। এছাড়া হস্তশিল্পজাত পণ্য খাতে কারুপণ্য রংপুর স্বর্ণ, বিডি ক্রিয়েশন রৌপ্য এবং ক্লাসিক্যাল হ্যান্ডমেইড প্রডাক্টস ব্রোঞ্জপদক পেয়েছে। মেলামাইন খাতে স্বর্ণপদক পেয়েছে ডিউরেবল প্লাস্টিক। প্লাস্টিক পণ্য খাতে স্বর্ণপদক পেয়েছে বেঙ্গল প্লাস্টিকস। অলপ্লাস্ট বাংলাদেশ রৌপ্য এবং বেঙ্গল পলি অ্যান্ড পেপার স্যাক ব্রোঞ্জপদক পেয়েছে।

সিরামিক সামগ্রী খাতে শাইনপুকুর সিরামিকস স্বর্ণ ও রৌপ্যপদক পায় আর্টিসান সিরামিকস। হালকা প্রকৌশল খাতে মেঘনা বাংলাদেশ স্বর্ণ, রংপুর মেটাল ইন্ডাস্ট্রিজ রৌপ্য এবং ইউনিগ্লোরি সাইকেল কম্পোনেন্টস ব্রোঞ্জপদক পেয়েছে। ইলেকট্রিক ও ইলেকট্রনিকস পণ্য খাতে এনার্জিপ্যাক ইঞ্জিনিয়ারিং স্বর্ণ, ওয়ালটন হাই-টেক ইন্ডাস্ট্রিজ রৌপ্য এবং বিআরবি কেবল ইন্ডাস্ট্রিজ ব্রোঞ্জপদক পেয়েছে।

অন্যান্য শিল্পজাত পণ্য খাতে মেরিন সেফটি সিস্টেম স্বর্ণপদক, এশিয়া মেটাল মেরিন সার্ভিস রৌপ্য এবং বিএসআরএম স্টিলস ব্রোঞ্জপদক পেয়েছে। ফার্মাসিউটিক্যাল পণ্যে বেক্সিমকো ফার্মাসিউটিক্যালস স্বর্ণ, ইনসেপ্টা ফার্মাসিউটিক্যালস রৌপ্য এবং স্কয়ার ফার্মাসিউটিক্যালস ব্রোঞ্জপদক পেয়েছে। কম্পিউটার সফটওয়্যার ক্যাটাগরিতে সার্ভিস ইঞ্জিন স্বর্ণ এবং গোল্ডেন হার্ভেস্ট ইনফোটেক রৌপ্যপদক পেয়েছে। ইপিজেডভুক্ত বাংলাদেশি মালিকানাধীন তৈরি পোশাক ক্যাটাগরিতে ইউনিভার্সেল জিন্স স্বর্ণ, প্যাসিফিক জিন্স রৌপ্য এবং এনএইচটি ফ্যাশন ব্রোঞ্জপদক পেয়েছে।

প্রতিবেদন : মো. জামাল উদ্দিন

যোগাযোগ ও নিরাপদ সড়ক : বিশেষ প্রতিবেদন

দোহাজারী-কক্সবাজার রেলপথ উদ্বোধন

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ১১ই নভেম্বর দোহাজারী-কক্সবাজার রেলপথ উদ্বোধন করেন। সেই সঙ্গে এই প্রকল্পের অধীন নির্মিত দেশের একমাত্র আইকনিক রেলস্টেশনেরও উদ্বোধন করেন প্রধানমন্ত্রী। বহুল প্রতীক্ষিত এই প্রকল্প উদ্বোধনের কারণে দক্ষিণ-পূর্বাঞ্চলের সঙ্গে সারা দেশের যোগাযোগের দ্বার উন্মোচিত হলো। আগামী ডিসেম্বর মাসের শুরু থেকেই এই রেলপথে বাণিজ্যিক ট্রেন চলাচল করবে বলে রেলমন্ত্রী নূরুল ইসলাম জানান। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন রেলমন্ত্রী নূরুল ইসলাম। স্বাগত বক্তব্য দেন রেলপথ মন্ত্রণালয়ের সচিব মো. হুমায়ুন কবির। এরপর ভিডিও চিত্রের মাধ্যমে আইকনিক রেলস্টেশন ও দোহাজারী-কক্সবাজার রেলপথ নির্মাণের বিস্তারিত তুলে ধরা হয়।

উদ্বোধনী বক্তব্যে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বলেন, 'কথা দিয়েছিলাম, কথা রাখলাম। চট্টগ্রামের দোহাজারী থেকে কক্সবাজার পর্যন্ত ১০১ কিলোমিটার রেললাইন নির্মাণ হলো। রেল সংযোগে অন্তর্ভুক্ত হলো দীর্ঘতম সমুদ্রসৈকতের শহর কক্সবাজার। তাতে আমিও আনন্দিত। মানুষের দীর্ঘদিনের দাবি ছিল রেললাইন নির্মাণ করার। সেই রেললাইনের উদ্বোধন হলো আজ।'

কক্সবাজার সমুদ্রসৈকতের কলাতলী থেকে মাত্র ৬ কিলোমিটার দূরে ঝিলংজা ইউনিয়নের চান্দের পাড়াতে ২৯ একর জমিতে নির্মিত হয়েছে ১ লাখ ৮৭ হাজার বর্গফুটের দৃষ্টিনন্দন ছয়তলা ভবনের এই রেলস্টেশন। যেখানে থাকছে তারকা মানের হোটেল, শপিং মল, রেস্টুরেন্ট, শিশুযত্ন কেন্দ্র, পোস্ট অফিস, কনভেনশন সেন্টার, ইনফরমেশন বুথ, এটিএম বুথ, প্রার্থনার স্থান, লাগেজ রাখার লকারসহ অত্যাধুনিক সব সুবিধা।

২০১৮ সালের জুলাইয়ে শুরু হয় ১৮ হাজার ৩৪ কোটি টাকার দোহাজারী-কক্সবাজার রেলপথ নির্মাণ প্রকল্পের কাজ। চীনের ঠিকাদারি প্রতিষ্ঠান চায়না রেলওয়ে ইঞ্জিনিয়ারিং করপোরেশন (সিআরইসি) ও বাংলাদেশের তমা কনস্ট্রাকশন কোম্পানি এবং চায়না সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং কনস্ট্রাকশন করপোরেশন (সিসিইসিসি) ও বাংলাদেশের ম্যাক্স ইনফ্রাস্ট্রাকচার লিমিটেড দুই ভাগে কাজ করছে। এটি সরকারের অগ্রাধিকার (ফাস্ট ট্র্যাক) প্রকল্পের অন্তর্ভুক্ত। এর মধ্যে আইকনিক রেলস্টেশন নির্মাণের বিপরীতে খরচ হচ্ছে ২১৫ কোটি টাকা।

ঢাকার ইতিহাস ঐতিহ্য ধরে রাখতে বুড়িগঙ্গা মঞ্চ কার্যকর ভূমিকা রাখবে

১৪ই নভেম্বর নৌপরিবহণ প্রতিমন্ত্রী খালিদ মাহমুদ চৌধুরী পুরানো ঢাকার বিআইডব্লিউটিএ'র সোয়ারীঘাট ল্যান্ডিং স্টেশন সংলগ্ন 'বুড়িগঙ্গা মঞ্চ'-এর উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তৃতায় বলেন, আদি বুড়িগঙ্গা নদীর উন্নয়নে ১৪০০ কোটি টাকার প্রকল্প পাস হয়েছে। এটি বাস্তবায়িত হলে পুরানো ঢাকার

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ১১ই নভেম্বর ২০২৩ কক্সবাজারে পতাকা উড়িয়ে দোহাজারী-কক্সবাজার ট্রেন চলাচল উদ্বোধন করেন– পিআইডি

মানুষ আরেকটি হাতিরঝিল পাবে। সেটি আরও আধুনিক হবে। এলাকার পরিবর্তন হবে। ঢাকার ইতিহাস সংরক্ষণ করা, ঢাকার ইতিহাস চর্চা এবং ঢাকার ডাক শব্দ চর্চার জায়গা তৈরি হলো বুড়িগঙ্গা মঞ্চ। ব্যবসায়ী ও রাজনীতিবিদরা বুড়িগঙ্গা দিয়ে তাদের যাত্রা শুরু করেছিলেন। ঢাকার ইতিহাস ঐতিহ্য ধরে রাখতে বুড়িগঙ্গা মঞ্চ কার্যকর ভূমিকা রাখবে।

প্রতিবেদন: ক্ষিরোদ চন্দ্র বর্ম্মণ

কৃষি : বিশেষ প্রতিবেদন

গোপালগঞ্জে বিনাধান-১৭-এর মাঠ দিবস

বাংলাদেশ পরমাণু কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট (বিনা) উদ্ভাবিত উচ্চ ফলনশীল ও স্বল্প জীবনকাল সম্পন্ন বিনাধান-১৭-এর চাষাবাদ সম্প্রসারণের লক্ষ্যে মাঠ দিবস অনুষ্ঠিত হয়েছে।

২০শে অক্টোবর কাশিয়ানী উপজেলার ফুকরা গ্রামে বিনা গোপালগঞ্জ উপকেন্দ্র আয়োজিত এ মাঠ দিবসে প্রধান অতিথির বক্তব্য দেন– বিনা'র মহাপিরচালক (রুটিন দায়িত্ব) ড. মো. আবুল কালাম আজাদ।

বিনার মহাপরিচালক ড. আজাদ বলেন, বিনাধান-১৭ একটি উচ্চ ফলনশীল ও স্বল্প জীবনকাল সম্পন্ন ধানের জাত। এই ধানের জীবনকাল মাত্র ১০০ দিন থেকে ১০৫ দিন। কৃষক এই ধানের আবাদ করে ৩ ফসলি জমিকে ৪ ফসলি জমিতে রূপান্তরিত করতে পারবেন। বিনা প্রধান বলেন, বিনাধান-১৭ চাষাবাদে সেচের পানি সাশ্রয় করে। এছাড়া ইউরিয়া বা নাইট্রোজেন সার ৩০ শতাংশ কম লাগে। এতে কৃষক কম খরচে বেশি ধান উৎপাদন করে লাভবান হতে পারবেন।

হবিগঞ্জের শায়েস্তাগঞ্জে ৪০০ কৃষককে প্রণোদনার সার ও বীজ প্রদান

হবিগঞ্জ জেলার শায়েস্তাগঞ্জে ৪০০ জন কৃষকের মধ্যে প্রণোদনার বীজ ও সার বিতরণ করা হয়েছে। ২০শে অক্টোবর স্থানীয় সারগুদাম মাঠে ২০২৩-২০২৪ অর্থবছরে রবি মৌসুমে গম, ভুট্টা, সরিষা ও সূর্যমুখীর আবাদ ও উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে প্রণোদনা কর্মসূচির আওতায় ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক কৃষকদের মধ্যে বিনামূল্যে বীজ ও সার বিতরণ করা হয়।

অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে কৃষকদের মধ্যে সার ও বীজগুলো বিতরণ করেন হবিগঞ্জ-৩ আসনের এমপি জেলা আওয়ামী লীগ সভাপতি আলহাজ এডভোকেট মো. আবু জাহির। উপজেলা সহকারী কমিশনার (ভূমি) মো. নাহিদ ভূঞার সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি ছিলেন উপজেলা পরিষদ চেয়ারম্যান আব্দুর রশিদ তালুকদার ইকবাল। স্বাগত বক্তব্য রাখেন, উপজেলা কৃষি কর্মকর্তা কৃষিবিদ মো. মশিউর রহমান।

অনুষ্ঠানে ৩০০ জন কৃষকের প্রত্যেকে ১ কেজি সরিষা বীজ, ১০ কেজি ডিএপি ও ১০ কেজি এমওপি সার, ৫০ জন কৃষকের প্রত্যেকে ২ কেজি ভুট্টা বীজ, ২০ কেজি ডিএপি ও ১০ কেজি এমওপি সার, ২০ জন কৃষকের প্রত্যেকে ২০ কেজি গমের বীজ, ১০ কেজি ডিএপি ও ১০ কেজি এমওপি সার এবং ৩০ জন কৃষকের প্রত্যেকে ১ কেজি সূর্যমুখী বীজ, ১০ কেজি ডিওপি ও ১০ কেজি এমওপি সার দেওয়া হয়।

প্রতিবেদন: জান্নাত হোসেন

পরিবেশ ও জলবায়ু : বিশেষ প্রতিবেদন

উন্নত সবুজ প্রযুক্তি সকল উন্নয়নশীল মুসলিম দেশের সাথে শেয়ার করার আহ্বান

পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রী মো. শাহাব উদ্দিন বলেন, প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার গতিশীল নেতৃত্বে বাংলাদেশ সরকার দেশকে জলবায়ু সহনশীল করতে সর্বাত্মক চেষ্টা করে যাচ্ছে। কিন্তু বাংলাদেশের মতো জলবায়ু ঝুঁকিপূর্ণ দেশগুলোতে একটি বৃহত্তর কাঠামোগত পরিবর্তন এবং টেকসই পরিবর্তনের জন্য বহুপাক্ষিক উৎস থেকে পাবলিক ফান্ডকে অগ্রাধিকার দিতে হবে। পরিচ্ছন্ন এবং উন্নত সবুজ প্রযুক্তির সুবিধা সকল উন্নয়নশীল মুসলিম দেশের সাথে ভাগ করে নেওয়া প্রয়োজন।

১৯শে অক্টোবর সৌদি আরবের জেদ্দায় অনুষ্ঠিত ইসলামিক বিশ্বের পরিবেশ মন্ত্রীদের ৯ম সম্মেলন 'ইসলামিক বিশ্বে সবুজ রূপান্তর: 'চ্যালেঞ্জ এবং সুযোগ' শীর্ষক প্রথম বৈজ্ঞানিক সেশনে মন্ত্রী এসব কথা বলেন।

মন্ত্রী বলেন, পরিবেশ, জলবায়ু পরিবর্তন এবং জ্বালানি খাতে আমাদের সহযোগিতা বাড়ানোর অপেক্ষায় রয়েছি। পরিবেশবান্ধব

সবুজ বৃদ্ধি নিশ্চিত করতে এবং আমাদের ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য একটি নিরাপদ ও উন্নত বিশ্ব গড়ে তুলতে আইসিইএসসি'র সদস্যদের আমাদের অংশীদারিত্ব সুসংহত করার আহ্বান জানাই। তিনি বলেন, বাংলাদেশ সরকার ফিলিস্তিনে দখলদার ইসরায়েল বাহিনীর নৃশংসতা, বেসামরিক মানুষদের নির্বিচারে হত্যা, ব্যাপক ধ্বংসযজ্ঞ, সারা বিশ্বের সামনে লাখ লাখ ফিলিস্তিনের নজিরবিহীন দুর্ভোগের তীব্র নিন্দা জানায়।

শব্দদূষণমুক্ত দেশ গড়তে বিশেষ কর্মসূচি বাস্তবায়ন

পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রী মো. শাহাব উদ্দিন বলেন, দেশের মানুষকে শব্দদূষণমুক্ত পরিবেশ উপহার দিতে বিশেষ কর্মসূচি বাস্তবায়ন করা হচ্ছে, ১৫ই অক্টোবর ঢাকা শহরে শব্দহীন কর্মসূচি পালন করা হবে। তিনি বলেন, শুধু দূষণমুক্ত পরিবেশ নয়, মানুষের সামাজিক নিরাপত্তা ও মর্যাদা নিশ্চিত করতে শেখ হাসিনা সরকার নিরলসভাবে কাজ করছে। প্রধানমন্ত্রীর দূরদর্শী চিন্তার সুফল মানুষ ভোগ করছে।

মন্ত্রী বলেন, প্রতিটি ইউনিয়নে ভিজিডি, ভিজিএফ, বিধবা ও মাতৃত্বকালীন ভাতাসহ বিভিন্ন কর্মসূচির মাধ্যমে বড়লেখায় অন্তত ৭০ হাজার মানুষকে নিরবচ্ছিন্ন সহায়তার আওতায় এনেছে বর্তমান সরকার।

অনুষ্ঠানে জানানো হয়, গত পাঁচ বছরে বড়লেখা উপজেলার ৪০ হাজার ৪৭০ জন কৃষকের মাঝে কৃষি যন্ত্রপাতি এবং বিনামূল্যে সারবীজসহ বিভিন্ন উপকরণ বাবদ ব্যয় হয়েছে ৪ কোটি ৯৫ লাখ টাকা, সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচি (ভিজিডি)-এর আওতায় ৪ হাজার ৬৫৬ জন নারীকে ২৭শ' মেট্রিক টন চাল প্রদান, মা ও শিশু কর্মসূচির আওতায় ৩ হাজার ৩১০ জনকে ৭ কোটি ১ লাখ ৪২ হাজার টাকা প্রদান, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনার অধিদপ্তরের আওতায় ভূমিহীন ও গৃহহীন পরিবারের জন্য ১১ কোটি ৪৪ লাখ ৩৮ হাজার টাকা ব্যয়ে ৪৬৯টি ঘর নির্মাণ, সমাজসেবা কার্যালয়ে অধীনে সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচির আওতায় ২১ হাজার ৮১০ জন উপকারভোগীর মাঝে বিভিন্ন খাতে প্রায় ৬০ কোটি টাকা ব্যয় করা হয়েছে।

পরিবেশবান্ধব ইট উৎপাদনকারীদের প্রণোদনা প্রদান করবে সরকার

পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রী মো. শাহাব উদ্দিন বলেন, পরিবেশবান্ধব ব্লক ইট উৎপাদনকারীদের প্রণোদনা প্রদান করবে সরকার। তিনি বলেন, ইটভাটার ধোঁয়া পরিবেশের জন্য অনেক ক্ষতিকর, তাই পুরানো ইটের বিকল্প হিসেবে পরিবেশবান্ধব ব্লক ইটের ব্যবহার বৃদ্ধি করতেই হবে। প্রথমদিকে এটার প্রচলন কষ্টকর হলেও পরিবেশের স্বার্থে সবাইকে এটা গ্রহণ করতে হবে।

১১ই অক্টোবর সিলেটের তেমুখী, কুমারগাঁওয়ে অবস্থিত পরিবেশবান্ধব চায়না-বাংলা হলো ব্লক ফ্যাক্টরির উদ্বোধন উপলক্ষে আয়োজিত অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে পরিবেশ মন্ত্রী এসব কথা বলেন।

মন্ত্রী বলেন, বর্তমান সরকার ক্ষমতা গ্রহণের পর দেশের মানুষের জন্য বাসযোগ্য পরিবেশ নিশ্চিতকরণে কাজ করছে। শব্দদূষণ রোধে বিভিন্ন কর্মসূচি বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। শব্দদূষণ রোধে সচেতনতা বৃদ্ধির জন্য ১৫ই অক্টোবর ঢাকা মহানগরে শব্দহীন কর্মসূচি পালন করা হয়। তিনি বলেন, দেশের সকলে অপ্রয়োজনে শব্দ সৃষ্টি করা থেকে বিরত থাকলে সবার জন্য মঙ্গল হবে।

মন্ত্রী এর পূর্বে রাতারগুলে জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব নিরসনে সিলেট বন বিভাগের অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্পের আওতায় নবনির্মিত পার্কিং প্লেস, ভিজিটর শেড, ট্যুরিস্ট শপ এবং পাবলিক টয়লেটের উদ্বোধন করেন।

জলবায়ু পরিবর্তন বিষয়ে একটি পরিপূর্ণ, স্বচ্ছ এবং যাচাইযোগ্য ডেটাবেইস প্রস্তুতের লক্ষ্যে কাজ করছে সরকার

পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়ের সচিব ড. ফারহিনা আহমেদ বলেন, প্যারিস জলবায়ু চুক্তি ২০১৫ অনুযায়ী বাংলাদেশের জ্বালানি, কৃষি, বন, শিল্প প্রভৃতি সেক্টরের জন্য জাতীয় পর্যায়ে নিয়মিত ভিত্তিতে একটি পরিপূর্ণ, স্বচ্ছ এবং যাচাইযোগ্য ডেটাবেইস প্রস্তুত করার লক্ষ্যে কাজ করছে সরকার। গ্রিন হাউস গ্যাস নিঃসরণ, জলবায়ু পরিবর্তন অভিযোজন এবং প্রশমন সম্পর্কিত তথ্য সংগ্রহের প্রক্রিয়াকে আরও টেকসই এবং উক্ত তথ্য-উপাত্ত বিশ্লেষণ করে জাতীয় প্রতিবেদন আকারে নির্ভুলভাবে ইউএনএফসিসি-তে দাখিল করার লক্ষ্যে পরিবেশ অধিদপ্তরের সাথে বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোর সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষরিত হয়।

৯ই অক্টোবর হোটেল ইন্টারকন্টিনেন্টাল, ঢাকায় পরিবেশ অধিদপ্তর কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন 'স্ট্রেংথেনিং ক্যাপাসিটি ফর এনভায়রনমেন্টাল এমিশন আন্ডার দ্য প্যারিস এগ্রিমেন্ট ইন বাংলাদেশ' শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় অনুষ্ঠিত সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষর অনুষ্ঠানে পরিবেশ সচিব এসব কথা বলেন।

পরিবেশ সচিব ফারহিনা আহমেদ বলেন, গ্রিন হাউস গ্যাস নিঃসরণ, জলবায়ু পরিবর্তন অভিযোজন এবং প্রশমন সম্পর্কিত তথ্য সংগ্রহের কাজ আরও সহজ, ব্যয় সাশ্রয়ী ও যাচাইযোগ্য করার লক্ষ্যে এই প্রকল্পের অধীনে ইতোমধ্যে একটি ওয়েবভিত্তিক বাংলাদেশ ক্লাইমেট চেইঞ্জ এমআরভি সিস্টেম তৈরি করা হয়েছে যেখানে সংশ্লিষ্ট অংশীজনরা সরাসরি তাদের তথ্য-উপাত্ত ইনপুট দিতে পারবেন এবং প্রদানকৃত তথ্য-উপাত্তের আলোকে তৈরি বিশ্লেষণসমূহ পর্যবেক্ষণ করতে পারবেন।

গত তিন বছরে ২৪ হাজার ৩২২ একর অবৈধ দখলকৃত বনভূমি পুনরুদ্ধার

পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রী মো. শাহাব উদ্দিন বলেন, বর্তমান সরকার অক্টোবর ২০২০ থেকে আগস্ট ২০২৩ পর্যন্ত ২৪ হাজার ৩২২ একর জবরদখলকৃত বনভূমি পুনরুদ্ধার করে বনায়ন করেছে। অবৈধ বনভূমি পুনরুদ্ধারে সফলতার এ ধারা চলমান আছে। তিনি বলেন, যারা বৈধ কাগজপত্র ছাড়া বনের জমি দখলে রাখবে তাদের বিরুদ্ধে অভিযান অব্যাহত থাকবে।

৭ই অক্টোবর ইকোট্যুরিজম উন্নয়ন ও টেকসই ব্যবস্থাপনা প্রকল্পের আওতায় টাঙ্গাইলের মধুপুর জাতীয় উদ্যানের দোখলা রেঞ্জে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের নবনির্মিত 'ম্যুরাল উন্মোচন' উপস্থিত সাংবাদিকদের প্রশ্নের জবাবে পরিবেশ মন্ত্রী এসব কথা বলেন।

পরিবেশ মন্ত্রী বলেন, আমাদের দেশে ২২ দশমিক ৩৭ শতাংশ বনভূমি আছে, যা ২৫ শতাংশে উন্নীত করতে হবে। এজন্য সরকারের পাশাপাশি সাধারণ মানুষকে এগিয়ে আসতে হবে। জনগণের মধ্যে জনসচেতনতা সৃষ্টি করতে পারলে অবৈধ দখল কমে যাবে এবং মানুষ বৃক্ষরোপণে উদ্বুদ্ধ হবে। এ বিষয়ে তিনি গণমাধ্যমের সহায়তা কামনা করেন।

প্রতিবেদন: সানজিদা আহমেদ

চলচ্চিত্র ও সংস্কৃতি : বিশেষ প্রতিবেদন

মুম্বাইয়ে পুরস্কৃত বাংলাদেশের চলচ্চিত্র *বাড়ির নাম শাহানা*

ভারতে 'জিও মামি মুম্বাই চলচ্চিত্র উৎসবে' পুরস্কার পেয়েছে বাংলাদেশের সিনেমা *বাড়ির নাম শাহানা*। ২৭শে অক্টোবর থেকে ৫ই নভেম্বর পর্যন্ত চলা সিনে উৎসবে 'জেন্ডার সেনসিটিভিটি অ্যাওয়ার্ড' ক্যাটাগরিতে পুরস্কার পায় চলচ্চিত্রটি।

সত্য কাহিনি অবলম্বনে বিবাহবিচ্ছেদ নেওয়া নব্বই দশকের এক নারীর গল্প নিয়ে চলচ্চিত্রটি পরিচালনা করেন লীসা গাজী। লীসা গাজীর সঙ্গে যৌথভাবে চলচ্চিত্রটির চিত্রনাট্য লিখেছেন আনান সিদ্দীকা। প্রযোজনা করেছে কমলা কালেক্টিভ। গুপী বাঘা প্রডাকশন লিমিটেড-এর সাথে অংশীদারিত্বে নির্মিত হয়েছে সিনেমাটি।

সিনেমাটি মুম্বাই উৎসব ছাড়াও বিএফআই লন্ডন ইন্ডিয়ান ফিল্ম চলচ্চিত্র ফেস্টিভ্যাল, বার্মিংহাম ইন্ডিয়ান ফিল্ম ফেস্টিভ্যাল, ইয়র্কশায়ার ইন্ডিয়ান ফিল্ম ফেস্টিভ্যালে অংশ নিয়েছে চলচ্চিত্র *বাড়ির নাম শাহানা*।

এতে অভিনয় করেন– আনান সিদ্দীকা, লুৎফর রহমান জর্জ, ইরেশ যাকের, কাজী রুমা, কামরুন্নাহার মুন্নী, মুগ্ধতাসহ আরও অনেকে।

সেরা সিনেমার পুরস্কার জিতল *মাইক*

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ঐতিহাসিক ৭ই মার্চের ভাষণকে উপজীব্য করে নির্মিত হয় শিশুতোষ চলচ্চিত্র *মাইক*। সম্প্রতি সিঙ্গাপুরে অনুষ্ঠিত টেক্কা ইন্টারন্যাশনাল ফিল্ম ফেস্টিভ্যালে অফিসিয়াল সিলেকশনের পর বেস্ট এশিয়ান ফিচার ফিল্মের মুকুট জিতেছে বাংলাদেশের চলচ্চিত্র *মাইক*।

তরুণ লেখক, কলামিস্ট ও সংগঠক এফ এম শাহীনের প্রযোজনায় চলচ্চিত্রটি যৌথভাবে পরিচালনা করেন এফ এম শাহীন ও হাসান জাফরুল বিপুল।

সরকারি অনুদানে নির্মিত *মাইক* গত ১১ই আগস্ট সারা দেশে মুক্তি পায়। এতে অভিনয় করেন– ফেরদৌস আহমেদ, তানভিন সুইটি, তারিক আনাম খান, নাদের চৌধুরী, ঝুনা চৌধুরী, জয়িতা মহলানবিশসহ আরও অনেকে।

উদীচীর ৫৫তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উদ্‌যাপিত

সুর-ছন্দ, কথা ও কবিতায় প্রতিষ্ঠার ৫৫তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উদ্‌যাপন করেছে দেশের বৃহত্তম সাংস্কৃতিক সংগঠন বাংলাদেশ উদীচী শিল্পীগোষ্ঠী।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের চারুকলা অনুষদের বকুলতলায় ২৯শে অক্টোবর ৫৫তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উদ্‌যাপন করা হয়। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের চারুকলা অনুষদের সাবেক ডিন ও চিত্রশিল্পী আবুল বারক আলভী অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করেন।

নিপীড়িত মানুষের গান গাওয়ার অঙ্গীকার নিয়ে ন্যায় ও অধিকার প্রতিষ্ঠার সংগ্রামে সোচ্চার হওয়ার লক্ষ্যে ১৯৬৮ সালের ২৯শে অক্টোবর প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল 'বাংলাদেশ উদীচী শিল্পীগোষ্ঠী'। প্রতিষ্ঠাবার্ষিকীর এবারের স্লোগান ছিল– 'সংস্কৃতির সংগ্রামে দ্রোহের দীপ্তি, মুক্তির লড়াইয়ে অজেয় শক্তি'। সভ্যতা মানুষের কীর্তির উপর হয়। সংস্কৃতি মানুষের পরিচয় বহন করে নিয়ে যায়। সুতরাং আমাদের সংস্কৃতি যদি বিপন্ন হয়, তাহলে আমার পরিচয় বিপন্ন হবে।

সংস্কৃতিতে অনন্য অবদানের স্বীকৃতিস্বরূপ অনুষ্ঠানে অধ্যাপক কাজী মদিনা ও শিল্পী আনোয়ার হোসেনকে সম্মাননা প্রদান করা হয়।

উদীচীর সহ-সাধারণ সম্পাদক সঙ্গীতা ইমামের সঞ্চালনায় অনুষ্ঠানে উদীচী কেন্দ্রীয় সংসদের সাধারণ সম্পাদক অমিত রঞ্জন দে, সহ-সভাপতি মাহমুদ সেলিম বক্তব্য দেন।

প্রতিবেদন: তানিয়া ইয়াসমিন সম্পা

১০৯ সামাজিক নিরাপত্তা : বিশেষ প্রতিবেদন

জীবন বদলে দিয়েছে প্রধানমন্ত্রীর উপহারের ঘর

মানিকগঞ্জের ঘিওর উপজেলার ভূমিহীন ও গৃহহীনদের জীবন পাল্টে গেছে। অনেক দিনের কাঙ্ক্ষিত স্বপ্ন পূরণ হয়েছে এই মানুষগুলোর। তার একমাত্র কারণ হলো প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার উপহারের জায়গা ও ঘর পাওয়া। নতুন ঘর পেয়ে আনন্দে কাটছে তাদের জীবন। সরকারের পাকা ঘর ও জায়গা পেয়ে অনেক খুশি।

এই এলাকার সংসদ সদস্য এএম নাইমুর রহমান দুর্জয় জানান, ঘিওরে আশ্রয়ণ-২ প্রকল্পের আওতায় মোট ১০৫টি ঘর বরাদ্দ দেওয়া হয়। এই ঘরগুলোর জন্য মোট ২১ কোটি ৫৬ লাখ টাকা বরাদ্দ দেওয়া হয়েছে। প্রথম ২৫টি ঘরের জন্য প্রতিটি ঘর এক লাখ ৭১ হাজার, ২য় পর্যায়ে ৫০টি ঘরের জন্য প্রতিটি এক লাখ ৯০ হাজার এবং ৩য় পর্যায়ে প্রতিটি ঘরের জন্য দুই লাখ ৫৯

হাজার টাকা বরাদ্দ দেওয়া হয়েছে।

আশ্রয়ণ প্রকল্পের ঘর ও জমি পাওয়া বাসিন্দারা জানান, আগে অন্যের জমিতে ভাঙাচোরা ঘরে রোদ-বৃষ্টি উপেক্ষা করে থাকতে হয়েছে। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা আমারে একটি ঘর দিছেন। অভাবের সংসার আমি কখনও কল্পনাও করিনি এত সুন্দর একটি ঘর পাবো। পরিবারের সবাইকে নিয়ে ভালো আছি।

জোকা আশ্রয়ণ প্রকল্পে বসবাসকারী নাট্যশিল্পী ছায়া রানী বলেন, তিন শতাধিক নাটকে কত রকমের অভিনয় করেছি। আমাগো নিজস্ব জমি ছিল না। রাস্তার পাশে ছাপরা ঘরে থাকতাম। চায়ের দোকান চালিয়ে কোনোরকম চলতাম। শেষ বয়সে প্রধানমন্ত্রীর দেওয়া উপহারের ঘরে আশ্রয় হয়েছে। পাকা ঘরে রাতে আরামে ঘুমাতে পারি। ঘরের পাশে জায়গাটিতে সবজি চাষ করে পরিবারের খাওয়া এবং বিক্রি করে বাড়তি আয়ও করতে পারছি। আমাদের সংসারে সচ্ছলতা এসেছে।

উল্লেখ্য, আশ্রয়ণ প্রকল্পের লোকজন জমিও সঙ্গে পেয়েছেন। নতুন ঘরের সাথে রয়েছে বিদ্যুৎ, বিশুদ্ধ পানি, পাকা টয়লেট। এই আশ্রয়ণ প্রকল্পে শারীরিক, মানসিক, দৃষ্টি প্রতিবন্ধী, বিধবা, স্বামী পরিত্যক্তা, ভিক্ষুক, ক্ষুদ্র-নৃগোষ্ঠীদের বরাদ্দ দেওয়া হয়েছে। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা তাদের স্বপ্ন বাস্তবায়ন করেছেন। বসবাসরত অসহায় মানুষগুলো ঘুরে দাঁড়াচ্ছে। বদলে যাচ্ছে তাদের জীবনযাত্রার মান।

প্রতিবেদন : মেজবাউল হক

ক্রীড়া : বিশেষ প্রতিবেদন

পাকিস্তানের বিপক্ষে সিরিজ জয়

পাকিস্তান নারী দলকে বড়ো ব্যবধানে হারিয়ে ওয়ানডে সিরিজ জিতল বাংলাদেশ নারী দল। ১০ই নভেম্বর সিরিজ নির্ধারণী ম্যাচে ৭ উইকেটের বড়ো জয় পেয়েছে নিগার সুলতানা জ্যোতির দল। তাতে ২-১ ব্যবধানে সিরিজ নিজেদের করে নিয়েছে স্বাগতিকরা। মিরপুর শের-ই-বাংলা স্টেডিয়ামে টস জিতে আগে ব্যাট করতে নেমে নির্ধারিত ৫০ ওভারে ৯ উইকেট হারিয়ে ১৬৬ রান তোলে পাকিস্তান। জয়ের লক্ষ্যে ব্যাট করতে নেমে শেষ পর্যন্ত ৭ উইকেট থাকতেই জয় পায় বাংলাদেশ। এর আগে নাহিদার রেকর্ড গড়া বোলিংয়ে ২৫শে অক্টোবর প্রথম টি-টোয়েন্টিতে পাকিস্তানকে ৫ উইকেটে হারায় বাংলাদেশ।

২০১৪ সালে দুই ম্যাচের ওয়ানডে সিরিজে তাদের ২-০ ব্যবধানে হারিয়েছিল বাংলাদেশ। এছাড়া ২০২১ সালে জিম্বাবুয়েতে তিন ম্যাচের সিরিজ ৩-০ ব্যবধানে এবং ২০১৬ সালে বৃষ্টির কারণে প্রথম দুই ম্যাচ বৃষ্টিতে ভেসে গেলেও শেষ ম্যাচ জিতে সিরিজ জিতে নেয় বাংলাদেশ।

এই জয়ে আইসিসি ওমেন্স চ্যাম্পিয়নশিপের পয়েন্ট টেবিলে ইংল্যান্ড ও অস্ট্রেলিয়াকে টপকে সাত নম্বরে উঠে আসে বাংলাদেশ। ১২ ম্যাচে বাংলাদেশের পয়েন্ট এখন ১১।

বিশ্বকাপ বাছাইয়ের দ্বিতীয় রাউন্ডে বাংলাদেশ

মালদ্বীপকে হারিয়ে বিশ্বকাপ বাছাইয়ের দ্বিতীয় রাউন্ডে খেলার সুযোগ পেয়েছে বাংলাদেশ। ১৭ই অক্টোবর বিশ্বকাপ প্রাক বাছাই পর্বের ফিরতি ম্যাচে মালদ্বীপের বিপক্ষে ২-১ গোলের জয় পেয়েছে বাংলাদেশ। দ্বিতীয় পর্বে যাওয়ার সুবাদে অনেকগুলো আন্তর্জাতিক ম্যাচ খেলার সুযোগ পাবে বাংলাদেশ দল। অন্যদিকে এ জয়ে র‍্যাংকিংয়ে ছয় ধাপ এগিয়ে ১৮৩ নম্বরে উঠে এসেছে বাংলাদেশ। আগে র‍্যাংকিং ছিল ১৮৯। আগামী এক বছর ছয়টি আন্তর্জাতিক ম্যাচ ছাড়াও তিন বছরের সূচি নির্ধারিত হচ্ছে জামাল ভূঁইয়াদের জন্য। এমনই সুখবর দিলো ফিফা।

বঙ্গবন্ধু তায়কোয়ান্দোতে বাংলাদেশ চ্যাম্পিয়ন

প্রথম বঙ্গবন্ধু ওপেন আন্তর্জাতিক তায়কোয়ান্দো চ্যাম্পিয়নশিপে সেরা হয়েছে স্বাগতিক বাংলাদেশ। ২১শে অক্টোবর বাংলাদেশ ক্রীড়া শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে (বিকেএসপি) অনুষ্ঠিত তিন দিনব্যাপী খেলা শেষে ৩০টি স্বর্ণ, ২০টি রুপা ও ১৫টি ব্রোঞ্জপদক জিতে চ্যাম্পিয়ন হয় বাংলাদেশ। ১৫টি স্বর্ণ, ১০টি রুপা ও ১১টি ব্রোঞ্জ জিতে নেপাল রানার্সআপ এবং আটটি স্বর্ণ, একটি রুপা ও ছয়টি ব্রোঞ্জ জিতে তৃতীয় হয় শ্রীলংকা।

মৈত্রী ডিউবল সিরিজে বাংলাদেশ জয়ী

দুই দেশের মৈত্রী ডিউবল সিরিজের পুরুষ বিভাগে জিতেছে স্বাগতিক বাংলাদেশ। ২৩শে অক্টোবর শেখ রাসেল রোলার স্কেটিং কমপ্লেক্সে শেষ হয়েছে তিন দিনব্যাপী বাংলাদেশ ও ভারতের পুরুষ ও মহিলাদের মৈত্রী সিরিজ। তিনদিনের খেলা শেষে পুরুষ বিভাগে ভারতকে ২-০ সিরিজে হারিয়েছে লাল-সবুজের ছেলেরা।

প্রতিবেদন: মো. মামুন হোসেন

চলে গেলেন একুশে পদকজয়ী নৃত্যশিল্পী জিনাত বরকতুল্লাহ

আফরোজা রুমা

একুশে পদকজয়ী নৃত্যশিল্পী জিনাত বরকতুল্লাহ চলে গেলেন না ফেরার দেশে। দীর্ঘদিন ধরে তিনি নানা ধরনের শারীরিক জটিলতায় ভুগছিলেন। ধানমন্ডির নিজ বাসায় তিনি শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করেন। মৃত্যুকালে তার বয়স হয়েছিল ৭০ বছর।

জিনাত বরকতুল্লাহ ১৯৫২ সালের ৩রা অক্টোবর কুমিল্লা জেলায় জন্মগ্রহণ করেন। তার পূর্বপুরুষেরা চাঁদপুরের হলেও তার দাদা ধানমন্ডির সিদ্দিক বাজারে বাড়ি করেন। জিনাত বরকতুল্লাহ চার বছর বয়সে নৃত্যশিল্পী গাজী আলিমুদ্দিন মান্নানের কাছে নৃত্য শেখা শুরু করেন। এছাড়াও বুলবুল ললিতকলা একাডেমিতে নৃত্য শিক্ষা লাভ করেন। তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাজকল্যাণ বিভাগ থেকে স্নাতকোত্তর সম্পন্ন করেন।

স্নাতকোত্তর সম্পন্ন করার পর তিনি একই প্রতিষ্ঠানের পরিবেশন শিল্পকলা একাডেমিতে যোগদান করেন। ১৯৭০-এর দশক থেকেই মূলত তার নৃত্যযাত্রা শুরু হয়। প্রথমজীবনে তিনি উপমহাদেশের শাস্ত্রীয় নৃত্যের তিনটি ধারা– ভরতনাট্যম, কত্থক এবং মণিপুরী নৃত্যে শিক্ষা লাভ করলেও পরবর্তীতে লোক নৃত্যেই তাকে বেশি দেখা যায়। কর্মজীবনে তিনি বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমিতে দীর্ঘকাল দায়িত্ব পালন করেন। তিনি একাডেমির সংগীত ও নৃত্যকলা বিভাগের অন্তর্ভুক্ত প্রযোজনা বিভাগের পরিচালক ছিলেন। এই প্রতিষ্ঠানে তিনি ২৭ বছর কর্মরত ছিলেন।

১৯৮০ সালে বাংলাদেশ টেলিভিশনে প্রচারিত 'মারিয়া আমার মারিয়া' নাটকে অভিনয়ের মাধ্যমে অভিনেত্রী হিসেবেও যাত্রা শুরু করেন। তিনি প্রায় ৮০টি টেলিভিশন নাটকে অভিনয় করেন। এছাড়া তার অভিনীত অন্যান্য উল্লেখযোগ্য নাটকের মধ্যে রয়েছে– 'ঘরে বাইরে', 'অস্থায়ী নিবাস', 'বড় বাড়ি', 'কথা বলা ময়না' প্রভৃতি।

জিনাত বরকতুল্লাহ নৃত্যশিল্পে অবদানের জন্য বেশ কিছু পুরস্কার ও সম্মাননায় ভূষিত হন। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো– শের-ই-বাংলা স্মৃতি পুরস্কার (১৯৮৫), নাট্যসভা পুরস্কার (১৯৮৭), ক্যাডেট কোর পুরস্কার (১৯৮৯), ইউনেস্কো পুরস্কার (১৯৯৬), তারকালোক পুরস্কার (১৯৯৭), সহস্রাব্দ পুরস্কার (২০০০), অমৃতবাজার পুরস্কার (২০০১), বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমি পুরস্কার (২০০৮), শিল্পকলা একাডেমি পদক (২০১৮) ও একুশে পদক (২০২২)।

জিনাত বরকতুল্লাহর মৃত্যুতে সাংস্কৃতিক অঙ্গনে শোকের ছায়া নেমে আসে। মিরপুরের কালশী কবরস্থানে তাকে সমাহিত করা হয়। আমরা তার আত্মার শান্তি কামনা করছি।

নবারুণ

সচিত্র কিশোর মাসিক পত্রিকা

নবারুণ-এর
বার্ষিক চাঁদা ২৪০.০০ টাকা
ষান্মাসিক ১২০.০০ টাকা
প্রতি সংখ্যা ২০.০০ টাকা

মোবাইল অ্যাপ্স-এ
নবারুণ পড়তে
স্মার্ট ফোন থেকে
google play store-এ
nobarun লিখে
মোবাইল অ্যাপ্স
ডাউনলোড করুন।

নবারুণ নিয়মিত পড়ুন, লেখা পাঠান ও মতামত দিন।
লেখা সিডি অথবা ই-মেইলে পাঠান।
e-mail: editornobarun@dfp.gov.bd

Bangladesh Quarterly

ত্রৈমাসিক ইংরেজি পত্রিকা

Bangladesh Quarterly
Yearly : Tk. 120/-
Half yearly : Tk. 60/-
Per issue : Tk. 30/-

- The Bangladesh Quarterly publishes news, articles, features and literary works on history, culture, heritage, economy, development and progress of the country.
- A write-up within 2000 words is preferred.
- Would appreciate, if relevant photographs (with caption) are attached with any article.
- The soft copy may be sent other than CD or Pen drive to the following e-mail address : bangladeshquarterly@yahoo.com
  bdqtrly2@gmail.com

অ্যাডহক প্রকাশনা

বাংলাদেশের ইতিহাস, ঐতিহ্য ও পর্যটনসহ বিষয়ভিত্তিক বাংলা ও ইংরেজি ভাষায় চার রঙে আর্টপেপারে মুদ্রিত ছবি সমৃদ্ধ বিভিন্ন প্রকাশনা নিজের সংগ্রহে রাখতে নিচের ঠিকানায় যোগাযোগ করুন।

মিট বাংলাদেশ (২০০ পৃষ্ঠা): ১,০০০ টাকা
বাংলাদেশের পাখি (২১৬ পৃষ্ঠা): ৭৫০ টাকা
বাংলাদেশের বন্যপ্রাণী (২৪০ পৃষ্ঠা) : ১,২৫০ টাকা
বাংলাদেশের পর্যটন আকর্ষণ : সিলেট বিভাগ (১১২ পৃষ্ঠা): ৭৫০ টাকা
বাংলাদেশের পর্যটন আকর্ষণ : চট্টগ্রাম বিভাগ (২০০ পৃষ্ঠা) : ১,২০০ টাকা
বাংলাদেশের পর্যটন আকর্ষণ : খুলনা বিভাগ (১৮৪ পৃষ্ঠা) : ৮০০ টাকা
বাংলাদেশের পর্যটন আকর্ষণ : বরিশাল বিভাগ (১৩৬ পৃষ্ঠা) : ৭০০ টাকা

কমিশন : ২৫%
এজেন্ট কমিশন : ৩৩%

এজেন্ট, গ্রাহক নিম্ন ঠিকানায় যোগাযোগ করুন

সহকারী পরিচালক (বিক্রয় ও বিতরণ)
চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তর
তথ্য ভবন
১১২ সার্কিট হাউস রোড, ঢাকা-১০০০। ফোন : ৮৩০০৬৯৯
ওয়েবসাইটে সচিত্র বাংলাদেশ, নবারুণ ও বাংলাদেশ কোয়ার্টারলি পড়ুন
www.dfp.gov.bd

সচিত্র বাংলাদেশ

Regd.No.Dha-476 Sachitra Bangladesh Vol. 44, No. 05, November 2023, Tk. 25.00

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ১০ই নভেম্বর ২০২৩ ঢাকায় বিজয় সরণি এলাকায় জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ভাস্কর্য ঘিরে নির্মিত 'মৃত্যুঞ্জয়ী প্রাঙ্গণ' উদ্বোধন করেন– পিআইডি

চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তর
তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয়
তথ্য ভবন
১১২ সার্কিট হাউস রোড, ঢাকা-১০০০
www.dfp.gov.bd